আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

গান্ধীজীর আত্মকথা

প্রথম খণ্ড

শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত

অনুবাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

মূল্য বারো আনা মাত্র

শ্রীহেমপ্রভা দাসগুপ্তা কর্ত্তৃক
খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
- শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস -
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নং ২৭৫৮

অনুবাদকের ভূমিকা

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে থাকা কালে কয়েকজন বন্ধু আমাকে গান্ধীজীর আত্মকথা অনুবাদ করিতে বলেন। তখন আমার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সঙ্কলন কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং আমি বুদ্ধ-প্রবচনের অনুবাদ কার্য্য হাতে লইয়াছি। অনেকটা অগ্রসর হওয়ার পর ইচ্ছা হয় যে, বুদ্ধ-প্রবচনের ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ না করিয়া পালি ভাষা শিখিয়া মূল হইতে অনুবাদ করি। এই অবস্থায় বন্ধুগণ পুনরায় অনুরোধ করেন—তাঁহারা বলেন যে, বুদ্ধ-প্রবচন রাখিয়া গান্ধীজীর আত্মজীবনী খানাই অনুবাদ করা ভাল। ভয় ছিল যে এত বড় বই! ইংরাজীখানার মূল্য ১০॥০ টাকা। বাংলা করিয়া যদি ৫৲।৬৲ টাকা মূল্য হয় তবে উহা কয়জনেই বা কিনিতে পারিবে! কিন্তু নির্ব্বন্ধাতিশয়বশতঃ উহা হাতে লই এবং যাহাতে কম দামে দেওয়া যায় তাহার পথ দেখি। কম দামে দেওয়া সম্ভব মনে হয়। গুজরাটী মূল বহি দেখিয়া আরো সাহস বাড়ে। উহার একটা সংস্করণ দুই খণ্ড ১৲ টাকায় বিক্রয় হয়। বার হাজার বই গুজরাটে বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। তখন গান্ধী-সাহিত্য বাংলায় প্রচারের ইচ্ছায়, অনুবাদে লাগিয়া যাই। ইচ্ছা ত পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এক্ষণে সময় পাওয়ায় বৌদ্ধ-সাহিত্য রাখিয়া গান্ধী-সাহিত্য লইলাম। আত্মকথা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া তীব্র আনন্দ পাইতে লাগিলাম—গান্ধীজীর সাহচর্য্য যেন অনুভব করিতে লাগিলাম। আত্মকথা হইয়া গেল। তাহার পর নেশার ঝোঁকে যেন একে একে তাঁহার বিভিন্ন বইগুলি শেষ হইতে লাগিল। আত্মকথার পর দক্ষিণ

আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা, ব্রত-বিচার, গীতাবোধ, স্বাস্থ্য-রক্ষা একে একে শেষ হইয়া গেল। সত্যাগ্রহ সকলগুলিরই ইতিহাস দেওয়ার ইচ্ছায় চম্পারণ সত্যাগ্রহ লেখা হইয়া গেল। বারডৌলী সত্যাগ্রহ খানা আপত্তিজনক মনে করিয়া জেল-কর্ত্তৃপক্ষ আনিতে দিলেন না, খেড়া সত্যাগ্রহ বইখানা পাই নাই। এইবার আমার জেল-প্রবাসকাল শেষ হইয়া আসিতেছে। আগামীবারের জেলের জন্য অনেক বই জমা হইয়া রহিয়াছে।

আমি অনুবাদকালে যে আনন্দ পাইয়াছি, পাঠকগণও তাহা পাঠকালে পাইবেন—এই আশা রাখি।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল }
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ }

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

(গান্ধীর লেখার অনুবাদ)

আত্মকথার পর গান্ধীজীর গুজরাতী ভাষায় লেখা "দক্ষিণ আফিকায় সত্যাগ্রহের" অনুবাদ প্রকাশিত করা হইতেছে। উহাও প্রায় চারিশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

গান্ধীজীকে জানিতে হইলে তাঁহার আত্মকথা পড়া চাই। কিন্তু তাঁহার আত্মকথার ভিতর অনেক ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। তিনি নিজেই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা অন্য গ্রন্থে ও লেখায় যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, আত্মকথায় তাহা লিখিতে গেলে দ্বিরুক্তি হইত।

গান্ধীজীকে জানিতে হইলে সেইজন্য তাঁহার "আত্মকথা" পড়া চাই এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যগ্রহ" ও "য়েরোডা জেলের অনুভব" ইত্যাদিও পড়া দরকার। "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ" একটা সত্যগ্রহের গল্পমাত্র নহে। গান্ধীজীকে কেন্দ্র করিয়া সত্যাগ্রহ কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, গান্ধীজীর অধ্যাত্ম জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া সত্যাগ্রহ নব নব রূপ লইতেছিল উহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গান্ধীজী যে কালটায়, জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক ও মহত্বপূর্ণ পরিণাম লাভ করেন, সেই সময়টার কথা—১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৪ সালের কথা তাঁহার আত্মজীবনীতে কিছু নাই বলা যায়। তাহা এই দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে রহিয়াছে। আবার সত্যাগ্রহের দিক দিয়া এই "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ" গ্রন্থখানা আদি গ্রন্থ। তিনি উহাতে যে সত্য অধিকার করিয়াছেন, যে ভাব অবিষ্কার করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছেন। সত্য শাশ্বত। সেইজন্য তিনি যে সত্য দক্ষিণ আফ্রিকায় লাভ করিয়াছেন তাহা আজ ভারতে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন। দেশের লোককে সত্যাগ্রহী হইতে হইবে। কিন্তু সত্যাগ্রহ মূলে পদার্থটা কি, উহা যে দুই দিনের জিনিষ নয়, উহা যে আভরণের ন্যায় গায় দেওয়া ও তুলিয়া রাখার বস্তু নহে, উহা যে সত্যাগ্রহীর রক্তমাংসের সহিত জড়িত হওয়া চাই তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে পরিষ্কার করিয়াছেন।

"হিন্দ্ স্বরাজ্য"

(গান্ধীজীর লেখার বাংলা অনুবাদ)

সত্যাগ্রহ কি তাহা বুঝিতে হইলে গান্ধীজীর "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ" অবশ্যই পাঠ করা দরকার। গান্ধীজীর জীবনের বিকাশ দেখিতে হইলেও উহা পড়া আবশ্যক। কিন্তু সত্যাগ্রহ অস্ত্র যখন গান্ধীজীর হাতে ধরা দেয়, তখন হইতেই তিনি ভারতবর্ষের দাসত্ব দূর করার জন্য উহার প্রয়োগের আয়োজন করিতেছিলেন।

ভারতবর্ষের জন্য স্বরাজ্য কি রূপ হইবে এবং কি ভাবে সত্যাগ্রহ দ্বারা উহা পাওয়া যাইবে, তাহা তিনি ১৯০৮ সালে "হিন্দ্ স্বরাজ্য" অর্থাৎ "ভারতবর্ষের জন্য স্বরাজ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন। বহিখানা আজ হইতে তেইশ বৎসর পূর্ব্বে লেখা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তিনি আজ যে ভাবে ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ চালাইতেছেন তাহা এবং অসহযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার গত দশবৎসরের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা—সমস্তই "হিন্দ্-স্বরাজ্য" গ্রন্থে দেওয়া রহিয়াছে। কাজেই আজকার ভারতবর্ষের আইন-অমান্য আন্দোলন বুঝিতে হইলে উহার আদি পরিকল্পনা কি তাহা জানা দরকার। উহার ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবে এ কথা বলিতেছি না। আজকার আন্দোলনের প্রতি অঙ্গের বিষয়, প্রতি ব্যবহারের বিষয় এই গ্রন্থে এমন ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে যে, পড়িয়া মনে হয়, যেন গত ১৯৩০ সালের মার্চ্চ

মাসে আইনঅমান্ত করিতে যাত্রা করিবার পথেই ঐ বহিখানা লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ বইখানার কথা গত বৎসর কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিলে তিনি লেখেন যে, বইখানাতে তখনও তাঁহার একটা কথাও বদলাইবার নাই। এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থ পড়িলে, ভারতের আন্দোলনের প্রাণ যে শাশ্বত সত্য ও অহিংসার উপরেই যে তাহা প্রতিষ্ঠিত তাহা বুঝা যায়। গত ২৩ বৎসরে পৃথিবীর রাজনীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ওলট পালট হইয়াছে, কত নূতন মত গৃহীত এবং পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজীর মত ও পথ অটল রহিয়াছে।

"হিন্দ্ স্বরাজ্যখানা" এই আন্দোলন বুঝার জন্য নিতান্ত আবশ্যক। উহার অনুবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে প্রথমবারকার ছাপা ২৫০০ খানা বহি নিঃশেষিত হওয়ায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

"য়েরোডা জেলের অভিজ্ঞতা"

(গান্ধীজীর লেখার অনুবাদ)

গান্ধীজী গতবার যখন জেল হইতে বাহির হইয়া আসেন তখন "য়েরোডা জেলের অনুভব" বলিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। উহাতে সত্যগ্রহীর কর্ত্তব্য কি, কোথায় অনশনব্রত লওয়া যাইতে পারে ও পারে না, গান্ধীজীর ধর্ম্মমতের বিচার, মহাভারতের সহিত গিবনের রোমের তুলনা ইত্যাদি দ্বারা নিজের জীবন ও চিন্তার ধারার সহিত পাঠকের পরিচয় করাইয়াছেন। তাঁহার আত্মকথা ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত লেখা। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের—১৯২১-২৩ এই দুই বৎসরের অমূল্য ইতিহাস এই পুস্তকে আছে। কাজেই তাঁহার আত্মকথা পাঠ সম্পূর্ণ করিতে গেলে "য়েরোডা জেলের অভিজ্ঞতা" পড়া দরকার। যখন গান্ধীজী য়েরোডাতে ছিলেন তখন সেইস্থানে মুলশীপেটা

সত্যাগ্রহীরাও বন্দী হইয়াছিল। এই সত্যাগ্রহীদের উপর জেল কর্ত্তৃপক্ষের বিষম নির্য্যাতন চলিতেছিল। সত্যাগ্রহীরাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি সব সময় ঠিক মত ধরিতে না পারায় সঙ্ঘর্ষ চলিতেই থাকে। এই অবস্থায় গান্ধীজী সত্যাগ্রহের মূলনীতির আলোচনা দ্বারা ভবিষ্যৎ সংঘর্ষ যেমন করিয়া বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন এই গ্রন্থে তাহারই অপূর্ব্ব বর্ণনা রহিয়াছে। জেলে গিয়াও সত্যগ্রহী কয়েদীরা, জেলের আদেশ অমান্য করিতে চাহেন; জেল কর্ত্তৃপক্ষকে বাধা দিতে চাহেন। কেনই বা তাহা করেন তাহার হেতু এবং কেন সত্যাগ্রহীর তাহা করণীয় নহে তাহা এই "য়েরোডা জেলের অভিজ্ঞতার" ভিতর স্পষ্ট করিয়াছেন। বস্তুতঃ সত্যাগ্রহীর পক্ষে জেলের ভিতর কি ভাবে থাকা উচিত তাহার আলোচনা এখানে যে প্রকার আছে অন্যত্র তত সুন্দর ও বিশদ ভাবে নাই।

কারাগারটা গভর্ণমেণ্টের একটা গুপ্ত বিভাগের মত, উহাতে একবার কাহাকেও ফেলিলে সে বাহ্য জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সরকারও সেখানে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন—করিয়া থাকেন। গান্ধীজী এই গুপ্ত বিভাগটির আঁধার কুঠারির ভিতর সূর্য্যের আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আজ কয়েক বৎসর জেলের যে সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহার হেতু গান্ধীজীর এই অভিজ্ঞতাগুলি প্রকাশ করিয়া দেওয়ার ভিতর অনেক পরিমাণ রহিয়া গিয়াছে। গান্ধীজীর নিকট, হাসপাতাল যেমন শারীরিক রোগীর চিকিৎসার স্থান, কারাগারও তেমনি মানসিক রোগ চিকিৎসার স্থান হওয়া উচিত। আজ যে দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েদীকে কারাগারে পাঠানো হয়, তাহা না করিয়া, হাসপাতালের ন্যায় সেই ভাবেই কারাগার পরিচালিত হওয়া উচিত, এই সত্য এই অভিজ্ঞতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গান্ধীজীর চম্পারণ সত্যাগ্রহ

(সতীশ বাবুর লেখা)

গান্ধীজী ভারতবর্ষে এই সত্যাগ্রহেই প্রথমে প্রজাদের সহিত একাত্ম হইয়া যান। চম্পারণ সত্যাগ্রহে যাহা ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাহাই ব্যাপক ভাবে ঘটিয়াছে। চম্পারণ সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে অনেক কথাই গান্ধীজী তাঁহার আত্মকথায় বলিয়া গিয়াছেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ "চম্পারণে মহাত্মা গান্ধী" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উহাই অবলম্বন করিয়া সতীশবাবুর "চম্পারণ সত্যাগ্রহ" লিখিত।

আত্মকথায় গান্ধীজী লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দিন কতক বোলপুরে শান্তি নিকেতনে ছিলেন। সেখান হইতে যখন গোখলের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি পুনায় রওনা হইয়াছেন তখনই সেই ১৯১৪-১৫ সালে এণ্ড্রুজ গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি ভারতবর্ষে কবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন। তিনি বলেন—অহিংসার ও সত্যাগ্রহের জন্য ভারতবর্ষের তৈরী হইতে এখনো বৎসর পাঁচেক লাগিবে। বস্তুতঃ বৎসর পাঁচেক পরই ভারতব্যাপী অসহযোগ আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সত্যাগ্রহের সহিত ভারতবাসীকে পরিচয় করাইবার জন্য ঈশ্বর গান্ধীজীর হাতে কতকগুলি খণ্ড সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার দেন। ইহা দ্বারা সত্যাগ্রহ কি তাহার সম্বন্ধে দেশবাসীর ধারণা হয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রগতি গান্ধীজীর স্পর্শে বদলাইয়া যায়, আবেদন-নিবেদনের পালা পরিত্যক্ত হইয়া আত্মনির্ভরতা দেখা দেয়। উহার সহিত চম্পারণ ক্ষেত্রেই দেশবাসীর প্রথম পরিচয় ঘটে। চম্পারণে কয়েক সপ্তাহ মাত্র কার্য্য করিয়া

সত
৮০ বৎসরের প্রাচীন অন্যায়ের প্রতিকার কার্য্য তিনি কেমন করিয়া নীলকরের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও চালান ও তাহাতে কৃতকার্য্য হন, তাহাই চম্পারণ সত্যাগ্রহ হইতে শিক্ষণীয়।

স্বাস্থ্য রক্ষা

(গান্ধীজীর লেখা আরোগ্য সাধনের বাংলা অনুবাদ)

গান্ধীজী বলেন যে, তিনি যত বই লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে এই ছোট বইখানা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদৃত হইয়াছে ও নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইতেছে। ইহাতে গান্ধীজী আশ্চর্য্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ আশ্চর্য্য হওয়ার কথা নাই। জীবনের রীতিতে গতানুগত্যের ভিতরে তিনি একটা বিরোধের বীজ বপন করিয়াছেন, যেখানে আরামে খাওয়া-শোওয়াকেই সামাজিক আদর্শ বলিয়া মানা হইয়া থাকে সেখানে তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রবল নূতনত্ব আনিয়া ফেলিয়াছেন—তাহাতেই এই বই-খানা বলপূর্ব্বক সকলের মনোহরণ করিয়াছে। আবশ্যকতার মাপ-কাঠিতে দেখিলে কি পোষাক পরিতে হয়, রত্নাভরণ ব্যবহারের স্থান কোথায় থাকে, অশন বসন কি প্রকার হইয়া পড়ে—এ সমস্তরই মৌলিক আলোচনা দ্বারা সমাজকে একটা বিষম আঘাত করিয়া, জীবন যে কর্ত্তব্যের সমষ্টি মাত্র—ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। কেহ আসিলেই তাহাকে খাইতে দিয়া ভদ্রতা করিতে, কিছু না হউক একটু চা বা মিষ্টি খাওয়াইতে আগ্রহ করিয়া থাকি। কিন্তু অন্য শারীরিক প্রয়োজন সম্বন্ধেই বা তাহা করি না কেন, কেন বলি না মহাশয় দাঁতন দিব কি? এই প্রকার প্রশ্ন করিয়া গান্ধীজী ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের সম্পর্কে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গান্ধীজীর অনেক অদ্ভুত খেয়াল আছে বলিয়া লোকে

মনে করিয়া থাকে। যাঁহার খেয়াল তাহা তিনি কি দৃষ্টিতে দেখেন তাহা এই পুস্তকে তিনি জানাইয়াছেন। জানিলে আর উহা খেয়াল বলা চলে না। সত্য দৃষ্টিতে দেখিলে আমাদের সাজ-গোজ, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসা কি হওয়া ভাল তাহাই তিনি চিত্তাকর্ষক ভাবে দেখাইযাছেন।

জীবনব্রত

(গান্ধীজীর লেখা ব্রতবিচারের বাংলা অনুবাদ)

গান্ধীজী ১৯৩০ সালে য়েরোডা জেল হইতে সবরমতী আশ্রম-বাসীদের প্রার্থনায় পাঠের জন্য যে সমস্ত ব্রতের বিষয় লিখিয়া পাঠাইতেন ইহা তাহারই সমষ্টি।

গান্ধীবাদ বা 'গান্ধীইজম' কি ইহা লইয়া অনেকের মতান্তর আছে। কিন্তু এই বইখানাকে জীবনব্রত নাম না দিয়া গান্ধীবাদ বা 'গান্ধীইজম' নাম দেওয়া যাইতে পারিত। জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত, তিনি সমাজকে কোন আদর্শের অভিমুখী করিতে চাহেন, তাঁহার লক্ষ্যই বা কি, আর তাহার পথই বা কি—একথা তিনি এই কয়টি প্রবন্ধে যেমন স্পষ্ট করিয়াছেন এমন আর কোথাও করেন নাই।

গান্ধীজীর ভাষা এই বাইখানাতে যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি সরল ও তেমনি বেগবান হইয়াছে। সত্যদৃষ্টি লাভ করায় তিনি কি যে চাহেন তাহা তিনি নিতান্তই সহজ কথায় বুঝাইতে পারিয়াছেন। এই ছোট বহিখানি পাঠ করিয়া হৃদ্গত করিলে, আচরণে সত্য করিয়া তোলার চেষ্টা করিলে, মানুষ ব্যক্তিগত হিসাবে ও সামাজিক হিসাবে সমস্ত দ্বন্দ্ব-মুক্ত হইবে।

গান্ধীজী সামাজিক সাম্য বলিতে কি বুঝেন ও কি প্রকার সমাজ

চাহেন, ধনী নির্ধনে, ও স্বামীস্ত্রীতে কি সত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা তিনি করিতে চাহেন তাহাই ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে; সত্যই যে পরমেশ্বর এবং সেই সত্যে পহুঁছিবার পথ যে অহিংসা ইহারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

গান্ধীজী বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাকে তাঁহার আশ্রমের সফলতা দ্বারাই মাপ করা হইবে। এই জীবনব্রত বহিতে যে মতবাদ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কেবল বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা বুঝার ও সন্তোষ লাভ করার জন্য নয়। সবরমতীতে যে জীবন-প্রবাহ চলিতেছে তাহারই সাহায্যকল্পে, সেখানকার বালক-বালিকার ও নর-নারীর দৈনন্দিন জীবনে সাহায্য করিবার জন্য, প্রার্থনায় পাঠের জন্য ও দিনের কর্ম্মে তাহা সার্থক করার পবিত্র উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত। তিনি ভারতবর্ষকে যাহা করিতে চাহেন তাহাই তিনি তাঁহার হাতের গড়া আশ্রমের মধ্য দিয়া সত্য করিয়া তুলিতে প্রয়াস করেন। সেই প্রয়াসে যাহা লিখিয়াছেন সেই পবিত্র লেখা ভারতবাসীর অতিশয় আদরের বস্তু হইয়াছে।

সূচী-পত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রস্তাবনা	...	১

প্রথম ভাগ

১। জন্ম	...	১১
২। বাল্যকাল	...	১৫
৩। বাল্যবিবাহ	...	১৯
৪। স্বামিত্ব	...	২৫
৫। হাই স্কুলে	...	৩০
৬। দুঃখের কথা	...	৩৭
৭। দুঃখের কথা—২	...	৪২
৮। চুরি ও প্রায়শ্চিত্ত	...	৪৭
৯। পিতার মৃত্যু ও আমার লজ্জা	...	৫২
১০। ধর্ম্ম-দর্শন	...	৫৭
১১। বিলাত যাত্রার উদ্যোগ	...	৬৩
১২। জাতিচ্যুত	...	৭০
১৩। অবশেষে বিলাতে	...	৭৪
১৪। আমার পছন্দ	...	৭৯
১৫। সভ্য বেশে	...	৮৫
১৬। পরিবর্ত্তন	...	৯১
১৭। আহার্য্য পরীক্ষা	...	৯৬

বিষয়			পৃষ্ঠা
১৮।	লাজুক স্বভাব—আমার ঢাল	...	১০২
১৯।	অসত্যরূপী গরল	...	১০৯
২০।	ধর্ম্মের সহিত পরিচয়	...	১১৬
২১।	"নির্ব্বল কে বল রাম"	...	১২১
২২।	নারায়ণ হেমচন্দ্র	...	১২৫
২৩।	বিরাট প্রদর্শনী	...	১৩২
২৪।	ব্যারিষ্টার হইলাম—তারপর ?	...	১৩৫
২৫।	আমার সহায়হীনতা	...	১৩৯

দ্বিতীয় ভাগ

১।	রায়চন্দ্ ভাই	...	১৪৭
২।	সংসার-প্রবেশ	...	১৫২
৩।	প্রথম মোকদ্দমা	...	১৫৭
৪।	প্রথম আঘাত	...	১৬২
৫।	দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য প্রস্তুত	...	১৬৭
৬।	নাতাল পৌঁছান	...	১৭১
৭।	অভিজ্ঞতার নমুনা	...	১৭৬
৮।	প্রিটোরিয়ার পথে	...	১৮২
৯।	আরও দুর্গতি	...	১৮৯
১০।	প্রিটোরিয়ায় প্রথম দিন	...	১৯৬
১১।	খৃষ্টানদিগের সহিত সম্বন্ধ	...	২০২
১২।	ভারতীয়দিগের সহিত পরিচয়	...	২০৭
১৩।	কুলীবৃত্তির অভিজ্ঞতা	...	২১২

বিষয়		পৃষ্ঠা
১৪। মামলা তৈরী	...	২১৭
১৫। ধর্ম্ম-উচ্ছ্বাস	...	২২২
১৬। কে জানে কাল কি হবে	...	২২৮
১৭। স্থিতি	...	২৩২
১৮। কালোর বাধা	...	২৩৯
১৯। নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস	...	২৪৪
২০। বালাসুন্দরম্	...	২৫০
২১। তিন পাউণ্ড কর	...	২৫৪
২২। ধর্ম্ম নিরীক্ষণ	...	২৫৯
২৩। গৃহস্বামী	...	২৬৪
২৪। দেশাভিমুখে	...	২৬৯
২৫। ভারতবর্ষ	...	২৭৪
২৬। রাজভক্তি ও শুশ্রূষা	...	২৮০
২৭। বোম্বাই-এ সভা	...	২৮৬
২৮। পুনায়	...	২৯১
২৯। শীঘ্র ফিরিয়া আসুন	...	২৯৫

তৃতীয় ভাগ

১। তুফানের গর্জ্জন	...	৩০১
২। তুফান	...	৩০৫
৩। পরীক্ষা	...	৩১০
৪। শান্তি	...	৩১৭
৫। বালকদের শিক্ষা	...	৩২২

বিষয়		পৃষ্ঠা
৬। সেবা বৃত্তি	...	৩২৭
৭। ব্রহ্মচর্য্য—১	...	৩৩১
৮। ব্রহ্মচর্য্য—২	...	৩৩৬
৯। সরল জীবন-যাত্রা	...	৩৪২
১০। বোয়ার যুদ্ধ	...	৩৪৬
১১। সহর সাফাই ও দুর্ভিক্ষে চাঁদা	...	৩৫১
১২। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন	...	৩৫৪
১৩। দেশে	...	৩৫৯
১৪। কেরাণী ও বেয়ারা	...	৩৬৪
১৫। কংগ্রেসে	...	৩৬৭
১৬। লর্ড কার্জ্জনের দরবার	...	৩৭০
১৭। গোখলের সহিত একমাস—১	...	৩৭৩
১৮। গোখলের সহিত একমাস—২	...	৩৭৭
১৯। গোখলের সহিত একমাস—৩	...	৩৮১
২০। কাশীতে	...	৩৮৬
২১। বোম্বাই-এ বসিলাম	...	৩৯২
২২। ধর্ম্ম-সঙ্কট	...	৩৯৬
২৩। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া এসো	...	৪০১

প্রস্তাবনা

চার অথবা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার কয়েকজন নিকটতম সহযোগীর আগ্রহে আমি আত্মকথা লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম এবং লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক পাতা ফুলস্কেপ শেষ হইতে না হইতেই বোম্বাইয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং আমার এই কার্য্যও অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। তারপর আমি পর পর বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়া অবশেষে যারবেদা জেলে আসিয়া স্থান পাইলাম। ভাই জেরাম দাসও আমার সঙ্গে সেই জেলে ছিলেন। আমার অন্য সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তিনি আমাকে আত্মকথা লিখিয়াই শেষ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি তখন তাঁহাকে জবাব দেই—আমি পাঠ করিবার ক্রম স্থির করিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং উহা শেষ না করিয়া আত্মকথা আরম্ভ করিতে পারিব না। যদি আমি আমার সম্পূর্ণ দণ্ডকাল যারবেদা জেলে কাটাইবার সৌভাগ্য পাইতাম তবে আমি অবশ্যই সেইখানে আত্মকথা লিখিয়া শেষও করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন আমার কারামুক্তি হইল, আমার আরব্ধ পাঠ শেষ করিয়া আত্মকথা আরম্ভ করিতে তখনও এক বৎসর দেরি ছিল। তাহার পূর্ব্বে আত্মকথা লেখা আরম্ভ করা চলিতে পারে না। সুতরাং তখন আর উহা লেখাও হইল না।

এখন আবার স্বামী আনন্দ আমাকে ঐ অনুরোধ করিয়াছেন। আমি দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস লেখা শেষ করিয়াছি, সেই জন্য আত্মকথা লিখিতে লোভও হইতেছে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল

যে আমি সবটা আত্মকথাই একবারে লিখিয়া ফেলি এবং তিনি তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। কিন্তু একযোগে একাজের জন্য এত সময় দেওয়ার মত অবসর আমার নাই। যদি লিখি তবে নবজীবনের জন্য লিখিতে পারি। আমাকে নবজীবনের জন্য কিছু ত লিখিতেই হইবে। তবে আত্মকথাই বা কেন না লিখি? স্বামীজীও এই ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন। আমার আত্মকথা লেখার অবকাশ আসিল।

কিন্তু এইরূপ যখন স্থির করিয়াছি তখনই একজন নির্ম্মল-হৃদয় বন্ধু আমার মৌনের সময় আসিয়া ধীরে ধীরে এই কথাগুলি বলিলেন—"আত্মকথা লেখার আপনার প্রয়োজনটা কি? ইহা ত পশ্চিম দেশের প্রথা। পূর্ব্বদেশের কেহ আত্মচরিত লিখিয়াছেন বলিয়া জানি না। আর কেনই বা আপনি লিখিবেন? আজ যাহা সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিতেছেন, কাল তাহা মানিতে হয় ত বাধা হইবে। অথবা সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া যে যে কার্য্য আজ করিতেছেন পরে আবার তাহাতে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আপনার লেখাকে অনেক লোক প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করে। তাহারা আপনার লেখা অনুযায়ী আচরণ করিয়া ভুল পথে যাইবেন না কি? সেইজন্য সাবধান হইয়া এখন বা কোনও কালেই আত্মকথা যদি না লেখেন তবে তাহাই কি ঠিক হইবে না?"

এই যুক্তি আমার উপর অল্পাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু আমি কি আত্মকথাই লিখিব? আমাকে ত আত্মকথা অবলম্বন করিয়া সত্যের যে সকল প্রয়োগ আমি করিয়াছি তাহার কথাই লিখিতে হইবে। এই সকল পরীক্ষার সহিত আমার জীবন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং যাহা লিখিব তাহা জীবন বৃত্তান্তের মতই হইবে তাহা সত্য, কিন্তু যদি তাহাতে পাতায় পাতায় প্রয়োগের কথা থাকে,

তবে তাহাই আমি যথেষ্ট মনে করিব। আমার সমুদয় প্রয়োগ লোকের নিকট প্রকাশিত হইলে তাহাদের পক্ষে হিতকর হইবে বলিয়াই আমি মনে করি—অন্ততঃ আমার মনে এই রকমের একটা মোহ আছে। রাজনীতিক্ষেত্রে আমার প্রয়োগসমূহ এক্ষণে ভারতবর্ষ জানিয়াছে, কেবল ভারতবর্ষ নয় কতক অংশে তথাকথিত সভ্যজগৎও জানিয়াছে। আমার নিকট ইহার মূল্য একান্ত অকিঞ্চিৎকর। আর এই প্রয়োগ হইতে যে মহাত্মা নাম পাওয়া গিয়াছে তাহার মূল্য আরও কম। কখন কখন এই বিশেষণ আমাকে দুঃখও দিয়াছে। ইহাতে ভূষিত হইয়া আমি কদাপি অহঙ্কৃত হইয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। কিন্তু আমার আধ্যাত্মিক প্রয়োগ সমূহ যাহা কেবল আমিই জানি এবং যাহা দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমার শক্তির উদ্ভব হইয়াছে সেই সকল প্রয়োগ বর্ণন করিতে আমার ইচ্ছা হয়। যদি সত্য সত্য এই প্রয়োগগুলি আধ্যাত্মিক হয় তবে ত আমার তাহাতে আত্মশ্লাঘার স্থানই নাই। ইহা দ্বারা কেবল নম্রতাই বৃদ্ধি পাইতে পারে। যতই আমি বিচার করিতে থাকি, আমার অতীত জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিতে থাকি, ততই আমার ক্ষুদ্রত্ব স্পষ্ট হইয়া আমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

আমি যাহা পাইতে চাই, যাহা আমি গত ৩০ বৎসর ধরিয়া খুঁজিয়া আসিতেছি, সে ত আত্মদর্শন, সেই ত ঈশ্বর সাক্ষাৎকার, অথবা মোক্ষ। যাহা কিছু আমি বলি, যাহা কিছু আমি লিখি, সে কেবল ঐ একটি জিনিষের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া। আমি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন যে কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ি তাহারও পিছনে থাকে ঐ একই ইচ্ছা। আমি গোড়া হইতেই এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিয়াছি যে, যাহা একের পক্ষে সম্ভব তাহা অপর সকলের পক্ষেই সম্ভব। আর সেই জন্যই আমার

কোনও সাধনাই—কোনও পরীক্ষাই আমি গোপনে করি নাই। বস্তুতঃ আমার কার্য্য সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছে বলিয়া উহার আধ্যাত্মিক মূল্য কিছু কমে নাই। এমন কতকগুলি বস্তু অবশ্য আছে যাহা আত্মাই জানে, যাহা আত্মার মধ্যেই লীন হইয়া যায়, যাহা ব্যক্ত করা আমার শক্তির অতীত। কিন্তু যে সকল প্রয়োগের বিষয় আমি লিখিতে যাইতেছি সেগুলি তাহা নহে—সেগুলি আধ্যাত্মিক অথবা নৈতিক। ধর্ম্ম ও নীতি একই। যাহা আত্মার দৃষ্টিতে ধর্ম্ম তাহাই নীতি। যে সকল বিষয় বালক, যুবক অথবা বৃদ্ধ বুঝিতে পারে ও বুঝিয়া থাকে কেবল তাহাই এই আত্মকথায় সন্নিবেশিত হইবে। একথা যদি আমি নিরপেক্ষভাবে, নিরভিমানে লিখিতে পারি তবে তাহাতে অন্যের পক্ষে পরীক্ষা করারই যোগ্য কিছু সামগ্রী মিলিবে।

আমার পরীক্ষা সমূহ সম্বন্ধে কোনও প্রকার সম্পূর্ণতার আরোপ আমি করিতেছি না। বৈজ্ঞানিক যেমন অতিশয় নিয়মের সহিত, বিচারপূর্ব্বক ও সূক্ষ্মভাবে নিজের পরীক্ষা সমূহ সম্পন্ন করিয়াও তাহা হইতে প্রাপ্ত পরিণামকে অন্তিম পরিণাম বলিয়া গণ্য করে না, যে ফল লাভ করিয়াছে তাহাই সত্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ না করিলেও সে বিষয়ে নির্ব্বিকার থাকে, আমার পরীক্ষাসমূহ সম্বন্ধেও আমি সেই মনোভাবই পোষণ করি। আমি গভীর ভাবে আত্মনিরীক্ষণ করিয়াছি, প্রত্যেকটি ভাবকে খুঁজিয়া দেখিয়াছি ও বিশ্লেষণ করিয়াছি। এবং ঐ প্রকার করিয়া যাহা উহার পরিণাম ফল বলিয়া পাইয়াছি তাহা যে সকলের পক্ষেই অন্তিম ফল, তাহা যে অভ্রান্ত সত্য, এ প্রকার দাবী করার ইচ্ছা আমি কোনও দিন করি না। তবে এ দাবী আমি 'অবশ্যই করিব যে, আমার নিকট আমার লক্ষিত

পরিণামই সত্য, এখনকার পক্ষে অন্ততঃ উহাই আমার অন্তিম পরিণাম ফল। কারণ তাহা যদি না হইত তবে আমার পক্ষে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোনও কার্য্য করাও সম্ভবপর হইত না। আমি যে বস্তু দেখিয়াছি তাহার প্রত্যেকটিকেই ত্যাজ্য অথবা গ্রাহ্য এই দুই ভাগে আমি ভাগ করিয়া লইয়াছি এবং যাহা গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিয়াছি সেই অনুযায়ী আচরণ করিয়াছি। এই ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যতক্ষণ আমার বুদ্ধিকে এবং আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখিবে ততক্ষণ আমি যে পরিণাম লক্ষ্য করিয়া কাজ করিয়াছি, তাহাই সত্য বলিয়া অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করিব।

যদি আমাকে কেবল সিদ্ধান্ত অথবা তত্ত্বের বর্ণনা করিতে হইত তাহা হইলে অবশ্যই আমার আত্মকথা আমি লিখিতাম না। কিন্তু আমাকে ঐ সিদ্ধান্তের উপর অনুষ্ঠিত কার্য্যেরই ইতিহাস দিতে হইবে এবং সেই জন্যই আমি এই প্রযত্নকে 'সত্যের প্রয়োগ' এই নাম দিয়াছি। ইহাতে অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি নিয়মের প্রয়োগও আসিবে; এবং এগুলিকে লোকে সত্য হইতে ভিন্ন বলিয়াই মনে করে। কিন্তু আমার কাছে একমাত্র সত্যই সকলের উপরের জিনিষ এবং তাহার ভিতরেই আমি অন্য সমস্ত অগণিত বস্তুর সমাবেশ দেখিতে পাইয়াছি। এই সত্য স্থূল সত্যবাদিতা নহে। ইহা যেমন বাক্য তেমনি বিচার সম্বন্ধেও সত্য। ইহা কেবল আমাদের কল্পনা লোকের সত্য নহে, পরন্তু স্বতন্ত্র স্বাধীন চিরন্তন সত্য, অর্থাৎ পরমেশ্বর।

পরমেশ্বরের বিভূতি অগণিত তাঁহার সংজ্ঞাও অগণিত। এই প্রকাশ আমাকে আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত করে, ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধ করে।

কিন্তু আমি সত্যরূপী পরমেশ্বরেরই পূজারী। এই এক সত্যই আছে আর অন্য সকলই মিথ্যা। এই সত্য আমি লাভ করি নাই, কিন্তু আমি সন্ধান করিতেছি। সেই অনুসন্ধানে যে বস্তু আমার প্রিয় হইতেও প্রিয় তাহাও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। এই সন্ধানরূপী যজ্ঞে আমার শরীরকে হোম করিতে প্রস্তুত আছি এবং সে শক্তি আমার আছে বলিয়াও আমি বিশ্বাস করি। এই সত্যকে আমি যতক্ষণ না লাভ করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার অন্তরাত্মা যাহাকে সত্য বলিয়া গণ্য করে তাহাই আমার আশ্রয়। তাহাকেই আমার পথ প্রদর্শক প্রদীপ জানিয়া, তাহারই আশ্রয়ে আমি আমার জীবন যাপন করিতেছি।

এই পথ যদিও ক্ষুরের ধারের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কঠিন তবুও আমার পক্ষে উহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বলিয়া মনে হয়। এই পথে চলিয়া'ছি বলিয়া আমার ভয়ঙ্কর ভুলও আমার কাছে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইয়াছে। কেননা এই পথের জন্যই ভুল করিয়াও আমি বাঁচিয়া গিয়াছি, এবং আমার বুদ্ধি-মত আমি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। দূর দূরান্তর হইতে সত্যের—ঈশ্বরের দর্শনও আমি অস্পষ্ট ভাবে করিয়াছি। কেবল সত্যই আছে, উহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনও বস্তু পৃথিবীতে নাই—এই বিশ্বাস দিনের পর দিন আমার বাড়িয়া যাইতেছে। কেমন করিয়া এই বিশ্বাস বাড়িয়া যাইতেছে তাহা যাঁহারা নবজীবন ইত্যাদির পাঠক তাঁহারা জানুন এবং যদি ইচ্ছা হয় তবে আমার প্রয়োগের অংশীদার হইয়া আমার সহিত উহা উপলব্ধি করুন। আমি একথা খুব ভাল করিয়াই বিশ্বাস করি যে, যাহা আমার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, তাহা একটি বালকেরও পক্ষেও সম্ভব। একথা বলার উপযুক্ত হেতুও

আমার আছে। সত্যের অনুসন্ধানের উপায় বা সাধন যেমন কঠিন তেমনই সহজ। উহা আত্মাভিমানীর নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও একটি নির্দোষ বালকের পক্ষেও সম্ভব। সত্যের অনুসন্ধান যে করিতে চায় তাহাকে ধূলিকণা অপেক্ষা নীচু হইতে হয়। জগৎ ধূলিকণাকে পিষিয়া ফেলে, কিন্তু সত্যের পূজারী যদি এমন দীন না হয় যে, ধূলিকণাও তাহাকে পিষিয়া ফেলিতে পারে, তবে স্বতন্ত্র সত্যের দর্শন দুর্লভ। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানে ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম ও ইস্‌লামও এই বিষয়ের প্রমাণ দেয়।

যদি আমার এই লেখার মধ্যে পাঠকের নিকট আমার অভিমানের আভাস ধরা পড়ে, তবে তাঁহারা অবশ্য জানিবেন যে, আমার অনুসন্ধানের মধ্যে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, এবং আমার দর্শন মরিচীকা দর্শনের ন্যায় অবাস্তব। আমার মত শত শত লোক নষ্ট হইয়া যাক্, তবুও সত্যের জয় হোক্। আমার মত অল্পাত্মাকে মাপিবার জন্য সত্যের মাপকাঠি যেন ছোট না করা হয়।

আমি যাহা লিখিতেছি তাহাই প্রামাণিক, একথা যেন কেহ না মনে করেন। ইহাতে যে সকল প্রয়োগ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োগ নিজ শক্তি অনুসারে, নিজ বুদ্ধি অনুসারে করিবেন—ইহাই আমার ইচ্ছা। এই দৃষ্টান্ত সহায়ক হইবে মনে করি। কেননা আমি উল্লেখযোগ্য একটা কথাও গোপন করি নাই। আমার দোষের সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য কথাই আমি পাঠকদিগকে জানাইতে পারিব বলিয়া আশা রাখি। সত্য-রূপ শাস্ত্রের পরীক্ষা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য, আমি লোকটা কেমন তাহা বর্ণনা করার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নাই। যে মাপে আমি নিজেকে মাপিতে

প্রস্তাবনা

ইচ্ছা করি, যে মাপ প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে প্রয়োগ কারতে পারেন, সে সম্বন্ধে আমি এই কথাই বলিতে চাই—

"মো সম কৌন কুটীল খল কামী
জিন তনু দিয়া তাহি বিসরায়ো
এসে নিমকহারামী"

কেন না যাঁহাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ত্তা বলিয়া জানি, যিনি আমার জীবনের নিয়ন্তা, তাঁহার নিকট হইতে আমি আজ পর্য্যন্তও এত দূরে আছি—ইহা আমাকে প্রতিক্ষণ শেলের ন্যায় বিদ্ধ করে। আমার বিকারগুলিই ইহার কারণ বলিয়া জানি। তবুও সেগুলিকে দূর করিতে পারিতেছি না।

কিন্তু এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। প্রস্তাবনার মধ্যে আর প্রয়োগের কথা আনিব না। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে জীবনকথা আরম্ভ হইতেছে।

আশ্রম, সাবরমতী
মাঘ,শু, ১১, ১৯৮২, সংবৎ } মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।
২৬ নবেম্বর, ১৯২৫

PUBLIC LIBRARY

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

১ম ভাগ

নং-২৭৫৮

১

জন্ম

গান্ধী পরিবার প্রথমে গান্ধীর ব্যবসা (গুজরাটীতে গান্ধী শব্দের অর্থ মুদী) করিত—এইরূপ জানা আছে। কিন্তু আমার পিতামহ হইতে তিনপুরুষ মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন। উত্তমচন্দ গান্ধী অথবা উতা গান্ধী স্থির-সঙ্কল্পের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রাজ্য-সংক্রান্ত গোলমালে তাঁহাকে পোরবন্দর ত্যাগ করিতে হয়। তিনি জুনাগড় রাজ্যে আশ্রয় লন। সেখানে নবাবকে তিনি বাম হাতে সেলাম করেন। কেহ এই অবিনয় লক্ষ্য করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—"ডান হাত ত পোরবন্দরকে দিয়া ফেলিয়াছি।"

উতা গান্ধী একের পর দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রী হইতে চার পুত্র ও দ্বিতীয়া স্ত্রী হইতে দুই পুত্র হয়। আমি বাল্যকালে জানিতে পারি নাই যে, এই ভাইয়েরা এক মায়ের পেটের সন্তান নন। ইঁহাদের মধ্যে পঞ্চম জন ছিলেন করমচাঁদ অথবা কাবা গান্ধী ও ষষ্ঠ ছিলেন তুলসীদাস গান্ধী। এই দুই ভাই-ই একজনের পর আর একজন পোরবন্দরে মন্ত্রিত্ব করেন। কাবা গান্ধী আমার পিতাঠাকুর। পোরবন্দরের মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া দেওয়ার পর, রাজস্থানিক কোর্টে তিনি সভাসদ হইয়াছিলেন। তারপর কিছুদিন তিনি রাজকোটে এবং তাহার পর ভাঁকানারেও দেওয়ান ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি রাজকোট দরবার হইতে পেন্সন পাইতেছিলেন।

কাবা গান্ধী পর পর চারিটি সংসার করেন। প্রথম দুই স্ত্রী

হইতে দুই কন্যা হয়। তাঁহার শেষ পত্নী পুতলী বাইয়ের এক কন্যা ও তিন পুত্র হয়। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র আমি।

আমার পিতা স্ব-বংশ প্রিয়, সত্যপ্রিয়, বীর, উদার কিন্তু ক্রোধ-পরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রিয়-ভোগ-বিষয়ে তিনি কতকটা আসক্ত ছিলেন, কারণ চল্লিশ বৎসর বয়স পার হইয়া গেলেও তিনি চতুর্থ বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি কখনও ঘুষের ছায়াও মাড়াইতেন না। তাঁহার কাছে যে ন্যায় বিচার পাওয়া যায় একথা তাঁহার পরিবারের সকলে ত জানিতই, বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি রাজ্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। একবার পলিটিক্যাল এজেণ্টের সহকারী কোনও এক সাহেব রাজকোটের ঠাকুর সাহেবকে অপমান করেন। তিনি তখনই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সাহেব তাহাতে রাগ করেন ও কাবা গান্ধীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অস্বীকার করায় কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁহাকে হাজতে রাখা হয়। তাহাতেও তিনি ভীত না হওয়ায় অবশেষে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল।

ধন-সঞ্চয় করার লোভ পিতাঠাকুরের কখন ছিল না। সেই জন্য তিনি আমাদের জন্য খুব কম ধন-সম্পত্তিই রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতার শিক্ষা যাহা কিছু, তাহা অভিজ্ঞতা হইতেই হইয়াছিল। আজকাল গুজরাটে যাহাকে 'পঞ্চম পাঠ' বলে তাঁহার লেখাপড়া মাত্র ততটুকু ছিল। ইতিহাস ভূগোলের জ্ঞান তিনি আদৌ পান নাই। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারিক জ্ঞান এত উচ্চ শ্রেণীর ছিল যে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান করিতে ও হাজার হাজার লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে তাঁহার মুস্কিল হইত না। ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষাও

না থাকার মতই ছিল, তবে মন্দিরাদিতে যাওয়া, কথকতাদি শ্রবণ দ্বারা যে ধর্ম্মজ্ঞান অসংখ্য হিন্দু সহজেই পাইয়া থাকে তাহা তাঁহার ছিল। শেষ বয়সে আমাদের পরিবারের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন এক ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি গীতাপাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন কতকগুলি শ্লোক পূজার সময় উচ্চস্বরে পাঠ করিতেন।

মা যে সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন সেই স্মৃতি আমার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন। পূজাপাঠ না করিয়া কখনো খাইতেন না। প্রতিদিন মন্দিরে (হাবেলী) যাইতেন। আমার জ্ঞান হওয়ার পরে তিনি কখনও চাতুর্ম্মাস ব্রত ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি খুব কঠোর ব্রতগুলিও পালন করিতে আরম্ভ করিতেন ও নির্ব্বিঘ্নে উদ্‌যাপন করিতেন। যে ব্রত লইতেন পীড়িত হইয়া পড়িলেও তাহা ত্যাগ করিতেন না। আমার একবারকার কথা মনে আছে। তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রত লইয়াছিলেন, তারপর অসুস্থ হন, তবুও ব্রত ভঙ্গ করেন নাই। চাতুর্ম্মাস ব্রতের একবেলা আহার তিনি সহজেই পালন করিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া একবার তিনি একদিন অন্তর একদিন ঐ ব্রতে উপবাস করিয়াছিলেন। পর পর দুই তিনটা উপবাস করা ত তাঁহার কাছে কিছুই ছিল না। একবার চাতুর্ম্মাসের সময় তিনি ব্রত লইয়াছিলেন যে, সূর্য্য-নারায়ণ দর্শন না করিয়া আহার করিবেন না। এই চারমাস আমরা ছেলেরা আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম যে কখন সূর্য্য দেখা দিবেন আর কখন মা আহার করিবেন। এ চার মাস অনেক সময়েই সূর্য্যের দেখা পাওয়া যে দুর্ঘট ইহা সকলেই জানেন। একদিন আমার মনে আছে যে, সূর্য্য দেখিয়া আমি "মা, মা, সূর্য্য দেখা দিয়াছে" বলিয়া উঠিলাম, আর মা তাঁড়াতাড়ি বাহিরে

আসিতেই সূর্য্য মেঘের নীচে পলাইয়া গেল। "কই না—আজ কপালে খাওয়া নাই" বলিয়া তিনি ফিরিয়া গিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন।

মায়ের ব্যবহারিক জ্ঞান খুব ছিল। দরবারের সকল খবরই তিনি রাখিতেন এবং রাণীরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসাও করিতেন। আমি বালক বলিয়া মা আমাকে কখন কখন রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেন; ঠাকুর সাহেবের বিধবা মাতার সহিত কথোপকথনের কিছু কিছু এখনো স্মরণ আছে।

এই মাতা-পিতার ঘরে আমি পোরবন্দর অথবা সমুদ্রপুরে, ১৯২৫ সংবৎ, ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষে, ১২ই তারিখে, ইং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর তারিখে জন্মিয়াছিলাম।

বাল্যকাল পোরবন্দরেই কাটে। কোনও স্কুলে পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে নাই। কষ্ট করিয়া কতকটা নামতা শিখিয়াছিলাম। সেই সময় অন্য ছেলেদের সঙ্গে মাষ্টার মহাশয়কে আমি গালি দিতে শিখিয়াছিলাম—এটুকু মনে আছে। আর কিছুই স্মরণ নাই বলিয়া অনুমান করি যে, আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল না এবং স্মরণশক্তিও কাঁচা পাঁপরের যে ছড়া গাহিতাম তাহার মতই কাঁচা ছিল। এই ছড়ার এক লাইন তুলিয়া দিতেছি—

একরে এক, পাঁপর সেক্
পাঁপর কাঁচা—আমার—।

প্রথম ফাঁকের স্থানে যে মাষ্টারের নাম ছিল তাঁহাকে আমার অমর করার ইচ্ছা নাই; আর দ্বিতীয় ফাঁকের স্থানে যে গালি ছাড়িয়া দিয়াছি তাহা আর পূরণ করার আবশ্যকতা নাই।

২

বাল্যকাল

পোরবন্দর হইতে পিতাঠাকুর রাজস্থানিক কোর্টের সভ্য হইয়া রাজকোটে যখন গেলেন, তখন আমার বয়স বছর সাতেক হইবে। রাজকোটের প্রাইমারী পাঠশালায় আমাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই পাঠশালার কথা আমার ভাল রকম মনে আছে। পোরবন্দরের মত এখানেও কি যে পড়িয়াছিলাম সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নাই। প্রাইমারী হইতে মধ্যস্কুলে ও সেখান হইতে হাইস্কুলে গেলাম। এই পর্য্যন্ত পঁহুছিতে আমার বয়স বার বৎসর হইল। সে সময় পর্য্যন্ত আমি কোনও শিক্ষককে বা কোনও বন্ধুকে ঠকাইয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। আমি অতিশয় লাজুক বালক ছিলাম। স্কুলে গিয়া লেখাপড়া ব্যতীত অন্য কাজ ছিল না। ঘণ্টা বাজার সময়ে পঁহুছিতাম, আবার স্কুল ছুটি হইলেই ঘরে পালাইতাম। 'পালান' শব্দ বিবেচনাপূর্ব্বকই ব্যবহার করিতেছি। কেননা কাহারও সহিত গল্প করিতে আমার ভাল লাগিত না। কেহ যদি আমাকে ঠাট্টা করে—এই ভয় হইত।

হাইস্কুলের প্রথম বৎসরেই পরীক্ষার সময় একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা উল্লেখ করার যোগ্য। শিক্ষা বিভাগের ইনস্পেক্টর জাইলস্ সাহেব স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আমাদিগকে পাঁচ ছয়টা শব্দের বানান লিখিতে দিলেন। এই শব্দগুলির মধ্যে একটা শব্দ ছিল কেট্‌ল্ (Kettle)। তাহার বানান আমি ভুল

লিখি। মাষ্টার জুতার ডগা দিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু আমি সে সাবধানতার ইঙ্গিত বুঝিলে ত! আমি ইহা ধরিতেই পারি নাই যে, মাষ্টার আমাকে সামনের ছেলেটির শ্লেট দেখিয়া বানান শুদ্ধ করিতে বলিতেছিলেন। আমি মনে করিলাম—আমরা চুরি করিয়া না দেখি সেই জন্যই মাষ্টার মহাশয় পাহারা দিতেছেন। পাঁচটা শব্দই সমস্ত ছেলে ঠিক ঠিক বানান করিল, আমি একাই কেবল বোকা বনিয়া গেলাম। আমার মূর্খতার কথা মাষ্টার মহাশয় পরে আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। আমি অপর ছেলেদের নিকট হইতে নকল করিয়া লিখিতে কখনও শিখি নাই।

তাহা হইলেও এ ঘটনায় মাষ্টারের প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাব নষ্ট হয় নাই। গুরুজনের দোষ না ধরার গুণ ছিল আমার ভিতর সহজ স্বাভাবিক। এই মাষ্টারের আরও অনেক দোষ পরে আমি জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমানই ছিল। গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিব, এতটুকুই আমি বুঝিতাম। জানিতাম—তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই করিতে হইবে, তাঁহাদের কাজের বিচার করা চলিবে না।

এই সময়েই আরও দুইটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা আমার সর্ব্বদা স্মরণে আছে। সাধারণ স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছু পড়ার জন্য আমার ইচ্ছা হইত না। দৈনিক পড়া যে পাঠ করিতে হইত তাহারও কারণ মাষ্টারের গালি সহ্য করিতে পরিতাম না বলিয়া। আমি মাষ্টারকে ঠকাইতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেইজন্যেই পড়িতাম, কিন্তু মন তাহাতে থাকিত না। ফলে পড়াও

অনেক সময় কাঁচা থাকিত। এইরূপ যেখানকার অবস্থা সেখানে আবার বেশী পড়ার প্রশ্ন কোথায়? কিন্তু পিতাঠাকুর একখানা বই কিনিয়াছিলেন তাহার উপর আমার নজর পড়িল। সেখানা "শ্রবণের পিতৃভক্তি" নামক নাটক। বইখানা পড়ার জন্য আমার ঝোঁক গেল। উহা অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। এই সময় ছবি দেখাইয়া যাহারা বেড়ায় তাহাদেরই একজন আমাদের বাড়ীতে আসিল লণ্ঠন ছবি দেখাইবার জন্য। তাহার প্রদর্শিত ছবিতে দেখিলাম, কাঁধে ঝোলনার ভিতর করিয়া পিতামাতাকে লইয়া শ্রবণ তীর্থস্থানে চলিয়াছে। এই উভয় বস্তুর ছাপ আমার মনের উপর দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল। শ্রবণের মত হওয়ার জন্য আমার ইচ্ছা হইল। শ্রবণের মৃত্যু সময়ে তাহার পিতামাতার বিলাপ আজিও আমার স্মরণ আছে। সেই ললিত ছন্দ আমার নিজের বাজাইয়া বাজাইয়া শুনিতে ও বাজনা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হওয়ায় বাবা বাজনা কিনিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়েই একটা নাটক কোম্পানীও আসে। সেখানে যাইয়া নাটক দেখার অনুমতি পাইলাম। নাটকের বিষয় ছিল হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। এই নাটক দেখিয়া আমার আশ মিটিত না। পুনঃপুন ঐ নাটক দেখার ইচ্ছা হইত। কিন্তু বারম্বার দেখিতে যাইতে দেয় কে? মনে মনে আমি এই নাটক শতবার অভিনয় করিয়াছি। হরিশ্চন্দ্রকে স্বপ্ন দেখিতাম। "হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যবাদী সকলে কেন হয় না?" এই প্রশ্নের ধ্বনি মনের ভিতর চলিতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বিপদে পড়িয়া তাহারই ন্যায় সত্য পালন করিব—ইহাই আমার নিকট সত্য হইয়া উঠিল। নাটকে যেরূপ লেখা হইয়াছিল সে সমস্ত বিপদই হরিশ্চন্দ্রের হইয়াছিল, ইহা আমি সত্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিলাম।

হরিশ্চন্দ্রের দুঃখ দেখিয়া, উহা স্মরণ করিয়া আমি খুব কাঁদিতাম। আজ আমার বুদ্ধি বলিতেছে যে, হরিশ্চন্দ্র কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। তাহা হইলেও আমার মনে শ্রবণ ও হরিশ্চন্দ্র আজও জীবিত আছেন। আজও যদি ঐ নাটক পড়ি তবে চোখে জল আসিবে বলিয়াই মনে হয়।

৩

বাল্যবিবাহ

ইচ্ছা হয়, এই অধ্যায় যদি আমাকে না লিখিতে হইত! কিন্তু আত্মকথা লিখিতে বসিয়া আমাকে এইরূপ কত তিক্ত স্বাদই না লইতে হইবে! সত্যের পূজারী হওয়ার দাবী করিয়া আমি আর অন্য কি করিতে পারি?

১৩ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল—একথা বলিতে আমার খেদ হয়। আজ আমার সাম্‌নে যে সকল বার তের বছরের ছেলে রহিয়াছে তাহাদিগকে যখন দেখি, ও আমার বিবাহের কথা স্মরণ করি, তখন নিজের উপর দয়া হয় ও এই ছেলেরা আমার অবস্থায় পড়ে নাই বলিয়া উহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে ইচ্ছা করে। তের বৎসরে বিবাহ সমর্থন করার পক্ষে একটা যুক্তিও ত আমি খুঁজিয়া পাই না।

পাঠকেরা যেন না মনে করেন যে, আমি 'সগাই'এর কথা বলিতেছি। কাথিয়াওয়াড়ে বিবাহ মানে বিবাহ, বাক্‌দান (সগাই) নহে। এদেশে দুই বালক বালিকাকে পরিণয়ে বদ্ধ করার জন্য পিতামাতার মধ্যে যে প্রতিশ্রুতির বিনিময় হয় তাহাকেই সগাই বলে। সগাই ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়; সগাই হওয়ার পর যদি বর মারা যায় তবে কন্যা বিধবা হয় না। সগাইতে বর-কন্যার কোনও সম্বন্ধ হয় না। দুইজনে জানেও না। আমার একে একে তিনবার সগাই হইয়াছিল, যদিও কখন হইয়াছিল তাহা আমি জানি না। তবে একে একে দুই কন্যা

মরিয়া গিয়াছিল একথা আমি শুনিয়াছিলাম, আর আমি জানিতাম যে আমার তিন সগাই হইয়াছে। তৃতীয় সগাই প্রায় সাত বৎসর বয়সে হইয়াছিল—এই রকম কতকটা স্মরণ হয়। তবে যখন সগাই হইয়াছিল তখন আমাকে কিছু বলা হইয়াছিল কিনা সেকথা আমার মনে নাই। কিন্তু বিবাহে বর-কন্যার আবশ্যক হয়; তাহাতে বিবাহ-কর্ম্ম যথারীতি সম্পাদন করিতে হয়। আমি এই প্রকার বিবাহের কথাই বলিতেছি। বিবাহের কথা আমার সমস্ত মনে আছে।

আমরা তিন ভাই ছিলাম ইহা পাঠকেরা জানেন। আমাদের মধ্যে সব চেয়ে যিনি বড় তাঁহার তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। মধ্যম ভাই আমার অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড়। তাঁহার এবং আমার কাকার এক ছোট ছেলে, তাহার বয়স আমার অপেক্ষা এক আধ বৎসর বেশী হইতে পারে, এবং আমার—এই তিন জনের বিবাহ এক সঙ্গে দেওয়ার জন্য কর্ত্তারা স্থির করিলেন। ইহাতে আমাদের কল্যাণ সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই, আমাদের ইচ্ছার কথা ত নাই-ই। এ সব ক্ষেত্রে গুরুজনের সুবিধা ও খরচের কথাই বিবেচনা করা হয়।

হিন্দুসংসারে বিবাহ যেমন তেমন বস্তু নয়। বর-কন্যার মা-বাপ বিবাহের জন্য উৎসন্নে যায়, ধন নষ্ট করে, সময় নষ্ট করে। কয় মাস পূর্ব্ব হইতেই যোগাড়যন্ত্র চলিতে থাকে, কাপড় জামা তৈরী করা হয়, গহনা গড়ানো হয়, নিমন্ত্রণ খাওয়ানোর ফর্দ্দ তৈরী হয়, কে কত ভাল খাওয়াইতে পারে তাহা লইয়া প্রতিযোগীতা হয়। স্ত্রীলোকেরা, গলা থাকুক আর নাই থাকুক গান করিয়া করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অসুখে পড়ে, প্রতিবেশীর শান্তি নষ্ট করে। প্রতিবেশীরাও

নিজেদের বেলাতেও ঐ রকম করিতে হইবে বলিয়া এই হাঙ্গামা, হট্টগোল ও ময়লা-আবর্জ্জনা—সমস্তই উদাসীনতার সহিত সহ্য করেন।

অভিভাবকেরা মনে করিলেন—এই হাঙ্গামা তিন বার করিয়া না করিয়া একবারেই সারিয়া ফেলা ভাল? তাহাতে একদিকে খরচ যেমন কম হয়, অন্যদিকে বিবাহের আড়ম্বর আবার তেমনি বেশী হয়। তাহা ছাড়া তিনবারের ব্যয় একবারে সারিতে পারিলে টাকাও বেশী খরচ করা যায়। পিতাঠাকুর ও খুড়ামহাশয় বুড়া হইয়াছিলেন। আমরাই তাঁহাদের শেষ সন্তান। আমাদের বিবাহ দিয়া শেষবারের মত ঘটা করার একটা ইচ্ছাও হয়ত তাঁহাদের ছিল। এই সব কারণ হইতে তিন বিবাহ এক সঙ্গেই দেওয়া ঠিক হইয়াছিল, আর সেইজন্য কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই জিনিষপত্র তৈরী করা ও তাহার সাজ-সজ্জা চলিতেছিল।

এই প্রস্তুত হওয়ার ব্যাপার হইতেই আমরা ভাইয়েরা বিবাহের কথা জানি। এই সময় ভাল কাপড় পরা, বাজনা বাজানো শোনা, শোভাযাত্রা দেখা, ভাল ভাল খাদ্য খাওয়া, আর এক নূতন বালিকার সহিত খেলা করার ইচ্ছা ছাড়া আমার মনের ভিতর আর কোনও ইচ্ছা ছিল বলিয়া স্মরণ হয় না। শারীরিক ভোগের প্রবৃত্তি ত পরে আসিয়াছিল। তাহা কেমন করিয়া আসিল তাহাও বর্ণনা করিতে পারি, কিন্তু সে কথা পাঠকেরাই জিজ্ঞাসা করিবেন না। তাই আমার সে লজ্জার কাহিনী পরদা ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিতেছি। জানাইবার যাহা আছে তাহা অবশ্য পরে আসিতেছে। কিন্তু আমি যে লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই আত্মকথা লিখিতেছি• তাহার সহিত সে বিষয়ের সম্পর্ক খুব অল্পই আছে।

আমাদের দুই ভাই রাজকোট হইতে পোরবন্দরে গেলাম। সেখানে গায়-হলুদ ইত্যাদি যে সকল অনুষ্ঠান হইল তাহা আমোদ-জনক হইলেও লেখার যোগ্য নয়।

পিতাঠাকুর দেওয়ান হইলেও ভৃত্য, আবার রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া আরও পরাধীন। ঠাকুর সাহেব শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে তাঁহাকে ছুটি দিলেন না। অবশেষে যখন ছুটি দিলেন তখন আবার বিশেষ যানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই দ্রুত যাওয়ার ব্যবস্থা দ্বারা দুই দিনের পথ কমিয়া গেল। রাজকোট হইতে পোরবন্দর ১২০ মাইল। গাড়ীতে পাঁচ দিন লাগে। পিতাঠাকুর তিন দিনে আসিলেন। কিন্তু পথে একটি দৈবদুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। শেষ ঘাটে টোঙ্গা উল্টাইয়া যায়। পিতাঠাকুর খুব আহত হইয়াছিলেন। তাঁহার হাতে বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। ইহাতে বিবাহের অর্দ্ধেক আনন্দ তাঁহার এবং আমাদের নষ্ট হইয়া গেল। বিবাহ অবশ্য হইলই। যাহা লেখা আছে তাহা কে ফিরাইতে পারে? আমি বাল-সুলভ উল্লাসে পিতৃদেবের দুঃখের কথা ভুলিয়া গেলাম।

আমি পিতৃভক্ত ছিলাম, কিন্তু বিষয়-ভক্তই কি কম ছিলাম? এই বিষয় অর্থে এক মাত্র ইন্দ্রিয়-ভোগের কথাই বলিতেছি না। মাতা-পিতার ভক্তির কাছে সমস্ত সুখ ত্যাগ করিতে হয় সে জ্ঞান পরে হইয়াছিল। ভোগেচ্ছার জন্য আমাকে যে শাস্তি পাইতে হইয়াছিল তাহার মূল কোথায়? কে জানিত যে, সে জন্য আমার জীবনে এত বড় একটা দুঃখদায়ক ঘটনা ঘটিবে যাহার স্মৃতি আজও হৃদয়ে শূল বিদ্ধ করে। যখনই নিষ্কুলানন্দের

"ত্যাগ ন টকেরে বৈরাগ বিনা, করিয়ে কোটি উপায় জী"

গাই অথবা শুনি তখনই এই দুঃখদায়ক ও তিক্ত প্রসঙ্গ মনে হয় এবং লজ্জা পাই।

বাবা জোর করিয়াই বিবাহের উৎসবে যোগ দিলেন। তিনি এই সময় কোথায় কোথায় বসিয়া কখন কি করিয়াছিলেন তাহা ঠিক ঠিক আজও মনে আছে। বাল্যবিবাহের বিচার করিতে গিয়া আজ পিতার কার্য্যের যে সমালোচনা করিতেছি, তখন কি তাহা এতটুকও মনে হইত? তখন ত সমস্তই সঙ্গত বলিয়া মনে হইত ও ভাল লাগিত। বিবাহের সখ ছিল এবং পিতৃদেব যাহা করিতেছেন তাহা সবই ঠিক হইতেছে বলিয়া মনে হইত এবং সেই জন্যই সে সময়কার স্মৃতি টাট্‌কা রহিয়াছে।

বিবাহ মঞ্চে বসিলাম, সপ্তপদী হইল, মিষ্টান্নের অংশ স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে গ্রহণ করিলাম, তার পর বর-বধূ এক সাথেই থাকিতে লাগিলাম। সেই প্রথম রাত্রি! দুই নির্দ্দোষ বালক বালিকা না জানিয়া সংসার সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভ্রাতৃবধূ শিখাইয়া দিয়াছিলেন যে, প্রথম রাত্রে কেমন আচরণ করিতে হইবে। ধর্ম্মপত্নীকে কে শিখাইয়া দিয়াছিল তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে স্মরণ ছিল না। আজ আর কি জিজ্ঞাসা করিব? জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছাও নাই। পাঠকগণকে কেবল এইমাত্রই বলিতে পারি যে, আমরা উভয়েই একে অপরকে ভয় করিতেছি—এই ধরণের একটা ভাবই তখন আমাদের মনের ভিতর ছিল, একে অন্যকে লজ্জা করিতাম ত বটেই। কথা কেমন করিয়া বলিব, কি বলিব, তাহার আমি কি জানি! সে কথা কেহ শিখাইয়া দিলেও কি কাজে আসে? কিন্তু কেনই বা শিখাইতে হইবে? যেখানে সংস্কার বলবান সেখানে শিখাইয়া

দেওয়া একেবারেই মিথ্যা হইয়া পড়ে। ধীরে ধীরে একে অন্যের পরিচয় লইতে লাগিলাম, কথা বলিতে লাগিলাম। আমরা উভয়েই এক বয়সের ছিলাম। তথাপি স্বামীর প্রভুত্ব আরম্ভ করিতে আমার বিলম্ব হইল না।

৪

স্বামিত্ব

যখন বিবাহ হইয়াছিল সেই সময়ে উপদেশ-মূলক ছোট ছোট বহি বাহির হইত। উহার মূল্য এক পয়সা বা এক পাই—কি ছিল মনে নাই। উহাতে দম্পতী-প্রেম, মিতব্যয়িতা, বাল্যবিবাহ, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা থাকিত। এই ধরণের কোনও নিবন্ধ আমার হাতে আসিলেই আমি পড়িয়া ফেলিতাম। আমার অভ্যাস ছিল যে, যাহা পড়ি তাহার মধ্যে যাহা ভাল না লাগে তাহা ভুলিয়া যাই, আর যাহা ভাল লাগে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি। একপত্নী-ব্রত পালন করা পতির ধর্ম্ম—একথা হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিল। সত্যের প্রতি আমার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। সেই জন্যই পত্নীকে প্রতারিত করার কথা মনেও উঠিত না। তাহা ছাড়া সেই ছোট বয়সে একপত্নী-ব্রত ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনাও কম ছিল।

এই সৎ বিচারের পরিণাম একদিক দিয়া আবার খারাপ হইল। যদি আমার একপত্নী-ব্রত পালন করিতে হয় তবে পত্নীরও ত একপতি-ব্রত পালন করা চাই। এই ভাবনা হইতে আমি প্রেম-সংশয়ী স্বামী হইয়া পড়িলাম। ‘পালন করা চাই’ এই বিচার হইতে ‘পালন করানো চাই’ এই বিচার আসিয়া পড়িল। আর যদি ‘পালন করানো চাই’ এই বিচার আসিয়া পড়িল, তবে আমার পাহারাও দিতে হয়। পত্নীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ার কোনও কারণই ছিল না। কিন্তু সংশয়ও ত কারণ খোঁজে না। স্ত্রীর চলা-ফেরার

দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার, তাই আমার অনুমতি ছাড়া তাহার কোথায় যাওয়াও চলিতে পারে না। ইহাই আমাদের মধ্যে এক দুঃখদায়ক কলহের হেতু হইয়া পড়িল। অনুমতি ভিন্ন কোথাও যাইতে না পারা মানে—একরকম কয়েদী হইয়া থাকা। কিন্তু কস্তুর-বাঈ এই প্রকার কয়েদ সহ্য করার পাত্রী ছিলেন না। যখন ইচ্ছা হইত তিনি নিশ্চিত আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই যেখানে খুসী যাইতেন। যেমন আমি চাপ দিতে লাগিলাম, তিনিও তেমনি অবরোধ ভাঙ্গিতে লাগিলেন এবং আমিও বেশী করিয়া রাগ করিতে লাগিলাম। এইরূপে আমাদের এই দুই বালক বালিকার মধ্যে কথা বন্ধ করা একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। কস্তুর-বাঈ যে আমার বিনা অনুমতিতেই বাহিরে চলা-ফেরা করিতেন তাহা আমি একান্ত নির্দ্দোষ বলিয়াই মনে করি। যে বালিকার মনে পাপ নাই সে দেবমন্দিরে যাইতে বা কাহারও সহিত দেখা করিতে যাইতে অকারণ শাসনের চাপ কেন সহ্য করিবে? আমি যদি তাঁহার উপর শাসন চালাইতে পারি, তবে তিনিই বা কেন পারিবেন না? একথা এখন বুঝিতেছি, কিন্তু তখন ত আমি আমার স্বামীর অধিকার লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম।

পাঠকগণ ইহা হইতে যেন মনে না করেন যে, আমাদের এই সংসার-ধর্ম্মের মধ্যে কোনও সুখই ছিল না। আমার এই বক্রভাবের মূলেও ছিল প্রেম। স্ত্রীকে আমার আদর্শ পত্নী করিতে হইবে। আমি চাহিতাম—তিনি পবিত্র জীবন যাপন করিবেন, আমি যাহা শিখাইব তাহাই শিখিবেন, যাহা পড়াইব তাহাই পড়িবেন। এমনি করিয়া আমরা একে অন্যের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া যাইব।

কস্তুর-বাঈয়েরও মনে এ ধরণের ইচ্ছা হইত কিনা তাহা আমি

জানি না, তিনি নিরক্ষর ছিলেন। স্বভাবতঃই তিনি সরল, স্বাধীন-চিত্ত ও দৃঢ়সঙ্কল্পের রমণী ছিলেন এবং কম কথা—অন্ততঃ আমার সহিত কম কথা বলিতেন। নিজের অজ্ঞতার জন্য তাঁহার মনে কোনও অসন্তোষ ছিল না। আমি লেখাপড়া শিখিতেছি অতএব তিনিও শিখিবেন, এই রকমের ইচ্ছা, বাল্যকালে আমি কখনো তাঁহার ভিতর লক্ষ্য করি নাই। এ বিষয়ে আমাদের অনুরাগ এক দিককারই ছিল। আমার ভোগ-বাসনা এক স্ত্রীর উপরই কেন্দ্রীভূত ছিল, আমিও ইচ্ছা করিতাম যে, তাঁহার দিক হইতেও ঐ প্রকার অনুভূতি থাকে। যেখানে প্রেম একদিক হইতেও থাকে, সেখানে সর্ব্বাংশে দুঃখ হইতেই পারে না।

একথা আমাকে বলিতেই হইবে যে, আমি স্ত্রীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলাম। স্কুলে গিয়াও তাঁহার কথাই মনে হইত, কখন রাত্রি হইবে, কখন তাঁহার সহিত দেখা হইবে—এই ছিল আমার ভাবনা। বিচ্ছেদ অসহ্য বোধ হইত। আমি নানা বাজে কথা বলিয়া কস্তুর-বাঈকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগাইয়া রাখিতাম। আমার মনে হয়, যদি এই তীব্র আসক্তির সহিত আমার ভিতর কর্ত্তব্যপরায়ণতা না থাকিত তবে হয়ত রুগ্ন হইয়া মারা যাইতাম, নয়ত অকর্ম্মণ্য হইয়া জগতে বৃথা জীবন যাপন করিতাম। সকাল হইলে নিত্যকর্ম্ম করিতেই হইবে, তারপর আবার কাহাকেও মিথ্যা বলিব না, আমার এই ভাব হইতেই আমি অনেক সঙ্কট হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি।

পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, কস্তুর-বাঈ নিরক্ষর ছিলেন। তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হইত। কিন্তু ভোগ-বাসনায় লিপ্ত যাহার মন সে শিখাইবে কেমন করিয়া? একে ত জোর করিয়া পড়াইতে হইবে, তাহার উপর আবার পড়াইতে হইবে রাত্রিতে।

গুরুজনের সম্মুখে স্ত্রীকে পড়ানো দূরে থাকুক, কথাই বলা যায় না। কাথিয়াওয়াড়ে লজ্জা সম্বন্ধে এই অনাবশ্যক ও অসভ্য প্রথা তখন ছিল, এখনো অনেকটা আছে। এই জন্য তাঁহাকে পড়ানোর ব্যবস্থা আমার পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাই যৌবনে তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে যত চেষ্টা করিয়াছি সে সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে। তারপর কাম-বাসনা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ানো যখন আমার পক্ষে সম্ভব হইল, তখন আসিয়া দেখা দিল জন-সাধারণের সেবার কাজ। তখন এ জন্য সময় দিতে পারি সে অবস্থা আর আমার ছিল না। শিক্ষকের সাহায্যে তাঁহাকে পড়াইবার চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়াছে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, আজ কস্তুর-বাঈ সাধারণ চিঠি-পত্র কষ্টে লিখিতে পারেন ও সহজ গুজরাটী বুঝিতে পারেন। যদি আমার প্রেম কামদ্বারা দূষিত না হইত, তবে আমার বিশ্বাস তিনি আজ বিদুষী স্ত্রী হইতেন। পড়ার সম্বন্ধে তাঁহার আলস্যকেও আমি জয় করিতে পারিতাম। শুদ্ধ প্রেমের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, তাহা আমি জানিয়াছি।

নিজের স্ত্রীর প্রতি বাসনাসক্ত হইয়াও আমি কেমন করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছি তাহার একটা কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। আরো একটা উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। শত অভিজ্ঞতা হইতে আমি একথা বলিতে পারি যে, যেখানে অভিপ্রায় শুদ্ধ, সেখানে ঈশ্বর রক্ষা করেন। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ এক সর্ব্বনাশী প্রথা। এই প্রকার অপকার হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত থাকা যায় এমন ব্যবস্থাও অবশ্য আছে। অল্পবয়স্ক বর-বধূকে বাপ-মা সব সময় একত্র থাকিতে দেন না। বালিকা স্ত্রীদিগের অর্দ্ধেকের অধিক সময় বাপের বাড়ীতে কাটে।

আমার বেলায় তাহাই হইয়াছিল। এই জন্য ১৩ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, মাঝে মাঝে যে সময়টা আমরা এক সঙ্গে থাকিতাম তাহা যোগ করিলে তিন বৎসরের বেশী হইবে না। ছয় সাত মাস একত্র থাকার পরেই পত্নীর বাপ-মার নিকট যাওয়ার ডাক আসিত। তখন উহা বড়ই খারাপ লাগিত; কিন্তু তাহাতেই আমরা দুই জনে বাঁচিয়া গিয়াছি। ১৮ বৎসরে ত বিলাতেই যাই। তখন এক সুন্দর ও দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবকাশ আসে। বিলাত হইতে আসিয়া মাস ছয়েক একত্র ছিলাম। আমাকে এই সময় রাজকোট ও বোম্বাইয়ে যাতায়াত করিতে হইত। এই সময়েই দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ডাক আসিল। ইতিমধ্যেই আমি ভাল রূপে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছি।

৫

হাইস্কুলে

যখন বিবাহ হইল তখন যে হাইস্কুলে পড়িতেছিলাম তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সেই সময় আমরা তিন ভাই একই স্কুলে পড়িতাম। বড় ভাই অনেক উপরে পড়িতেন, আর আমার যে ভাইয়ের বিবাহের সময় আমারও বিবাহ হয়, তিনি এক ক্লাশ উপরে পড়িতেন। বিবাহের ফল এই হইল যে, আমাদের দুই ভাইয়েরই এক বৎসর নষ্ট হইল। আমার ভাইয়ের পক্ষে ফল আরো খারাপ হইয়াছিল। কেন না বিবাহ হওয়ার পর তিনি আর স্কুলে যাইতেই পারিলেন না। ঈশ্বর জানেন, এই রকম পরিণাম কত যুবকের হইয়া থাকে। বিদ্যাভ্যাস ও বিবাহ— হিন্দু পরিবারে এই দুইটা জিনিষ এক সাথেই চলিয়া থাকে।

আমার পাঠাভ্যাস চলিতে লাগিল। হাইস্কুলে আমি নিরেট ছাত্র বলিয়া গণ্য হই নাই। শিক্ষকদিগের ভালবাসা সব সময়েই পাইয়াছি। প্রতি বৎসরেই অভিভাবকের নিকট বিদ্যার্থীর পড়া ও চরিত্র বিষয়ে সার্টিফিকেট আসিত, উহাতে আমার পাঠাভ্যাস বা চরিত্র মন্দ বলিয়া মন্তব্য কোনও দিন আসে নাই। দ্বিতীয় মানে প্রাইজ পাইয়াছিলাম। চতুর্থ ও পঞ্চম মানে ৪৲ টাকা ও ১০৲ টাকার বৃত্তিও পাইয়াছিলাম। উহা পাওয়াতে আমার কৃতিত্ব অপেক্ষা ভাগ্যই বেশী ছিল। এই বৃত্তি সকল বিদ্যার্থীর জন্য নহে, যাহারা "সোরট" অঞ্চল হইতে পড়িতে আসে কেবল তাহাদেরই জন্য। চল্লিশ পঞ্চাশ জনের ক্লাশে সোরটের আর কয়জন ছেলে থাকিতে পারে?

হাইস্কুলে

আমার স্মরণ আছে যে, আমার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমার কোনও অভিমান ছিল না। প্রাইজ বা বৃত্তি পাইলে আমি আশ্চর্য্য হইতাম। কিন্তু আমার ব্যবহার সম্বন্ধে আমি বিশেষ সাবধান ছিলাম। আচরণে দোষ হইলে আমার চোখে জল আসিত। শিক্ষক গালি দিতে পারেন এমন কোনও কাজ করিলে, অথবা সেইরূপ কোনও কাজ আমি করিয়াছি বলিয়া শিক্ষক মনে করিলে তাহা আমার অসহ্য হইত। একবার মার খাইতে হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ আছে। মার খাওয়ার ব্যথায় দুঃখ হয় নাই, কিন্তু আমি যে দণ্ডের যোগ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছি তাহাতেই মহাদুঃখ হইয়াছিল। দ্বিতীয় ঘটনা হয় যখন সপ্তম মানে পড়ি। তখন দোরাবজী এদুলজী গীমী হেড-মাষ্টার ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। তিনি নিয়ম রক্ষা করিতেন, রীতিমত কাজ করিতেন ও কাজ আদায় করিতেন, পড়াইতেনও ভাল। উপরের ক্লাশের ছাত্রদিগের ব্যায়াম করা তিনি বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। উহা আমার ভাল লাগিত না। নিয়ম হওয়ার পূর্ব্বে আমি কখনও ব্যায়াম করি নাই, বা ফুটবল কি ক্রিকেট খেলি নাই। আমার লাজুক স্বভাবও না খেলিতে যাওয়ার একটি হেতু ছিল। ব্যায়ামের সহিত শিক্ষার কোনও সম্বন্ধ নাই, আমার তখন এই প্রকার একটা ভুল বিশ্বাস ছিল। এখন বুঝিতেছি, বিদ্যাভ্যাসের মধ্যে শারীরিক শিক্ষাকে মানসিক শিক্ষার মতই স্থান দেওয়া উচিত।

তাহা হইলেও ব্যায়াম না করায় আমার হানি হয় নাই—একথাও আমি জানাইতে ইচ্ছা করি। একখানি গ্রন্থে আমি খোলা হাওয়ায় বেড়ানোর উপকারিতার কথা পড়িয়াছিলাম। কথাটা

আমার ভাল লাগে এবং তারপর হাইস্কুলের উপর শ্রেণী হইতেই আমি বেড়াইতে যাওয়ার অভ্যাস করি। ঐ অভ্যাস এখনো আছে। বেড়ানো ব্যায়ামই বটে, আর সেই জন্যই আমার শরীর সুগঠিত হইতে পারিয়াছিল।

পিতাকে সেবা করার তীব্র ইচ্ছাও ব্যায়ামকে অপছন্দ করার আমার অন্যতম কারণ। স্কুল বন্ধ হইতেই তাড়াতাড়ি বাড়ী পঁহুছিয়া পিতার সেবায় লাগিয়া যাইতাম। যখন সকলের উপরেই ব্যায়াম করার আদেশ হইল, তখন এই সেবায় বিঘ্ন পড়িল। পিতাঠাকুরের সেবার জন্য ব্যায়ামের ক্লাসে হাজিরা দেওয়া মাফ্ চাই বলিয়া অনুনয় করিয়াছিলাম। কিন্তু গীমী সাহেব কি আর মাফ্ করেন? এক শনিবারে প্রাতঃকালে স্কুল বসিয়াছিল। বৈকালে চারিটায় ব্যায়াম করিতে যাওয়ার কথা। আকাশ মেঘলা ছিল বলিয়া বেলা টের পাওয়া যায় নাই। বাদল আমাকে ঠকাইল। যখন ব্যায়ামস্থানে পঁহুছিলাম তখন সকলে ফিরিতেছে। পরের দিন গীমী সাহেব হাজিরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিলাম, কিন্তু তিনি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। আমার স্মরণ নাই ঠিক কত, কিন্তু তিনি আমাকে এক আনা কি দুই আনা জরিমানা করিয়াছিলেন। এ জরিমানার অর্থ—আমাকে মিথ্যুক মনে করা? আমার অতিশয় দুঃখ হইল। 'আমি মিথ্যা কথা বলি না'—ইহা কেমন করিয়া প্রমাণ করিব? কোনও উপায় ছিল না। মনে মনেই দুঃখ রহিয়া গেল। বুঝিলাম যে, সত্য যে বলিতে চায়, সত্য কে পালন করিতে চায় তাহার অসাবধান হওয়াও

চলে না। আমার পাঠাভ্যাসের সময় অসাবধানতা এই প্রথম ও এই শেষ। আমার অস্পষ্ট স্মরণ আছে যে, শেষে এই দণ্ড মাপ করাইতে আমি সক্ষম হইয়াছিলাম।

ব্যায়াম করা হইতে পরে অবশ্য মুক্তি পাইয়াছিলাম। স্কুলের পর পিতা আমার সেবা চাহেন, এইরূপ পত্র হেড-মাষ্টারকে দেওয়ায় তিনি আমাকে অব্যাহতি দেন।

ব্যায়ামের পরিবর্ত্তে বেড়াইতাম বলিয়া, ব্যায়াম না করার ভুলের দণ্ড আমাকে কখনো ভুগিতে হয় নাই। কিন্তু আর একটা ভুলের সাজা আমি এখনো পাইতেছি। কোথা হইতে আমার এই খেয়াল হইয়াছিল জানি না যে, শিক্ষার সঙ্গে হাতের লেখা ভাল হওয়ার আবশ্যক নাই। এই বিশ্বাস বিলাত যাওয়া পর্য্যন্ত আমার ছিল। পরে বিশেষ ভাবে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় উকীলদের এবং ঐ স্থানেই জন্মিয়াছে ও শিক্ষা লাভ করিয়াছে, এইরূপ যুবকদের মুক্তার মত হস্তাক্ষর আমার চোখে পড়িল তখন এই অবহেলার জন্য লজ্জা ও অনুতাপ আমার এক সঙ্গে আরম্ভ হয়। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে খারাপ হস্তাক্ষর অসম্পূর্ণ শিক্ষার চিহ্ন বলিয়া গণ্য করা উচিত। আমি তারপর হস্তাক্ষর ভাল করার চেষ্টাও করিয়াছিলাম। কিন্তু শুষ্ক বাঁশ কি বাঁকানো যায়? যৌবনে যাহা অগ্রাহ্য করিয়াছি এখনো তাহা আর দুরস্ত করিতে পারি নাই। প্রত্যেক যুবক ও যুবতী আমার এই উদাহরণ হইতে একথা জানিয়া রাখিবেন যে, ভাল হস্তাক্ষর বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকীয় অঙ্গ। ভাল লেখা শিখিতে হইলে ভাল অক্ষর গঠন করার কৌশল শিক্ষা করা চাই। আমি ত এই সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছি যে, লিখিতে শিক্ষা করার পূর্ব্বে আঁকিতে

শেখা দরকার। যেমন পাখী বা অন্য বস্তু দেখিয়া তাহা স্মরণে রাখিয়া বালক তাহা আঁকিতে শেখে, তেমনি প্রথমে অক্ষর পরিচয় করিয়া তাহার পর শিশুদের চিত্রের ন্যায় অক্ষরে আঁকিতে শিক্ষা করা সঙ্গত। তাহা হইলে অক্ষর ছাপার লেখার মতই হইতে পারে।

এই সময়ের বিদ্যাভ্যাসকালের দুইটি স্মৃতি উল্লেখ-যোগ্য। বিবাহের জন্য যে একবৎসর নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তাহা সারিয়া লওয়ার ব্যবস্থা মাষ্টার মহাশয় করিলেন। শ্রম-কুশল ছাত্রদিগকে তখন এই প্রকার সুযোগ দেওয়া হইত। আমি তৃতীয় মানে ছয় মাস মাত্র পড়িয়া গ্রীষ্মাবকাশের পরের পরীক্ষা শেষ হইলে, চতুর্থ মানে উঠিতে আদেশ পাইলাম। এই ক্লাশ হইতেই কোনো কোনো বিষয় ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। আমি উহা কিছু বুঝিতাম না। জ্যামিতিও চতুর্থমানে আরম্ভ হয়। আমি তাহাতেও পিছনে পড়িয়া থাকিতাম, বিশেষতঃ ইংরাজীতে বলিয়া মোটেই বুঝিতাম না। জ্যামিতির মাষ্টার মহাশয় ভাল পড়াইতেন। কিন্তু আমার মাথায় ঢুকিত না। অনেক সময় নিরাশ হইতাম। কখনো কখনো এমনও মনে হইত যে, দুই ক্লাশ এক বৎসরে শেষ না করিয়া পুনরায় তৃতীয় মানেই ফিরিয়া যাই। কিন্তু ইহাতে আমার যেমন লজ্জার কথা, তেমনি যে শিক্ষক আমি শ্রম করিব বলিয়া বিশ্বাস করিয়া প্রমোশন দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাঁহাকেও লজ্জায় ফেলা হয়। এই ভয়ে নীচের ক্লাশে নামার কথা ছাড়িয়া দিলাম। চেষ্টা করিতে করিতে যখন ইউক্লিডের ত্রয়োদশ প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত আসিলাম তখন হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, জ্যামিতি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বিষয়। যেখানে কেবল বুদ্ধিরই সহজ ও সরল প্রয়োগ সেখানে আর

মুস্কিল কোথায়? তাহার পর হইতে জ্যামিতি আমার নিকট সহজ ও রস-দায়ক বিষয় হইয়া পড়িল।

জ্যামিতি অপেক্ষাও বেশী মুস্কিল হইয়াছিল সংস্কৃততে। জ্যামিতিতে মুখস্থ করার কিছু ছিল না, কিন্তু সংস্কৃত তখন আমার কাছে মুখস্থ করারই বিষয় হইয়াছিল। সংস্কৃত ও চতুর্থ মানেই পড়ানো আরম্ভ করা হয়। ষষ্ঠ মানে আমি উঠিলাম। সংস্কৃত শিক্ষক বড় শক্ত ছিলেন। ছাত্রদিগকে খুব শিখাইবেন—এই ছিল তাঁহার লোভ। সংস্কৃত ও ফারসী ক্লাশে এক রকম প্রতিযোগীতা ছিল। ছাত্রেরা ভিতরে ভিতরে বলাবলি করিত যে, ফারসী বড় সহজ ও ফারসী শিক্ষক বড় ভাল। ছাত্রেরা যতটুকু করে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। সহজ শুনিয়া আমিও লোভে পড়িলাম ও একদিন ফারসী ক্লাশেও গিয়া বসিলাম। সংস্কৃতের শিক্ষক ইহাতে ভারি ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—"তুমি কাহাদের সন্তান তাহা বুঝিয়া দেখ, তোমার নিজের ধর্ম্মের ভাষা তুমি শিখিবে না? তোমার যাহা মুস্কিল লাগে আমার কাছে আনিও। আমার ত ইচ্ছা করে সকল ছাত্রকেই ভাল করিয়া সংস্কৃত শিখাইয়া দিই। আরো বেশী শিখিলে ইহাতে খুব রস পাইবে। এরকম হার মানা তোমার উচিত নয়। তুমি আবার আমার ক্লাশে ফিরিয়া এস।" তাঁহার কথা শুনিয়া আমার লজ্জা হইল। শিক্ষকের প্রেমের অপমান করিতে পারিলাম না। আজও আমার আত্মা কৃষ্ণশঙ্কর মাষ্টারের উপকার স্বীকার করিতেছে। তখন যতটুক সংস্কৃত শিখিয়াছিলাম তাহাও যদি না শিখিতাম, তাহা হইলে আজ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে যে রস লইতে পারিতেছি, তাহা পারিতাম না। আমার এই অনুতাপ রহিয়া গিয়াছে

যে, ভাল সংস্কৃত শিখিতে পারি নাই। কেননা পরে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, কোনও হিন্দু বালকেরই সংস্কৃত বেশ ভাল না জানিলে চলে না।

আমার বর্ত্তমান মত এই যে, ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায় নিজের ভাষার উপর রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দী, সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী ও ইংরাজীর স্থান দেওয়া দরকার। এতগুলি ভাষার সংখ্যা দেখিয়া কাহারও ভয় পাওয়ার কারণ নাই। ভাষা যদি উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং অন্য সকল বিষয় ইংরাজীর সাহায্যে পড়িবার বোঝা যদি না চাপানো হয়, তবে ঐ ভাষাগুলি শিক্ষা করা, বোঝা বলিয়া বোধ হইবে না, বরঞ্চ উহাতে অতিশয় রস পাওয়া যাইবে। আর একটা ভাষা যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা করে, তাহার পক্ষে অন্য ভাষার জ্ঞান সুলভ হইয়া পড়ে। সত্য করিয়া দেখিতে গেলে হিন্দী, গুজরাতী, সংস্কৃত একই ভাষা বলিয়া গণ্য করা যায়। ফারসী যদিও সংস্কৃতের সহিত ও আরবী হিব্রুর সহিত সম্পর্ক-যুক্ত, তথাপি উভয়েই ইসলাম অবলম্বনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া উভয়ের নিকট সম্বন্ধ আছে।

'উর্দ্দু'কে আমি ভিন্ন ভাষা বলি না, কেন না তাহার ব্যাকরণ হিন্দী অনুযায়ী। উহার শব্দগুলি ফারসী এবং আরবী। উচ্চ অঙ্গের গুজরাতী, হিন্দী, বাংলা, মারাঠী জানিতে সংস্কৃত জানার আবশ্যক আছে।

৬

দুঃখের কথা

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হাইস্কুলে আমার মিত্রের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তবু যাহাকে বন্ধু বলা যায় এইরূপ মিত্র স্কুলেও বিভিন্ন সময়ে আমার জুটিয়াছে। দুইজনকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুই বলা যায়। এক জনের সহিত সম্বন্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, কিন্তু আমি তাঁহাকে ত্যাগ করি নাই। দ্বিতীয় বন্ধুর সঙ্গ করিতেছি বলিয়া প্রথম বন্ধু আমাকে ত্যাগ করেন। এই দ্বিতীয় বন্ধুর সঙ্গ আমার জীবনের দুঃখদায়ক প্রসঙ্গ। এই সঙ্গ কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। তাহার সহিত বন্ধুত্ব আমি সংস্কারের ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই করিয়াছিলাম। আমার মধ্যম ভাইয়ের সহিতই তাহার প্রথম মিত্রতা হয়, সে তাঁহার সঙ্গেই পড়িত। তাহার কতকগুলি দোষ ছিল তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আমি তাহাকে আমার অনুরাগ অর্পণ করিয়াছিলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী, আমার বড়ভাই ও আমার স্ত্রী—এই তিন জনার নিকটেই এই সঙ্গ তিক্ত লাগিত। পত্নীর সাবধান-বাণী গর্ব্বান্ধ স্বামী হইয়া গ্রাহ্য করার আবশ্যক আছে বলিয়া মনে করিতাম না। কিন্তু মাতার কথা লঙ্ঘন করা যায় না, বড় ভাইয়ের কথাও শুনিতে হয়। তাঁহাদিগকে আমি এই কথা বলিয়া শান্ত করিলাম—"তাহার যে দোষের কথা তোমরা বলিতেছ আমার তাহা জানা আছে। কিন্তু তাহার গুণ কি তাহাও তোমরা জান না। আমাকে সে বিপথে লইয়া যাইতে পারিবে না, কেন না তাহাকে

ভাল করার জন্যই আমার সহিত তাহার এই সম্পর্ক। সে যদি শোধরায় তবে খুব ভাল লোক হইবে। তোমরা আমার সম্বন্ধে নির্ভয়ে থাক"। আমার কথায় তাঁহারা যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। তবে তাঁহারা আমাকে বিশ্বাস করিতেন। তাই আমাকে ইচ্ছামত চলিতেও দিলেন।

আমার হিসাব যে ঠিক হয় নাই তাহা আমি পরে টের পাইয়াছিলাম। কাহাকেও শুদ্ধ করিতে গিয়াও লোকের গভীর জলে নামিতে নাই। যাহাকে সংশোধন করিতে যাওয়া যায় তাহার সহিত মিত্রতা হইতে পারে না। প্রকৃত মিত্রতার ভিতর আত্মার সহিত আত্মার মিলনের ভাব আছে। এই প্রকার মিত্রতা জগতে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সমান গুণযুক্ত লোকের মধ্যেই মিত্রতা শোভা পায় ও টিকিয়া থাকে। মিত্র একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেই। এই জন্য মিত্রত্বে সংশোধন করার অবকাশ খুবই কম। আমার বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিত্রতা করা অনিষ্টকর, কেন না মানুষ চট করিয়া দোষ গ্রহণ করে। গুণ গ্রহণ করিতে অনেক প্রয়াস করিতে হয়। যাহার আত্মার সহিত অথবা ঈশ্বরের সহিত মিত্রতা করিতে হয় তাহার একাকী থাকিতে হয়, অথবা সারা জগতের সহিত মৈত্রী করিতে হয়। উপরে যাহা বলিলাম তাহা যোগ্যই হোক্, অথবা অযোগ্যই হোক্, আমার মিত্রতা বিকশিত করার চেষ্টা নিষ্ফল হইল।

যখন আমি এই মিত্রের সঙ্গে জুটিয়া পড়িলাম তখন রাজকোটে "সংস্কারপন্থী"দের যুগ। অনেক হিন্দু শিক্ষক লুকাইয়া মাংসাহার ও মদ্যপান করিতেন—এই সংবাদ এই মিত্রের নিকট হইতেই পাইলাম। রাজকোটের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকের নামও সে করিল। হাইস্কুলের

কয়েকজন ছাত্রের নামও বলিল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম এবং দুঃখিতও হইলাম। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে আমাকে যে যুক্তি দেখাইল তাহা এই—"আমরা মাংস খাই না বলিয়াই দুর্ব্বল হইয়া আছি। ইংরেজেরা মাংস খায় বলিয়াই আমাদের উপর রাজত্ব করিতে পারে। আমার শরীর কত শক্ত, আমি কত দৌড়াইতে পারি তাহা ত তুমি জান। আমি মাংসাহার করি বলিয়াই এমন হইয়াছি। মাংসাহারীদের ফোঁড়া পাঁচড়া ইত্যাদি হয় না, যদি হয় তবে শীঘ্রই সারিয়া যায়। আমাদের শিক্ষকেরা খান্, এত নামজাদা লোক খান্ তাঁহারা কি না বুঝিয়াই খান্? তোমারও খাওয়া উচিত। খাইয়া দেখ, দেখিবে তোমারও আমার মত গায় জোর হইয়াছে।"

এ সমস্ত কথা সে কিছু এক দিনেই বলে নাই। এই সকল কথা অনেক বার অনেক হেতুদ্বারা অনেক দিনে বলিয়াছিল। আমার মধ্যম ভাই তখন তাহার খপ্পরে পড়িয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনি এই সকল যুক্তিতে সহজেই সম্মতি দিলেন। আমার ভাইয়ের তুলনায় ও এই বন্ধুর তুলনায় আমি একেবারে রুগ্ন ছিলাম। তাহাদের শরীর খুব পেশীবদ্ধ ছিল, তাহাদের শরীরে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী বল ছিল। তাহারা ঢের বেশী সাহসী ছিল। এই বন্ধুটির পরাক্রম আমাকে মুগ্ধ করিত। সে যতদূর ইচ্ছা দৌড়াইতে পারিত। লম্বা-লাফ বা খাড়া-লাফ—এই দুই কস্‌রতেও সে ওস্তাদ ছিল। মার খাওয়ার শক্তিও তাহার যথেষ্ট ছিল। সে সময় সময় আমাকে এই সকল শক্তি প্রদর্শন করিত। নিজের মধ্যে যে শক্তি নাই, অপরের মধ্যে তাহা দেখিলে মানুষ আশ্চর্য্য হইয়া যায়। আমারও তাহাই হইয়াছিল। আমার দৌড়-ধাপের শক্তি ছিল না বলিলেই চলে।

সুতরাং ভাবিতাম—আমি যদি এই বন্ধুটির মত বলবান হই তবে কি মজা হয়! তাহা ছাড়া আমি আবার ভারি ভীরুও ছিলাম। চোরের ভয়, ভূতের ভয়, সাপের ভয় আমাকে পাইয়া বসিত। এই ভয়ের জন্য আমি খুব কষ্টও পাইতাম। রাত্রে কোথাও একলা যাওয়ার সাহস আমার ছিল না। অন্ধকারে ত কোথাও যাইতাম না। বাতি না জ্বালিয়া শোয়াও প্রায় অসম্ভব ছিল। এখানে ভূত, ওখানে চোর, সেখানে সাপ! সুতরাং প্রদীপ জ্বালাইয়া শোয়া ছিল আমার পক্ষে অনিবার্য্য। পাশে শুইয়া আছেন যে স্ত্রী তিনি এখন কতকটা যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কাছে এ ভয়ের কথা কি করিয়া বলি। আমার চাইতে তিনি অনেক সাহসী বলিয়াই আরো লজ্জা হইত। সাপাদির ভয় কি তাহা তিনি কোনও দিন জানিতেন না। অন্ধকারে একা চলিয়া বেড়াইতেন। আমার এই দুর্ব্বলতার কথা কেবল সেই বন্ধুই জানিত। আমাকে বলিত যে, সে জীবন্ত সাপ হাতে করিয়া ধরিতে পারে। চোরকে সে ডরায় না। ভূতও সে মানে না। সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, এ সকলই তাহার মাংসাহারের জন্য।

এই সময় নর্ম্মদের লেখা নীচের গান স্কুলের ছেলেরা গাইত :—

ইংরাজ রাজত্ব করে—
দেশীকে রাখে দাবিয়া,
লম্বায় সে পাঁচ হাত পুরা
মাংসাহারী বলিয়া।

এই সকলের প্রভাব আমার মনের উপর খুব হইল। আমি পরাজিত হইলাম। মাংসাহার করা ভাল, তাহাতে আমি বলবান ও সাহসী হইব, আর সমস্ত দেশের লোক যদি মাংসাহার করে তবেই

ইংরাজদিগকে হারাইতে পারে—এই প্রকার আমি মনে করিতে লাগিলাম। মাংসাহার করার দিনও স্থির হইল।

এই মাংসাহার করিতে স্থির করা—এই আরম্ভ, ইহার অর্থ সকল পাঠক বুঝিতে পারিবেন না। গান্ধী পরিবার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত। আমার বাপ-মা গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। হামেশাই তাঁহারা হাবেলীতে (মন্দির) যাইতেন। কতকগুলি মন্দির এই পরিবারেরই ছিল—একথাও বলা যায়। এতদ্ভিন্ন গুজরাটে জৈন-সম্প্রদায় খুব শক্তিশালী। তাহাদের প্রভাব প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেক কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই হেতু গুজরাটে মাংসাহারের প্রতি যে বিরুদ্ধভাব, যে ঘৃণা জৈন ও বৈষ্ণবদিগের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়, সে প্রকার ভারতবর্ষে অথবা সারা জগতে আর কোথাও দেখা যায় না—ইহাই আমার সংস্কার।

আমি পিতামাতার পরম ভক্ত। তাঁহারা যদি আমার মাংসাহারের কথা শুনেন তবে, নিঃসংশয়ে তখনই মারা যাইবেন, ইহা আমি জানিতাম। জানিয়াই হোক্ আর না জানিয়াই হোক্ আমি সত্যের সেবক ছিলাম। মাংসাহার করায় যে মাতাপিতাকে ঠকানো হইতেছে এ জ্ঞান আমার তখন ছিল না—একথাও আমি বলিতে পারি না। এ অবস্থায় আমার পক্ষে মাংসাহার করার সঙ্কল্প বাস্তবিকই অত্যন্ত সঙ্কটজনক ও ভয়ানক বস্তু ছিল। কিন্তু আমাকে ত "সংস্কার" করিতে হইবে। মাংসাহারের সখ আমার ছিল না। মাংসের স্বাদের জন্য আমার মাংসাহারের ইচ্ছা ছিল না। আমাকে যে বলবান ও সাহসী হইতে হইবে, অপরকেও সেই প্রকার করিতে হইবে, তাহার পর ইংরাজকে হারাইয়া দেশ স্বাধীন করিতে হইবে! স্বরাজ্য শব্দ তখন শুনি নাই। কিন্তু এই সংস্কারের মোহই আমাকে অন্ধ করিয়াছিল।

৭

দুঃখের কথা—২

নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল। আমার অবস্থার সম্পূর্ণ বর্ণনা করা কঠিন। একদিকে সংস্কার করার আগ্রহ, জীবনের পরিবর্ত্তন করায় নূতনত্ব, অপর দিকে চোরের মত সৎকার্য্য করার লজ্জা—ইহাদের মধ্যে কোন ভাবটা প্রধান ছিল তাহা স্মরণ নাই। আমরা নদীর ধারে নিরালা খুঁজিতে গেলাম। দূরে গিয়া, কেহ না দেখিতে পারে এমন কোণে প্রবেশ করিয়া যাহা কখন দেখি নাই সেই বস্তু—মাংস দেখিলাম। সঙ্গে পাঁউরুটি ছিল। দুইয়ের এক বস্তুও রুচিল না। মাংস চামড়ার মত লাগে। খাওয়া অসম্ভব হইল। আমার বমি আসিতে লাগিল। খাওয়া ত্যাগ করিতে হইল।

সে রাত্রি বড় কষ্টে কাটিল। ঘুম আসে না। স্বপ্নে দেখি যেন ছাগল জীয়ন্ত হইয়া পেটের ভিতর গিয়াছে ও করুণস্বরে ডাকিতেছে। ভয় পাইয়া উঠি—পশ্চাত্তাপ হয়। আবার বিচার করি যে, আমার মাংসাহার ত করাই চাই, সাহস যেন না হারাই। বন্ধুটিও হার মানার পাত্র ছিল না। মাংস নানা রকমে রান্না করিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিত। নদীর তীরে না গিয়া কোনও বাবুর্চীর সহিত ব্যবস্থা করিয়া লুকাইয়া এক দরবারী গৃহে সুসজ্জিত টেবিল-চেয়ারের প্রলোভনের মধ্যে সে আমাকে আনিয়া ফেলিল। ইহার ফলও ফলিল। রুটির উপর আমার বিতৃষ্ণা কমিল, ছাগলের জন্য মায়া পালাইল এবং মাংস নয়—মাংসযুক্ত পদার্থের স্বাদ পাইতে লাগিলাম। এই প্রকার এক বৎসরে

পাঁচ ছয় বার মাংস খাওয়া হইয়াছিল। সবসময় দরবারী বাড়ী পাওয়া যাইত না। সব সময় মাংসের সুস্বাদু ভাল খাদ্যও প্রস্তুত করা যাইত না। এই প্রকার ভোজনে পয়সাও লাগে। আমার কাছে কাণাকড়িও ছিল না। এই জন্য আমাকে দিয়া কোনও সুবিধা হওয়ার উপায়ও ছিল না। এই খরচা সেই বন্ধুকেই যোগাইতে হইত। সে কোথা হইতে যে পয়সা সংগ্রহ করিত তাহা আজ পর্য্যন্তও জানিতে পারি নাই। তাহার আশা ছিল, আমাকে মাংসখোর করিয়া ফেলিবে। সে জন্য যাহা খরচা করা দরকার তাহা সেই করিত। তবে তাহার কাছে কিছু অফুরন্ত অর্থ ছিল না। সুতরাং এরূপে ভোজের ব্যবস্থা ক্বচিৎ কখনই হইত।

যেদিন এই খানা খাওয়া হইত সেদিন বাড়ীতে যাইয়া আর খাওয়া যাইত না। মা খাইতে ডাকিতেন। তাঁহাকে বলিতাম—'আজ ক্ষুধা নাই'—'আজ হজম হয় নাই'। এই ধরণের নানা বঞ্চনা বাক্য রচনা করিতে হইত। এ সব কথা বলিতে প্রতিবারেই মনে আঘাত লাগিত। একে ত মিথ্যা, তাহাও আবার মায়ের সাম্‌নে! আর যদি বাপ-মা জানেন যে, ছেলে মাংসাহার করিতেছে তবে তাঁহাদের মাথায় বজ্র পড়িবে। এই চিন্তা আমার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করিত। আমি স্থির করিলাম যে, মাংস খাওয়ার আবশ্যক আছে, মাংসাহার প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের সংস্কার করিব, কিন্তু পিতামাতাকে ঠকানো ও মিথ্যা বলা, মাংস না খাওয়া অপেক্ষাও খারাপ। সুতরাং পিতামাতা জীবিত থাকিতে আর মাংস খাইব না। তাঁহাদের মৃত্যুর পর খোলাখুলি ভাবে মাংস খাইব ও সে সময় না আসা পর্য্যন্ত মাংসাহার ত্যাগ করিব। এই প্রতিজ্ঞার কথা আমি বন্ধুকেও জানাইয়া দিলাম। সেই যে মাংসাহার ছাড়িয়াছি আর

কথনও মাংস খাই নাই। পিতামাতা কখনো জানেন নাই যে, তাঁহাদের দুই পুত্র মাংসও আহার করিয়াছে।

পিতামাতার নিকট মিথ্যা ব্যবহার করিব না বলিয়া মাংসাহার ছাড়িলাম কিন্তু বন্ধুকে ছাড়িলাম না। তাহাকে সংস্কার করিতে গিয়া আমি নিজেই কলুষিত হইলাম, আর এই কলুষের জ্ঞানও আমার হৃদয়ের কাছে অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

তাহার সঙ্গ আমাকে ব্যভিচারীও করিত। কিন্তু ঈশ্বর যদি বাঁচাইতে চাহেন, তবে পতনের ইচ্ছা থাকিলেও লোক পবিত্র থাকিয়া যায়। বন্ধু আমাকে একদিন এক বেশ্যা-গৃহে লইয়া গেল। সমস্ত ব্যবস্থাই পূর্ব্ব হইতে ঠিক করা ছিল। টাকাও দেওয়া হইয়া গিয়াছিল। আমি একেবারে পাপের মুখের ভিতর গিয়া পড়িলাম। কিন্তু ভগবানের অপার করুণা আমাকে রক্ষা করিল। সেই গৃহে গিয়া আমি যেন অন্ধের মত হইয়া গেলাম। আমার কথা বলার মত শক্তিও ছিল না। লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া সেই স্ত্রীলোকের পাশে খাটিয়ায় বসিয়াছিলাম। স্ত্রীলোকটি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে দুই চার কথা আমাকে শুনাইল, তারপর আমাকে দরজা দিয়া বাহির করিয়া দিল।

তখন আমার পুরুষত্ব লাঞ্ছিত হইল বলিয়া মনে হইয়াছিল, পৃথিবী ফাঁক্ হোক্ আমি প্রবেশ করি, লজ্জায় এমনি মনে হইতেছিল। কিন্তু আজ সেদিনকার উদ্ধার ঈশ্বরের কৃপা বলিয়া মনে করিতেছি। এই ধরণের ঘটনা আমার জীবনে আরও দুই চার বার হইয়াছে। তাহাতেও বিনা চেষ্টায় কেবল ঘটনার সংযোগ বশতঃ আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। কিন্তু বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে ত এই ঘটনায় আমি পতিত হইয়াছি বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। মনে মনে ভোগের ইচ্ছাই আমার ছিল। সুতরাং

তাহা কার্য্য করারই অনুরূপ। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে ইচ্ছা থাকিলেও প্রত্যক্ষ ভাবে পাপের কাজ না করিলে তাহাকে বাঁচিয়া যাওয়া বলে। আমিও এই অর্থেই বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা নিষ্পন্ন না করিলেই, সেই ব্যক্তির ও তাহার সহবাসে যাহার আসে তাহাদের পক্ষে তাহা অত্যন্ত কল্যাণকর হয় এবং যাহার বিচারবুদ্ধি আছে সে তখন সেই কার্য্য হইতে বাঁচিয়া যাওয়াটা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়াই মনে করে। কেহ পতিত না হওয়ার জন্য চেষ্টা সত্বেও পতিত হয়, আবার কেহ পতিত হওয়ার ইচ্ছা করিয়াও ঘটনা-সংযোগ বশতঃ বাঁচিয়া যায়—ইহা আমরা দেখিয়াছি। ইহার মধ্যে কতটা পুরুষার্থ আর কতটাই বা দৈব, কি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অবশেষে পতিত হয়, অথবা বাঁচিয়া যায়—এ সকল গূঢ় প্রশ্ন। তাহার সমাধান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই এবং কোনও দিন হইবে কিনা তাহাও বলা কঠিন। কিন্তু এখন আমরা বক্তব্য বিষয়েই ফিরিয়া আসি।

বন্ধুটির মৈত্রী যে অনিষ্টকর, সে কথা উক্ত ঘটনাতেও আমার বুদ্ধিতে আসিল না। সুতরাং আরও কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাকে সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল। তারপর তাহাতে যে দোষ থাকার কথা জানিতাম না তাহাও যখন প্রত্যক্ষ করিলাম, তখনই আমার চোখ খুলিল। যতটা পারি সময়ের অনুক্রম অনুসারেই আমার অভিজ্ঞতা লিখিয়া যাইতেছি। তাই এই দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার বিষয়টি পরে আসিবে।

এই সময়ের আর একটা কথাও বলা দরকার। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইত—যে কলহ হইত তাহার কারণও আমার এই বন্ধুটি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি সংশয়-পরায়ণ হইলেও প্রেম-প্রবণ পতি ছিলাম। এই বন্ধুই আমার

সংশয় বাড়াইয়া দিয়াছিল। কারণ তাহার কথার সত্যতার উপর আমার অবিশ্বাস হইত না। তাহার কথা শুনিয়া আমার ধর্ম্মপত্নীকে আমি কত দুঃখই না দিয়াছি! এই অত্যাচারের জন্য আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করিতে পারি নাই। হিন্দু স্ত্রীরা এই লাঞ্ছনা সহ্য করে। সেই জন্যই আমি সর্ব্বদা স্ত্রীদিগকেই সহনশীলতার মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করিয়া থাকি। চাকরের উপর যদি মিথ্যা সন্দেহ হয় তবে চাকর চাকরী ছাড়িয়া দিতে পারে, যদি পুত্রের উপর সন্দেহ পড়ে, তবে পুত্র পিতার সঙ্গে ঘর করা ছাড়িয়া দেয়, মিত্রে মিত্রে সন্দেহ হইলে মিত্রতা ভাঙ্গিয়া যায়, স্ত্রী যদি স্বামীর উপর সন্দেহ করে তবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আর স্বামীর যদি স্ত্রীর উপর সন্দেহ হয় তবে স্ত্রী বেচারীর দুর্ভোগের অন্তই থাকে না। সে যায় কোথায়? হিন্দু সমাজে যে সব সম্প্রদায় উচ্চ বলিয়া গণ্য, সেই সব সম্প্রদায়ের রমণীরা আদালতে গিয়া বিবাহের বন্ধন কাটাইতে পারে না। তাহাদের জন্য এমনি একদেশ-দর্শী ন্যায় রহিয়াছে! এই ন্যায়ের বলে আমি আমার স্ত্রীকে যে দুঃখ দিয়াছি তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। অহিংসার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভের পর আমার এই সন্দেহ দূর হয়। অর্থাৎ যখন আমি ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা বুঝিলাম, যখন বুঝিলাম পত্নী পতির দাসী নহে, সহচারিণী, সহধর্ম্মিনী, তখনই বুঝিলাম পতি-পত্নী একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগী এবং পরস্পর স্বাধীন বলিয়া, অগ্রাহ্য করার অধিকার পতির যেমন আছে, পত্নীরও তেমনি আছে। ঐ সময়ের দাম্পত্য-জীবনের কথা যখন স্মরণ করি, তখন আমার মূর্খতা ও কামনাসক্ত নিষ্ঠুরতার জন্য নিজের উপর ক্রোধ হয়, এবং বন্ধুটির উপর মোহের জন্য নিজের উপর দয়া উপস্থিত হয়।

৮

চুরি ও প্রায়শ্চিত্ত

মাংসাহার যখন করিয়াছিলাম সেই সময়ের ও তাহার পূর্ব্বের গোটাকত দোষের বর্ণনা করা এখনও বাকী আছে। উহা বিবাহের পূর্ব্বের অথবা তাহার অল্পকাল পরের কথা।

আমার এক বন্ধুর সহিত আমার বিড়ি খাওয়ার সখ হয়। আমার কাছে পয়সা ছিল না। বিড়ি খাওয়ায় কিছু লাভ আছে, অথবা বিড়ির গন্ধ ভাল লাগে, এমন বোধ আমাদের দু'জনের কাহারও ছিল না। ঐ ধোঁয়া বাহির করিতেই কিছু রস আছে—এই প্রকার বোধ হইত। আমার কাকা বিড়ি খাইতেন। তাঁহাকে ও অন্যকে বিড়ির ধোঁয়া বাহির করিতে দেখিয়া আমারও ঐরূপ করিতে ইচ্ছা হইল। পয়সা কাছে ছিল না। সেজন্য কাকা বিড়ি খাইয়া যেটুকু ফেলিয়া দিতেন তাহাই খাইতে আরম্ভ করিলাম।

কিন্তু ঐ রকম বিড়ির টুক্‌রা সব সময় পাওয়া যায় না, আর তাহা হইতে বেশী ধোঁয়াও বাহির হয় না। চাকরের কাছে দু'চারটা পয়সা থাকিত, তাহা হইতেই মধ্যে মধ্যে এক-আধটা চুরি করার অভ্যাস হইল ও বিড়ি খরিদ করিতে লাগিলাম। প্রশ্ন হইল—উহা রাখিব কোথায়? গুরুজনের সম্মুখে বিড়ি খাওয়া? সে ত একেবারেই অসম্ভব। যেমন তেমন করিয়া দুই চার পয়সা চুরি করিয়া কয়েক সপ্তাহ চালাইলাম। ইতিমধ্যে শুনিলাম যে, একরকম লতা আছে (তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি) যাহার পাতা বিড়ির মত করিয়া

খাওয়া যায়। আমরা তাহাই যোগাড় করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলাম।

কিন্তু উহাতে তৃপ্তি হইল না। পরাধীনতা আমার কাছে কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। গুরুজনের আজ্ঞা ছাড়া কিছুই করার জো নাই—এই দুঃখ অসহ্য মনে হইতে লাগিল। অবশেষে নিজেদিগকে ধিক্কার দিয়া আমরা প্রাণত্যাগ করাই স্থির করিলাম।

কিন্তু আত্মহত্যা করা যায় কেমন করিয়া? বিষ কে দিবে? আমরা শুনিলাম যে ধুতুরার বীজ খাইলে মৃত্যু হয়। বনে গিয়া বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। স্থির হইল—আত্মহত্যা করিব। কেদারজীর মন্দিরে গিয়া মরার পূর্ব্বে প্রদীপে ঘি দিলাম। দর্শন করিয়া এক নির্জ্জন কোণও বাছিয়া লওয়া গেল, কিন্তু বিষ খাওয়ার সাহস হইল না। ভাবিলাম যদি শীঘ্র মৃত্যু না হয়? তারপর ভাবিলাম মরিয়াই বা লাভ কি? না হয় পরাধীনতা সহ্যই করা গেল? কিন্তু এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতেও দুই চারটা বীজ মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। তবে বেশী খাওয়ার সাহস হয় নাই। দুই জনেরই মরিতে ভয় হইয়াছিল। তাই স্থির করিলাম—রামজীর মন্দিরে গিয়া দর্শন করিয়া শান্ত হইব ও আত্মহত্যার কথা ভুলিয়া যাইব।

আমি বুঝিয়াছি যে আত্মহত্যার কথা বলা সহজ কিন্তু আত্মহত্যা করা সহজ নয়। সেইজন্য যখন কেহ আত্মহত্যার ধমক দেখায়, তখন তাহা আমার উপর খুব অল্পই প্রভাব বিস্তার করে, অথবা মোটেই প্রভাব বিস্তার করে না—একথাও বলা যাইতে পারে।

এই আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের ফল এই হইল যে, আমরা বিড়ি খাওয়ার ও চাকরের পয়সা চুরি করিয়া বিড়ি কেনার অভ্যাস ভুলিয়া গেলাম।

বড় হইয়া আর বিড়ি খাওয়ার কথা মনে হয় নাই। এই অভ্যাস অসভ্য, খারাপ ও হানিকারক বলিয়া সর্ব্বদাই মনে করি। বিড়ি খাওয়ার এমন প্রচণ্ড নেশা সারা দুনিয়ায় কেন যে আছে তাহাই আমি বুঝিতে পারি না। যে রেলের কামরায় বিড়ি খাওয়া চলিতে থাকে সেখানে বসা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়, উহার ধোঁয়ায় আমার দম বন্ধ হইয়া আসে।

বিড়ির টুক্‌রা চুরি করা এবং সে জন্য চাকরের পয়সা চুরি করা অপেক্ষাও আর এক চুরির দোষ গুরুতর বলিয়া মনে করি। বিড়ির জন্য যখন চুরি করিয়াছিলাম আমার বয়স তখন বার তের বৎসর হইবে, তাহা অপেক্ষা কমও হইতে পারে। কিন্তু এই শেষোক্ত চুরির বেলায় আমার বয়স পনের বৎসর। ব্যাপারটা ছিল—আমার সেই মাংসাহারী ভাইয়ের সোণার তাগার টুক্‌রা কাটিয়া লওয়া। সে টাকা পঁচিশের মত ছোট খাট ধার করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহা কেমন করিয়া শোধ দেওয়া যায় তাহাই আমরা দুই জনে যুক্তি করিতেছিলাম। আমার ভাইয়ের হাতে সোণার নিরেট তাগা ছিল। উহা হইতে এক তোলা সোণা কাটিয়া লওয়া কিছু কঠিন হইল না।

তাগা কাটিলাম। কর্জ্জ শোধ হইল। কিন্তু আমার পক্ষে এই কার্য্য অসহ্য হইয়া পড়িল। ইহার পর আর চুরি না করা স্থির করিলাম। বাবার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া ফেলা দরকার—এইরূপ মনে হইতে লাগিল। কিন্তু জিভ্ সরে না। পিতৃদেবের নিকট যে মার খাইব, সে ভয় ছিল না। তিনি কোনো দিন আমাদের কোনো ভাইকেও তাড়না করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ নাই। কিন্তু তিনি খুব দুঃখ পাইবেন ও হয়ত মাথা কুটিবেন। এই বিপদের ভয়

রাখিয়াও স্বীকার করা চাই, তাহা না হইলে শুদ্ধি হইবে না বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

অবশেষে চিঠি লিখিয়া দোষ স্বীকার করিব ও ক্ষমা চাহিব স্থির করিলাম। আমি চিঠি লিখিয়া হাতে হাতে দিলাম। চিঠিতে সকল দোষই স্বীকার করিয়াছিলাম ও সাজা চাহিয়াছিলাম। তিনি আমার দোষের জন্য নিজেকে কোনও প্রকারে সাজা না দেন সে মিনতিও করিয়াছিলাম এবং ভবিষ্যতে আর চুরি করার মত দোষ করিব না বলিয়াও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বাবার হাতে এই চিঠি দিলাম ও তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িলাম। এই সময় তাঁহার ভগন্দরের ব্যথা চলিতেছিল। সেইজন্য তিনি শুইয়া ছিলেন। খাটের বদলে তিনি তক্তার পাট ব্যবহার করিতেন।

বাবা চিঠি পড়িলেন। চক্ষু হইতে মতির বিন্দু গড়াইতে লাগিল। চিঠি ভিজিয়া গেল। তিনি ক্ষণেকের জন্য চক্ষু বুজিলেন, তারপর চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। চিঠি পড়ার জন্য তিনি উঠিয়া বসিয়াছিলেন—এখন শুইয়া পড়িলেন।

আমি সেইখানেই ছিলাম। পিতৃদেবের দুঃখ বুঝিতে পারিলাম। আমি যদি চিত্রকর হইতাম তবে আজও এই চিত্র নিখুঁত আঁকিতে পারিতাম—আজও ইহা আমার চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট রহিয়াছে।

তাঁহার চক্ষের জলের মুক্তা-বিন্দু আমাকে বিঁধিল। আমি শুদ্ধ হইলাম। এই প্রেম যে অনুভব করিয়াছে সেই জানে—

"প্রেমের বাণে বিদ্ধ যে হয়
জানে সে তার পরিচয়।"

আমার নিকট ইহা অহিংসা তত্ত্বের এক সুস্পষ্ট ব্যবহারিক উদাহরণ হইল। তখন অবশ্য আমি ইহাতে পিতার প্রেম ভিন্ন আর কিছু দেখি নাই। কিন্তু আজ আমি ইহাতে শুদ্ধ অহিংসারই পরিচয় পাইতেছি। এইরূপ অহিংসা যাহাকে ব্যাপকভাবে পাইয়া বসে সে ব্যক্তির স্পর্শে কে না গলিয়া যাইবে? এই ব্যাপক অহিংসার পরিমাপ করা অসম্ভব।

এই প্রকার শান্ত ক্ষমা পিতৃদেবের স্বভাবের প্রতিকূল ছিল। আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, তিনি ক্রোধ করিবেন, কটুবাক্য বলিবেন, হাত বা মাথা কুটিবেন। কিন্তু তিনি দেখাইলেন অপার শান্ত ভাব। আমার দোষ-স্খলনকারী স্বীকৃতিই ইহার কারণ বলিয়া আমি মনে করি। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের দোষ, যাঁহার শোনার অধিকার আছে তাঁহার নিকট খোলাসা করিয়া বলে ও আর না করার প্রতিজ্ঞা করে সে শুদ্ধতম প্রায়শ্চিত্ত করে। আমি জানিয়াছি, আমার স্বীকৃতিতে পিতৃদেব আমার সম্বন্ধে নির্ভয় হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মহান্ প্রেম আমার প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

৯

পিতার মৃত্যু ও আমার লজ্জা

তখন আমার বয়স ষোল বৎসর। পিতৃদেব ভগন্দরের জন্য যে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হইয়াছেন সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সেবার জন্য আমার মা, বাড়ীর একজন চাকর ও আমিই বেশীর ভাগ সময় থাকিতাম। আমার কাজ ছিল নার্সের মত। তাঁহার ঘা ধোয়ানো ও তাহাতে ঔষধ দেওয়া, যদি মলম লাগাইতে হয় তবে তাহা লাগানো, তাঁহাকে ঔষধ খাওয়ানো এবং যদি বাড়ীতেই ঔষধ তৈরী করিতে হয় তবে তাহা করা—এই সকলই ছিল আমার বিশেষ কাজ। রাত্রে সাধারণতঃ আমি তাঁহার পা টিপিয়া দিতাম, তিনি শুইতে বলিলে অথবা তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে আমি ঘুমাইতাম। এই সেবা করা আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এক দিনও এই কাজ আমি বাদ দিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই সময়ে স্কুলেও যাইতাম। সেই জন্য আমার খাওয়া দাওয়ার সময় ব্যতীত বাকী সময়টা স্কুলে ও বাবার সেবাতেই ব্যয় হইত। তিনি যদি যাইতে বলিতেন, অথবা তাঁহার শরীর যদি ভাল থাকিত তবেই সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে যাইতাম।

এই বৎসরে আমার স্ত্রী গর্ভবতী হ'ন। আজ দেখিতেছি যে ইহা দুই প্রকারে লজ্জার বিষয় ছিল। প্রথমতঃ বিদ্যাভ্যাসের সময় যে সংযম পালন করা আমার কর্ত্তব্য ছিল তাহা আমি করি নাই। দ্বিতীয়তঃ এই সময় আমি স্কুলে পাঠ করা যেমন ধর্ম্ম বলিয়া

জানিতাম, তেমনি তদপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম বলিয়া জানিতাম পিতামাতার প্রতি ভক্তিকে, আর সেই জন্য বাল্যকাল হইতেই আমার আদর্শ ছিল 'শ্রবণ'। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-ভোগের বাসনা আমার এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। তাই প্রতিরাত্রে যদিও আমি বাবার পা টিপিয়া দিতাম তবু আমার মন শোওয়ার ঘরের দিকেই দৌড়াইতে থাকিত। আর তাহাও এমন বয়সে যখন স্ত্রী-সংসর্গ ধর্ম্মশাস্ত্র, বৈদ্যশাস্ত্র ও ব্যবহারিকশাস্ত্র অনুযায়ী পরিত্যাজ্য। যখন আমি সেবা হইতে ছুটি পাইতাম তখনই বাবাকে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন মনে শয়ন গৃহে চলিয়া যাইতাম।

পিতৃদেবের রোগ বাড়িতেই লাগিল। বৈদ্য তাঁহার প্রলেপ দিলেন, হকিম তাঁহার মলমপট্টি দিলেন, ঘরোয়া চিকিৎসাও কিছু হইল, ইংরাজ ডাক্তারও নিজের যথাশক্তি করিলেন। ইংরাজ ডাক্তার বলিলেন যে, অস্ত্রোপচারই ইহার চিকিৎসা। কিন্তু পারিবারিক চিকিৎসক বাধা দিলেন। এই বয়সে অস্ত্রোপচার তাঁহার পছন্দ হইল না। অস্ত্রোপচারের জন্য অনেক প্রকারের ঔষধ-পত্র আনা হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল। ঐ বৈদ্যরাজ পারদর্শী ও খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তবুও আমার বিশ্বাস যদি অস্ত্রোপচার করিতে দেওয়া হইত তবে ঘা শুকাইতে বেগ পাইতে হইত না। বোম্বাইয়ের তখনকার খ্যাতনামা সার্জ্জন দ্বারাই অস্ত্রোপচার করার কথা স্থির হয়। কিন্তু সময় শেষ হইয়া থাকিলে ভাল চিকিৎসাই বা কেন করিতে দেওয়া হইবে? অস্ত্রোপচারের জন্য যত কিছু কেনা হইয়াছিল সে সকল লইয়া অস্ত্রোপচার না করিয়া পিতা বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি জীবনের সকল আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দুর্ব্বলতা দিন

ইচ্ছা ছাড়িতে পারে নাই। ইহাতে সেই সেবায় অমার্জ্জনীয় ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে বলিয়া আমি সর্ব্বদাই মনে করি। আর সেই জন্যই আমি একপত্নীব্রত পালন করিয়াও নিজেকে বাসনান্ধ বলিয়া মনে করি। ইহা হইতে মুক্তি পাইতে আমার অনেক সময় গিয়াছিল এবং মুক্তি পাওয়ার পূর্ব্বে অনেক ধর্ম্ম-সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল।

আমার এই ডবল লজ্জার কথা শেষ করবার পূর্ব্বে ইহাও বলিয়া রাখি যে, আমার পত্নীর যে পুত্র হইয়াছিল তাহা দুই চার দিন নিঃশ্বাস লইয়াই চলিয়া গিয়াছিল। অন্য আর কি পরিণামই বা হইতে পারে? যে বাপ-মার অথবা বাল-দম্পতীর সাবধান হওয়া আবশ্যক আছে, তাঁহারা এই দৃষ্টান্ত হইতে সাবধান হইবেন।

১০

ধর্ম্ম দর্শন

ছয় সাত বৎসর বয়স হইতে ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে পাঠাভ্যাস করিয়াছি, কিন্তু ইহার মধ্যে স্কুলে ধর্ম্ম শিক্ষা পাই নাই। তাহা হইলেও চারিদিকের আবেষ্টন হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই স্থানে ধর্ম্মের উদার অর্থ লইতে হইবে। ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মপরিচয়—আত্মজ্ঞান।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আমার জন্ম বলিয়া সময় সময় হাবেলীতে যাইতে হইত। কিন্তু উহাতে শ্রদ্ধা ছিল না। হাবেলীর জাঁকজমক আমার ভাল লাগিত না। হাবেলীতে প্রচলিত দুর্নীতির যে সব কথা শুনিতাম, তাহাতেই আমার মন উহার প্রতি উদাসীন হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য সেখান হইতে কিছুই পাইতে পারি নাই।

যাহা হাবেলীতে পাই নাই, তাহা আমার দাইয়ের নিকট হইতে পাইতাম। তাহার ভালবাসার কথা আজিও মনে আছে। আমি পূর্ব্বে জানাইয়াছি যে, আমি ভূত প্রেতের ভয় পাইতাম। রম্ভা আমাকে বুঝাইত যে রাম নাম উহার ঔষধ। আমার কিন্তু রাম নাম অপেক্ষা রম্ভার উপরেই বেশী শ্রদ্ধা ছিল, সেইজন্য বাল্যকালে ভূত প্রেতের ভয় হইতে বাঁচার জন্য রাম নামের জপ আরম্ভ করি। উহা বেশী দিন টিকে নাই, কিন্তু যে বীজ বাল্যকালে রোপিত হইয়াছিল তাহা বৃথা যায় নাই। রাম নাম আজ আমার কাছে অমোঘ শক্তি। রম্ভা বাঈয়ের রোপিত বীজই তাহার কারণ বলিয়া মনে করি।

আমার এক খুড়তুত ভাই রাম-ভক্ত ছিলেন। কাকা এই সময় আমাদের দুই ভাইয়ের জন্য রাম-রক্ষা পাঠ শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা উহা মুখস্থ করিয়া সাধারণতঃ প্রাতঃকালে স্নানের পর পড়িয়া যাওয়ার নিয়ম করিয়াছিলাম। পোরবন্দরে যতদিন ছিলাম ততদিন উহা চলিয়াছিল। রাজকোটের আবেষ্টনে উহা ভুলিয়া গেলাম। এই পঠন কার্য্যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। বড় ভাইকে মান্য করার জন্য এবং শুদ্ধ উচ্চারণে রাম-রক্ষা পড়িতে হয় এই অভিমানে পাঠ করিতাম।

কিন্তু যে জিনিষ আমার মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা রামায়ণ কথন। পিতৃদেব অসুখের সময় দিনকতক পোরবন্দরে ছিলেন। এই স্থানে তাঁহারা প্রতিদিন রাত্রে রামজীর মন্দিরে গিয়া রামায়ণ শুনিতেন। রামচন্দ্রজীর এক পরম ভক্ত বিল্বেশ্বরের লাধা মহারাজ রামায়ণ পাঠ করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলিত যে, তাঁহার কুষ্ঠ রোগ হইলে তিনি ঔষধ না দিয়া বিল্বেশ্বরের মন্দিরের মহাদেবকে দেওয়া বেলের পাতা ঘায়ের উপরে বাঁধিতেন এবং কেবল রামনাম জপ করিতেন। ইহাতেই তাঁহার কুষ্ঠ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। এ কথা মূলে সত্য হোক্ আর নাই হোক্, আমরা, যাহারা শুনিতে যাইতাম ইহা বিশ্বাস করিতাম। ইহা অন্ততঃ সত্য যে, যে সময় তাঁহাকে আমরা রামায়ণ পাঠ করিতে দেখিয়াছি তখন তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ ছিল। লাধা মহাশয়ের কণ্ঠ মিষ্ট ছিল। তিনি দোঁহা এবং চোপাই গাহিতেন ও অর্থ করিতেন। তিনি নিজে রসে লীন হইয়া যাইতেন ও শ্রোতাদিগকে লীন করিয়া ফেলিতেন। আমার বয়স তখন তের বৎসর, তাঁহার রামায়ণ পাঠে খুব আনন্দ পাইতাম,

একথা স্মরণ আছে। এই রামায়ণ পাঠ হইতেই আমার রামায়ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভিত্তি। আজও আমি তুলসীদাসের রামায়ণ ভক্তি-মার্গের সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ বলিয়া মানি।

কয়েক মাস পরে আমি রাজকোটে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে এমন রামায়ণ পাঠ হইত না। একাদশীর দিনে ভাগবত পাঠ হইত। সেখানে আমি কখন কখন বসিতাম, কিন্তু কথক রস জমাইতে পারিতেন না। আমি ত গুজরাটীতে উহা অত্যন্ত রসের সহিত পাঠ করিয়াছি। আমার একুশ দিনের উপবাসের সময় ভারত-ভূষণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের শ্রীমুখ হইতে মুল সংস্কৃত আবৃত্তির কতক অংশ শুনিয়া আমার মনে হইত যে, যদি বাল্যকালে তাঁহার মত ভগবদ্ভক্তের মুখ হইতে উহা শুনিতাম তবে বাল্যকালেই উহার প্রতি আমার গভীর প্রীতি জাগ্রত হইত। বাল্যকালের সংস্কার—তাহা শুভই হোক্ আর অশুভই হোক্, মনের ভিতর খুব গভীর ভাবে বদ্ধমূল হয়। সেই জন্য এমন উত্তম গ্রন্থ তখন শুনি নাই বলিয়া মনে খেদ রহিয়া গিয়াছে।

রাজকোটে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রতি সমান ভাব রাখার শিক্ষা পাই। হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিই সম্মানের ভাব রাখিতে শিখিয়াছিলাম। কেন না বাবা ও মা হাবেলীতে (বিষ্ণুমন্দিরে) যাইতেন, শিবালয়ে যাইতেন, রামমন্দিরে যাইতেন। আমাদের কয় ভাইকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন অথবা পাঠাইয়া দিতেন।

আবার পিতৃদেবের নিকট জৈন ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যে কেহ না কেহ হামেশাই আসিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেন এবং তাঁহারা তাঁহার সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও সাংসারিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা

বলিতেন। ইহা ভিন্ন বাবার মুসলমান ও পারসী মিত্রও ছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মের আলোচনা তাঁহার সহিত করিতেন। তিনিও সম্মানের সহিত, এবং অনেক সময় রসের সহিত তাহা শুনিতেন। এই সব কথাবার্ত্তার সময় আমি শুশ্রূষার কাজ করিতাম বলিয়া উপস্থিত থাকিতাম। এই সকল আবেষ্টনের প্রভাব আমার উপর পড়িয়া ফল এই হইল যে, সকল ধর্ম্মের প্রতিই আমার মধ্যে সমান ভাব দেখা দিল।

কেবল খৃষ্টধর্ম্মই বাদ ছিল। উহার প্রতি আমার অভক্তি ছিল। সেই সময় হাইস্কুলের এক কোণে দাঁড়াইয়া পাদরীরা কখনও কখনও খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতায় হিন্দু-দেবতা ও হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে গালি দেওয়া হইত। ইহা আমার নিকট অসহ্য লাগিত। মাত্র একদিনই আমি বক্তৃতা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম। কিন্তু সেই একদিনই যথেষ্ট। তারপর আর দাঁড়াইবার প্রয়োজন হয় নাই। এই সময় শোনা গেল এক নামজাদা হিন্দু খৃষ্টান হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও রটিয়া গেল যে, তাঁহাকে খৃষ্টান হওয়ার সময় গোমাংস খাইতে হইয়াছে, মদ খাইতে হইয়াছে ও তাঁহার পোষাকও বদলানো হইয়াছে। এখন তিনি খৃষ্টান হইয়া কোট, পাত্‌লুন ও হ্যাট পরিতেছেন। একথায় আমার মনে ত্রাস উপস্থিত হয়। বাস্তবিক আমি ভাবিতাম—যে ধর্ম্মের জন্য গোমাংস খাইতে হয়, মদ খাইতে হয়, পোষাক বদলাইতে হয়, সে আবার কেমন ধর্ম্ম? আরও শুনিলাম যিনি খৃষ্টান হইয়াছিলেন তিনি তাঁহার পিতৃ-পুরুষদিগের ধর্ম্মের, আচার-নিয়মের ও দেশের নিন্দা আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল হইতেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আমার মনে অভক্তি আসিয়াছিল।

এই প্রকারে সকল ধর্ম্মের প্রতি সমভাব যদিও একটা জাগিয়াছিল তথাপি ঈশ্বরের প্রতি আস্থা উপস্থিত হইয়াছিল—একথা বলা যায় না। এই সময় বাবার পুস্তকগুলি খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন মনুসংহিতার অনুবাদ হাতে পড়িল। উহাতে জগতের উৎপত্তি ইত্যাদির কথা পড়িলাম। পড়িয়া উহার উপর শ্রদ্ধা ত জন্মিলই না বরং উল্টা কতকটা নাস্তিক ভাব আসিল। আমার ছোট কাকার এক ছেলে, তিনি এখনো জীবিত আছেন, তাঁহার বুদ্ধির উপর আমার খুব বিশ্বাস ছিল। তাঁহার নিকট আমার সংশয়ের বিষয় বলিলাম, তিনিও তাহার কিছু সমাধান করিয়া দিতে পারিলেন না। তিনি উত্তর দিলেন—"বয়স হইলে এই সকল প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে পারিবে, এই সকল প্রশ্ন ছেলেদের করিতে নাই।" আমি চুপ করিয়া গেলাম। কিন্তু মনে শান্তি আসিল না। মনুসংহিতার খাদ্যাখাদ্য প্রকরণে ও অন্য প্রকরণেও প্রচলিত প্রথার সহিত বিরোধ দেখিতে পাইলাম। এই সকল সংশয়ের উত্তরেও আমি অনেকটা উপরের ঐ জাবাবই পাইলাম। আমি মনে মনে ঠিক করিলাম—"কোনও দিন বুদ্ধি খুলিবে, তখন পড়িব ও বুঝিতে পারিব।"

এই সময় মনু-স্মৃতি পড়িয়া আমি অন্ততঃ অহিংসার শিক্ষা পাই নাই। আমার মাংসাহারের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মনু-স্মৃতিতে উহার সমর্থন পাইলাম। সর্পাদি ও পোকামাকড় মারা নীতি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। এই সময় ধর্ম্মকার্য্য মনে করিয়া পোকামাকড় ইত্যাদি যে মারিয়াছি সে কথা আমার মনে আছে।

কিন্তু একটা বিষয়ের ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইল—এই জগৎ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার নীতিমাত্রেরই সমাবেশ সত্যে

রহিয়াছে। সত্যেরই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। দিনে দিনে সত্যের মহিমা আমার নিকট বাড়িতে লাগিল—সত্যের সংজ্ঞার বিস্তার বাড়িতে লাগিল, আজও বাড়িতেছে।

একটা গুজরাটী নীতিকথার কবিতাও এইরূপে আমার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়। ইহার উপদেশ—অপকারের বদলে অপকার নহে, উপকারই দিতে পারা যায়—আমার জীবনের আদর্শ হইয়া গেল। উহা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। অপকারীর ভাল করার ইচ্ছার প্রতি অনুরাগ জন্মিল। আমি তাহার অগণিত পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই চমৎকার লাইন কয়টি এইরূপ :—

পান করিবার জল যদি পাও, অন্ন করিও দান,
মিষ্টি কথাটি ভাগ্যে জুটিলে, মাটিতে নোয়ায়ো শির,
কড়ির বদলে দান করে যেয়ো তুমি মোহরের থান,
পরাণ বাঁচালে—জীবন দিবার দুঃখে বরিও বীর।
জ্ঞানী যারা—করে কথা ও কাজের এমনি ক'রেই মিল,
যে কোনো ক্ষুদ্র সেবার তাহারা দশগুণ দেয় ফিরে,
সকল মানুষে এক বলে জানে মহৎ জনের দিল,
অপকার যারা করে তাদেরেও উপকারে রাখে ঘিরে।

১১

বিলাত যাত্রার উদ্যোগ

আমি ১৮৮৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করি। দেশের সাধারণের ও গান্ধী পরিবারের তখন এমনই গরীবী চাল ছিল যে, বোম্বাই ও আহ্‌মেদাবাদ এই দুই স্থানের যে কোনও স্থানে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিলেও কাথিয়াওয়াড়ের লোকেরা বোম্বাই না গিয়া নিকটবর্ত্তী বলিয়া ও সস্তা বলিয়া আহ্‌মেদাবাদে যাওয়াই পছন্দ করিত। আমার বেলাতেও তাহাই হইয়াছিল। রাজকোট হইতে আহ্‌মেদাবাদে এই আমার প্রথম এবং একক ভ্রমণ।

গুরুজনের ইচ্ছা ছিল—পাস করার পর কলেজে গিয়া আরও পড়ি। কলেজ বোম্বাইতে ও ভাওনগরে ছিল। ভাওনগরে খরচ কম বলিয়া সেইখানেই শামলদাস কলেজে পড়িতে যাওয়া ঠিক হইল। সেখানে গিয়া আমি কিছুই বুঝি না, সব মুস্কিল বোধ হয়, অধ্যাপকেরা যাহা পড়ান তাহাতে না পাই আনন্দ, তাহা না পারি বুঝিতে। ইহাতে অধ্যাপকদের দোষ ছিল না। তখনকার দিনে শামলদাস কলেজে যাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক বলিয়া গণ্য ছিলেন। প্রথম কয়মাসের কলেজের পড়া পড়িয়া বাড়ী আসিলাম।

মাভজী দভে নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিদ্বান, ব্যবহার-অভিজ্ঞ ছিলেন এবং আমাদের পরিবারের পুরাতন পরামর্শদাতা বন্ধু ছিলেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পরেও তিনি আমাদের পরিবারের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছিলেন এবং আমার এই ছুটির সময় আমাদের

বাড়ী আসিয়াছিলেন। মা ও দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আমার পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি শামলদাস কলেজে পড়ি শুনিয়া বলিলেন—"সময় বদলাইয়াছে। এই ভাইদের মধ্যে কাহাকেও দিয়া যদি কাবা গান্ধীর স্থান লওয়াইতে চাও তবে শিক্ষিত না করিলে হইবে না। এই ছেলে এখনো পড়িতেছে, কাবা গান্ধীর গদি লওয়ার ভার ইহারই লইতে হইবে। এখনও ত ইহার বি, এ, হইতেই ৪।৫ বৎসর লাগিবে। আর তাহা হইলেও পঞ্চাশ ষাট টাকার চাকুরী মিলিবে, দেওয়ানী পাওয়া যাইবে না। যদি আমার ছেলের মত আইন পড়িতে যায় তাহা হইলে আরো সময় লাগিবে এবং ততদিন দেওয়ানী পাওয়ার জন্য অনেকে ওকালতী পাশ করিয়া আসিয়া জুটিবে। তোমাদের উহাকে বিলাতে পাঠানো দরকার। কেবলরাম (মাভজী দভের পুত্রের নাম) বলে—সেখান হইতে সহজেই ব্যারিষ্টার হইয়া আসা যায়। তিন বৎসর পড়িয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। খরচ চার পাঁচ হাজার টাকার বেশী হইবে না। দেখ না, সেই যে নূতন ব্যারিষ্টার আসিয়াছে সে কেমন জাঁকজমকের সহিত থাকে। সে যদি দেওয়ানী চায় তবে আজই পায়। আমার ত মতে তোমাদের মোহনদাসকে এই বৎসরই বিলাত পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। কেবলরামের বিলাতে অনেক বন্ধু আছে, সে তাহাদের নিকট পরিচয় দিয়া দিলে সেখানে কোনও অসুবিধা হইবে না।" যোশীজী (আমরা মাভজীকে যোশীজী বলিয়া ডাকিতাম) তাঁহার পরামর্শ যে লওয়া হইবেই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ না করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল, বিলাত যাইতে ইচ্ছা হয়, না এইখানেই পড়িবে ?"

আমার কাছে আর ইহা অপেক্ষা প্রিয়তর প্রস্তাব কি হইতে

পারে। কলেজে পড়া চালানো আমার পক্ষে ভয়ের বিষয় ছিল। আমি বলিলাম—"আমাকে বিলাত পাঠাইলে ত খুব ভালই হয়, কলেজে তাড়াতাড়ি পাস করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। তবে আমাকে ডাক্তারী শিখিবার জন্য পাঠান না কেন?"

আমার ভাই ইহাতে বলিলেন—"বাবার ইহা পছন্দ হইত না। তোমার কথাতেই বলিতেন যে, আমাদের বৈষ্ণবদের হাড়-মাস কাটার কাজ করিতে নাই। বাবার ইচ্ছা ত তোমাকে উকীল করাই ছিল।"

যোশীজী যোগ দিয়া বলিলেন—"আমার কাছে ডাক্তারী ব্যবসা গান্ধীজীর মত খারাপ লাগে না। আমাদের শাস্ত্রও ইহার বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু ডাক্তার হইলে ত দেওয়ান হওয়া যায় না। আমার ত মনে হয়, উহার দেওয়ানী বা তাহা অপেক্ষাও বড় কিছু কাজ পাওয়া দরকার। তাহা হইলে ও তোমাদের এত বড় পরিবারের ভার লইতে পারিবে। দিন বদ্‌লাইতেছে আর কঠিনও হইতেছে। এখন ব্যারিষ্টার হওয়াই বিজ্ঞের কাজ।" মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আজ তবে যাই। আমার কথাটা ভাবিয়া দেখিও। যখন আবার আসিব আশা করি, তখন বিলাত পাঠাইবার জন্য তৈরী হইতেছ দেখিব। যদি কোনও অসুবিধা হয় তবে আমাকে জানাইও।"

যোশীজী গেলেন। আমি আকাশ-কুসুম রচনা করিতে লাগিলাম। বড়ভাই চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। টাকার কি করা যাইবে? আমার মত যুবককে এতদূর কেমন করিয়া পাঠানো যায়?

মায়ের ইহা ভাল লাগিল না। তাঁহার এই বিচ্ছেদের কথা মনঃপূত হইল না। তবে প্রথমে তিনি এইরূপ বলিলেন—"আমাদের পরিবারের

মধ্যে তোমার কাকাই বড়। সেইজন্য প্রথমেই তাঁহার মত লইতে হয়। তিনি যদি আজ্ঞা দেন তখন বুঝা যাইবে।"

বড় ভাই অন্য কথা ভাবিতেছিলেন—"পোরবন্দর রাজ্যের উপর আমাদের একটা দাবী আছে। লেলী সাহেব সেখানকার এড্‌মিনিষ্ট্রেটর। আমাদের পরিবার সম্বন্ধে তাঁহার ভাল ধারণা আছে। কাকার উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ আছে। যদি তিনি ঐ রাজ্য হইতে এই খরচের কিছু সাহায্য করেন?"

আমার কাছে ইহা বেশ লাগিল। আমি পোরবন্দর যাইতে প্রস্তুত হইলাম। তখন রেল ছিল না, গো-যানে যাইতে হইত। পাঁচ দিনের রাস্তা ছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমি স্বভাবতঃই ভীরু ছিলাম কিন্তু এখন আমার ভয় চলিয়া গেল। বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা আমাকে চাপিয়া বসিয়াছিল। আমি ধোরাজী পর্য্যন্ত গাড়ী করিলাম। একদিন পূর্ব্বে পঁহুছার জন্য ধোরাজী হইতে উট ভাড়া করিলাম। এই প্রথম আমার উটে চড়ার অভিজ্ঞতা।

পোরবন্দর পঁহুছিলাম। কাকাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম সমস্ত কথা শুনাইলাম। তিনি বিবেচনা করিয়া জবাব দিলেন—"বিলাত যাওয়া আমাদের ধর্ম্ম-সঙ্গত কিনা তাহা আমি জানি না। সকল কথা শুনিয়া আমার মনে ভয় হয়। যে সকল বড় ব্যারিষ্টার আমার সহিত দেখা করিতে আসে তাহাদের চাল-চলন ও সাহেবদের চাল-চলনে আমি কোনও ভেদ দেখি না। তাহাদের পানাহারে কোনও বাধা-নিষেধ নাই। চুরুট ত মুখে লাগিয়াই আছে। পোষাক-পরিচ্ছদও দেখিতে তাহাদেরই মত। এ সকল আমাদের পরিবারে শোভা পায় না। কিন্তু তোমার আকাঙ্ক্ষায় আমি বাধা দিতে চাই না। আমি

অল্প দিনের মধ্যেই যাত্রা করিতেছি। পৃথিবীতে আর অল্পদিনই আমার মেয়াদ আছে। এই সময় আমি তোমাকে বিলাত যাওয়ার—সমুদ্র পার হওয়ার আজ্ঞা কেমন করিয়া দিই? কিন্তু আমি মাঝখানে বিঘ্নও হইতে চাই না। সত্যকার আজ্ঞা দেওয়ার কর্ত্তা তোমার মা। যদি তিনি তোমাকে আজ্ঞা দেন, তবে তুমি আনন্দে যাইও। আমি তোমাকে আটকাইব না—এইটুকু বলিতেছি। আমার আশীর্ব্বাদ ত তোমার উপরে আছেই।"

আমি বলিলাম—"আপনার নিকট হইতে ইহার বেশী আশা করি না। এখন মাকে রাজী করাইতে হইবে। তবে লেলী সাহেবের নিকট পরিচয়-পত্র দিবেন ত?"

কাকা বলিলেন—"সে আমি কেমন করিয়া দিব? তবে সাহেব ভাল লোক। তুমি চিঠি লেখ। পরিবারের পরিচয় পাইলে তোমার সহিত তিনি অবশ্যই দেখা করিবেন, এবং যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় তবে সাহায্যও করিবেন।"

জানি না কাকা সাহেবের নিকট পত্র কেন দিলেন না। তবে আমার অস্পষ্ট মনে হয় যে, বিলাত যাওয়া অধর্ম্ম কার্য্য মনে করিয়া তাহাতে এই সহজ সাহায্য দিতেও তাঁহার সঙ্কোচ হইতেছিল।

আমি লেলী সাহেবকে চিঠি লিখিলাম। তাঁহার নিজের থাকার বাংলায় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি বাংলার সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সাহেবের সাক্ষাৎ পাইলাম। "আগে তুমি বি, এ পাশ দাও তাহার পর আমার সহিত দেখা করিও, এখন কোনও সাহায্য করা হইবে না।"—এই কথা বলিয়াই তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। আমি বিশেষভাবে তৈরী হইয়া অনেকগুলি কথা মুখস্থ করিয়া

গিয়াছিলাম, নীচে নামিতেই দুই হাতে সেলামও করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সকল শ্রমই ব্যর্থ হইল। এইবার আমার দৃষ্টি পড়িল আমার স্ত্রীর গহনার উপরে। বড়ভাইয়ের উপর অপার শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার উদারতার সীমা ছিল না। আমার উপর তাঁহার পিতার ন্যায় ভালবাসা ছিল।

আমি পোরবন্দর হইতে বিদায় হইলাম। রাজকোটে আসিয়া সমস্ত কথা শুনাইলাম। যোশীজীর সহিত কথাবার্তা বলিলাম। তিনি টাকা কর্জ্জ করিয়াও আমাকে বিলাতে পাঠাইতে বলিলেন। আমি আমার স্ত্রীর গহনা বেচিয়া ফেলার প্রস্তাব দিলাম। উহাতে বড়জোর দুই তিন হাজার টাকা হইতে পারে। যেমন করিয়া পারেন টাকা যোগাইবার ভার ভাই-ই লইলেন।

কিন্তু মাকে কি বুঝানো যায়? তিনি নানারকম অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেহ বলে—যুবকেরা বিলাত গিয়া নষ্ট হইয়া যায়, কেহ বলে—সেখানে মাংসাহার করে, কেহ বলে—সেখানে মদ না খাইলে চলেই না। মা এসব কথা আমাকে শুনাইলেন। আমি বলিলাম—"তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার না? আমি তোমাকে প্রতারণা করিব না। দিব্য লইয়া বলিতেছি যে, ঐ তিন দ্রব্য হইতে নিজেকে বাঁচাইব। এত যদি ভয় থাকিত তবে যোশীজী কি আমাকে যাইতে দিতেন?"

মা বলিলেন—"তোমার উপরে আমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু দূর-দেশে কেমন করিয়া থাকিবে? কি যে করিব—আমার বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না। আমি বেচারজী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিব।"

বেচারজী মোঢ় বানিয়া হইতে জৈন সাধু হইয়াছেন। ইনি যোশীজীর

মতই আমাদের পরিবারের পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি সাহায্য করিলেন। তিনি বলিলেন—"ছেলের নিকট হইতে ঐ তিন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা লইব। তারপর উহাকে যাইতে দিলে আর কোনও ক্ষতি হইবে না।" তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন এবং আমি মাংস মদ ও স্ত্রীসংসর্গ হইতে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞা লইলাম। মা আজ্ঞা দিলেন।

হাইস্কুলে বিদায়-অভিনন্দন হইল। রাজকোটের এক যুবক বিলাত যাইতেছে ইহা এক আশ্চর্য্য ঘটনা। অভিনন্দনের জবাব দেওয়ার জন্য আমি কিছু লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু জবাব দেওয়া কালে তাহা পড়াই হইল না। মাথা ঘুরিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল—একথা স্মরণ আছে।

গুরুজনের আশীর্ব্বাদ লইয়া বোম্বাই যাওয়ার জন্য বাহির হইলাম। বোম্বাইয়ে এই প্রথম যাওয়া। বড় ভাই সঙ্গে আসিলেন।

কিন্তু ভালকাজে ত বিঘ্ন হইবেই। বোম্বাইয়ের বাধা শীঘ্র কাটার মত ছিল না।

১২

জাতিচ্যুত

মাতার আজ্ঞা ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া, কয়েক মাসের এক খোকার সহিত স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া আমি মনের আনন্দে বোম্বাই পঁহুছিলাম। পঁহুছিলাম সত্য, কিন্তু সেখানকার বন্ধু-বান্ধবেরা ভাইকে বলিলেন যে, জুন জুলাই মাসে ভারত-মহাসাগরে ঝড় হয়—আর আমার এই প্রথম সমুদ্র যাত্রা। সুতরাং দীপান্বিতার পর অর্থাৎ নভেম্বর মাসে আমাকে পাঠানো ভাল। আবার একজন ঝড়ে একখানা জাহাজ-ডুবির খবর দিলেন। এইরূপ বিপদের মুখে আমাকে পাঠাইতে ভাই রাজি হইলেন না। তিনি আমাকে বোম্বাইএ এক বন্ধুর নিকট রাখিয়া নিজের চাকুরীতে যোগ দেওয়ার জন্য রাজকোটে ফিরিয়া গেলেন। এক ভগ্নিপতির নিকট আমার যাওয়ার খরচ রাখিয়া গেলেন ও আমাকে সাহায্য করিতে কয়েকজন বন্ধুকেও বলিয়া গেলেন।

বোম্বাইএ আমার দিন আর কাটিতে চায় না। আমি বিলাতের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

এদিকে জাতির মধ্যে চঞ্চলতা উপস্থিত হইল। জাতির লোকদের লইয়া সভা ডাকা হইল। এপর্য্যন্ত কোনও মোঢ় বাণিয়া বিলাত যায় নাই। আমি যদি যাইতে চাই তবে, জাতির সম্মুখে আমাকে হাজির হইতে হইবে। আমার উপর জাত-ভাইয়ের বাড়ীতে হাজির হওয়ার আদেশ আসিল।

আমি সভায় উপস্থিত হইলাম। হঠাৎ কোথা হইতে আমার সাহস

আসিল। আমার হাজির হইতে সঙ্কোচ হইল না, ভয় হইল না। জাতির প্রধান ব্যক্তি—শেঠের সহিত আমাদের দূর সম্পর্কও ছিল। পিতার সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ত বেশ ভাল রকমই ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন—"জাতির বিচারে তোমার বিলাত যাওয়া ঠিক নয়। আমাদের ধর্ম্মে সমুদ্র লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ। তাহা ছাড়া আরও শুনিয়াছি যে, বিলাতে ধর্ম্ম রাখিয়া চলা যায় না। সেখানে সাহেবদের সঙ্গেই পানাহার করিতে হয়।"

আমি জবাব দিলাম—"আমি ত বুঝি, বিলাত যাওয়ায় কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। আমাকে সেখানে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবে। যে সব বিষয়ে আপনাদের ভয় আছে সে সকল হইতে দূরে থাকার জন্য আমি মাতাজীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সুতরাং আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি যে, আমি সে সকল হইতে দূরে থাকিতে পারিব।"

শেঠ বলিলেন—"কিন্তু আমরা তোমাকে বলিতেছি, সেখানে গেলে ধর্ম্ম থাকে না। তুমি জান, তোমার পিতার সহিত আমার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল। আমার কথা তোমার শোনা সঙ্গত।"

আমি বলিলাম—"আপনার সহিত সম্বন্ধের কথা আমি জানি, আপনি আমার গুরুজন। কিন্তু এ বিষয়ে আমি একান্ত নিরুপায়। আমার বিলাত যাওয়ার সঙ্কল্প আমি ত্যাগ করিতে পারিব না। আমার পিতৃদেবের মিত্র ও পরামর্শ-দাতা এক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন; তিনি বলেন যে, বিলাত যাওয়ায় কোনও দোষ নাই। আমার মায়ের ও ভাইয়ের আজ্ঞাও আমি পাইয়াছি।"

"কিন্তু জাতের হুকুম কি ঠেলিয়া ফেলিবে?"

"আমি নিরুপায়। আমার মনে হয় জাতির ইহাতে হাত দেওয়া উচিত নয়।"

এই জবাবে শেঠের ক্রোধ হইল। আমাকে তিনি দুই চার কথা শুনাইয়া দিলেন। আমি সহজ ভাবে বসিয়া রহিলাম। শেঠ হুকুম করিলেন—"এই ছোকরাকে আজ হইতে জাতির বাহির বলিয়া জানিবে। যে ইহাকে সাহায্য করিবে, অথবা যে বিদায়ের সময় ইহার সঙ্গে যাইবে তাহাকে পাঁচসিকা জরিমানা দিতে হইবে।"

এই নির্দ্ধারণ আমার উপরে কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। আমি শেঠের নিকট বিদায় লইলাম। কিন্তু ইহার প্রভাব আমার ভাইয়ের উপর কেমন হইবে তাহা বিচার করার বিষয়। তিনি যদি ভয় পান? সৌভাগ্যবশতঃ তিনি দৃঢ় রহিলেন এবং আমাকে জানাইলেন যে, জাতির নির্দেশ সত্ত্বেও তিনি আমার বিলাত-যাত্রা আটকাইবেন না।

এই ঘটনার পর আমি বড় অধীর হইয়া পড়িলাম। ভাইয়ের উপর চাপ দেওয়া হইবে ত! যদি আর কোনও বিঘ্ন আসে? এই প্রকার চিন্তা করিয়া যখন দিন কাটাইতেছিলাম, তখনই খবর পাইলাম যে, ৪ঠা সেপ্টেম্বরের জাহাজে জুনাগড়ের এক উকীল, ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্য বিলাত যাইবেন। যে সকল বন্ধুর কথা দাদা বলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত দেখা করিলাম। এ সুবিধা ছাড়িতে নাই, একথা তাঁহারাও বলিলেন। সময় খুব অল্পই ছিল। ভাইয়ের নিকট তার করিয়া অনুমতি চাহিলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি ভগ্নিপতির নিকট টাকা চাহিলাম। তিনি জাতির হুকুমের কথা বলিলেন এবং সেই সঙ্গেই বলিলেন—তিনি জাতির বাহির হইতে পারিবেন না। পরিবারের এক কুটুম্বের নিকট গেলাম। আমার ভাড়া ইত্যাদির জন্য

যাহা লাগে তাহা এখন দিয়া পরে ভাইয়ের নিকট হইতে তাহা লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, উপরন্তু আমাকে সাহসও দিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম, টাকা লইলাম ও টিকিট কিনিলাম।

বিলাতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষ কিনিবার ছিল, একজন অভিজ্ঞ মিত্রের সাহায্যে তাহা এইবার সংগ্রহ করিলাম। এ সকল জিনিষ আমার ভারি বিচিত্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কতক পছন্দ হইল—কতক হইল না। নেকটাই পরে সখ করিয়া পরিতাম, কিন্তু এখন মোটেই পছন্দ হইল না। ছোট জ্যাকেট পরা আমার কাছে নগ্ন হইয়া থাকার মত বোধ হইল। কিন্তু বিলাত যাওয়ার সখ সাম্‌নে থাকিলে অপছন্দ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসে না। সঙ্গে খাবার যথেষ্ট লইলাম।

জুনাগড়ের সেই উকীল মহাশয়ের নাম ত্র্যম্বকরায় মজুমদার। আমার স্থান, বন্ধুরা তাঁহার ক্যাবিনেই করিয়া দিলেন। আমাকে দেখা-শুনা করার জন্যও তাঁহাকে তাঁহারা বলিয়া দিলেন। তিনি পূর্ণবয়স্ক অভিজ্ঞ গৃহস্থ ছিলেন, আর আমি আঠারো বছরের অনভিজ্ঞ যুবক। আমার সম্বন্ধে মজুমদার মহাশয় মিত্রদিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

এইভাবে ১৮৮৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমি বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিলাম।

১৩

অবশেষে বিলাতে

সমুদ্র-যাত্রায় কাহারও কাহারও (sea-sickness) গা-বমি বোধ হয়। আমার তাহা হয় নাই। তবে আমি অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিলাম। ষ্টুয়ার্ডের সহিত কথা বলিতেও আমার লজ্জা বোধ হইত। এক মজুমদার ছাড়া আর সকল যাত্রীই ইংরাজ ছিলেন। তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে পারিতাম না। তাঁহারা আমার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিলেও আমি তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারিতাম না। বুঝিতে পারিলেও জবাব দিতে পারিতাম না। প্রত্যেক বাক্য বলার পূর্ব্বে মনে মনে সাজাইয়া লইতে হইত। কাঁটা চামচ দ্বারা খাইতে জানিতাম না। কোনও খাদ্য মাংস ছাড়া আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করার সাহসও ছিল না। সেই জন্য খানা-খাওয়ার টেবিলে কখনো যাই নাই—কামরাতেই খাইতাম। আমার সঙ্গে যে মিঠাই ইত্যাদি লইয়াছিলাম প্রধানতঃ তাহারই উপর নির্ভর করিতাম। মজুমদারের কোনও সঙ্কোচ ছিল না। তিনি সকলের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ডেকের উপর স্বাধীনভাবে বেড়াইতেন, আমি সারাদিন কামরায় কাটাইতাম এবং যখন ডেকে লোক কম থাকিত কেবল তখনই অল্প সময়ের জন্য ডেকের উপর ঘুরিয়া আসিতাম। মজুমদার আমাকে সকলের সহিত মিশিতে বলিতেন, খোলাখুলিভাবে কথা বলিতে বলিতেন, আর বলিতেন যে, উকীলের মুখ খোলা হওয়া দরকার। তিনি তাঁহার ওকালতীর গল্প করিতেন। ইংরাজী আমাদের ভাষা নয়,

হা বলিতে ভুল ত হইবেই, তবুও অসঙ্কোচে বলা চাই, ইত্যাদি বলিতেন। কিন্তু আমি আমার ভীরুতা ছাড়িতে পারি নাই।

অবশেষে আমার উপর দয়া করিয়া একজন ভাল ইংরাজ আমার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বয়স বেশী ছিল। আমি কি খাই, কোথায় থাকি, কোথায় যাইব, লোকের সঙ্গে কেন কথাবার্ত্তা বলি না—এই সব কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর আমাকে খাওয়ার সময় খাওয়ার ঘরে যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে আমার মাংস না খাওয়ার কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি হাসিয়া বন্ধু-ভাবে বলিলেন—"এখনো ত (পোর্ট-সৈয়াদ পঁহুছিবার পূর্ব্বে) চলিতেছ, কিন্তু বিস্কে উপসাগরে পঁহুছিলে তখন বুঝিতে পারিবে। ইংলণ্ডে ত এত শীত যে মাংস ছাড়া চলেই না।"

আমি বলিলাম—"সেখানে লোক মাংসাহার না করিয়াও থাকিতে পারে শুনিয়াছি।"

তিনি বলিলেন—"ও মিথ্যা কথা। আমার পরিচিত কেহই নাই যে মাংসাহার করে না। দেখ আমি মদ খাই, তাহা তোমাকে খাইতে বলিতেছি না, কিন্তু মাংসাহার করা দরকার।"

আমি বলিলাম—"আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু উহা না খাওয়ার জন্য মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি। সেই জন্য আমার দ্বারা মাংস খাওয়া হইবে না। যদি উহা না খাইলেই না হয়, তবে হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিব। মাংস কিছুতেই খাইব না।"

বিস্কে উপসাগরে আসিলাম। সেখানে আমি মাংসের বা মদের কোনও আবশ্যকতা বোধ করিলাম না। মাংস যে খাই না সে সম্বন্ধে প্রমাণ-পত্র সংগ্রহ করার ইচ্ছা হইল। সেই ইংরাজ মিত্রটির নিকট

হইতে আমি সার্টিফিকেট লইলাম। তিনি খুসী হইয়া তাহা দিলেন। উহা আমি কিছু দিন পর্য্যন্ত মূল্যবান বস্তুর ন্যায় যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে যখন দেখিলাম যে, মাংস খাওয়া সত্ত্বেও ওরূপ প্রমাণ-পত্র পাওয়া যায়, তখনই এই প্রমাণ-পত্রের উপর হইতে আমার মোহ দূর হয়। বস্তুতঃ যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে প্রমাণ-পত্র দেখাইয়া আমার কি লাভ হইবে?

সুখে দুঃখে পথ শেষ করিয়া আমরা সাউদাম্পটন বন্দরে পঁহুছিলাম। সেদিন শনিবার ছিল বলিয়া মনে আছে। আমি ষ্টীমারে কালো রংএর কাপড়-চোপড় পরিতাম। আমার বন্ধু আমার জন্য একটি সাদা কোট ও পাত্‌লুনও তৈরী করাইয়াছিলেন। আমি বিলাতে নামার সময় মনে করিলাম যে, সাদা কাপড়েই ভাল দেখাইবে। তাই আমি ফ্লানেলের পোষাক পরিয়া নামিলাম। সেপ্টেম্বরের শেষ দিক ছিল। ঐ রকম পোষাক আমি একাই পরিয়াছি দেখিলাম। আমার বাক্স ও চাবি গ্রিণ্ড্‌লে কোম্পানীর হাতে দেওয়া হইয়াছিল। সকলেই ঐরূপ করিতেছে দেখিয়া আমারও ঐরূপ করিতে হইবে ভাবিয়া আমার জিনিষ-পত্র ও চাবি পর্য্যন্ত আমি তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

আমার নিকট চারিখানা পরিচয়-পত্র ছিল—ডাক্তার প্রাণজীবন মেহ্‌তা, দৌলতরাম শুকুল, প্রিন্স রণজিৎ সিংহজী ও দাদাভাই নওরোজীর নামে। আমি সাউদাম্পটন হইতে ডাক্তার মেহ্‌তার নিকট তার করিলাম। ষ্টীমারে একজন ভিক্টোরিয়া হোটেলে উঠিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সেইজন্য মজুমদার ও আমি সেই হোটেলে গিয়াই উঠিলাম। একেত সাদা কাপড়ের জন্য আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলাম, তাহার উপর

আবার হোটেলে যাইয়া যখন খবর পাইলাম যে, পরদিন রবিবার বলিয়া সোমবারে জিনিষ পাওয়া যাইবে তখন একেবারে মুস্‌ড়াইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যা সাতটা আটটার সময় ডাক্তার মেহ্‌তা আসিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। আমাকে লইয়া কৌতুক করিলেন। আমি খেয়াল না করিয়া তাঁহার রেশমের রোঁয়াদার টুপী নামাইয়া লইলাম এবং তাহার উপর উল্টাভাবে হাত বুলাইতে লাগিলাম। ইহাতে সেখানটায় টুপীর রোঁয়া খাড়া হইয়া গেল। ডাক্তার মেহ্‌তা দেখিলেন। তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দোষ যাহা হওয়ার তখন তাহা হইয়া গিয়াছে। তবে ইহার ফলে আমি ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়ার শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম।

এই ব্যাপার হইতেই ইউরোপের আচার-নিয়ম সম্বন্ধে আমার প্রথম পাঠ সুরু হয়। ডাক্তার মেহ্‌তা হাসিতে লাগিলেন ও নানা কথা বুঝাইতে লাগিলেন—কাহারও জিনিষ ছুঁইও না, পরিচয় না থাকিলেও ভারতবর্ষে আমরা যেমন প্রশ্ন করিতে পারি এখানে তাহা চলিবে না। জোরে কথা বলিও না। ভারতবর্ষে সাহেবের সঙ্গে কথা বলিতে 'সার' বলার রীতি আছে। উহা অনাবশ্যক। এখানে চাকর—মনিবকে, অথবা উপরের কর্ম্মচারীকে 'সার' বলে। তাঁহার সহিত হোটেল-খরচের সম্বন্ধেও কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, কোনও গৃহস্থ পরিবারে থাকা ভাল হইবে। এ বিষয় আরও আলোচনা সোমবার পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইল। কিছু উপদেশ দিয়া ডাক্তার মেহ্‌তা বিদায় লইলেন।

হোটেলে থাকিতে আমাদের দুইজনেরই বিরক্তি বোধ হইতেছিল। হোটেলের খরচও অতিরিক্ত। মাল্টা হইতে এক সিন্ধী যাত্রী উঠিয়া-

ছিলেন। মজুমদারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। তিনি লণ্ডনে পুরাণো হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের জন্য দুইটা কামরা খুঁজিয়া দেওয়ার ভার লইলেন। আমরা সম্মত হইলাম। সোমবার জিনিষ পাইলে হোটেলের বিল চুকাইয়া সিন্ধী ভাইয়ের ঠিক করা কামরায় গিয়া উঠিলাম। আমার স্মরণ হয়, আমার ভাগে হোটেল-বিল প্রায় তিন পাউণ্ড পড়িয়াছিল। আমি স্তম্ভিত হইলাম। তিন পাউণ্ড দিয়াও না খাইয়াই ছিলাম। হোটেলের খাদ্যদ্রব্য ভাল লাগিত না। একটা জিনিষ লইলাম তাহা ভাল লাগিল না, আর একটা আনাইলাম—দাম দুইটারই দিতে হইল। আমি বোম্বাই হইতে যে খাবার আনিয়াছিলাম তাহাই খাইয়া ছিলাম বলা চলে।

সেই কামরাতে আসিয়াও আমি মন-মরা হইয়া রহিলাম। দেশের কথা কেবল মনে হইত। মায়ের ভালবাসা মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়। রাত হইলে চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। ঘরের অনেক কথা মনে হইয়া ঘুম আর আসে না। এই দুঃখের কথা কাহাকে বলারও নয়। বলিয়া লাভ কি? আমি নিজেই জানিতাম না যে, কি প্রকারে মনকে শান্ত করিব। এখানকার লোক বিচিত্র, জীবন-যাত্রা বিচিত্র, ঘরও বিচিত্র। বাড়ীতে থাকার রীতি-নীতিও অজানা। কি বলিলে, কি করিলে রীতি ভঙ্গ হয় সে সম্বন্ধেও কোনও জ্ঞান ছিল না। তাহার উপর নিরামিষ আহারের ব্যাপার ছিল। যাহা খাইতে দিত তাহা বিস্বাদ লাগিত। আমার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। বিলাত আসিয়াছি—এখন ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, দেশে ফিরিয়া যাওয়া চলিতেই পারে না। তিন বৎসর এখানে পূর্ণ করিয়া যাইতেই হইবে।

১৪

আমার পছন্দ

ডাক্তার মেহ্‌তা সোমবার ভিক্টোরিয়া হোটেলে আমার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, সেখান হইতে আমার নূতন ঠিকানা পাইয়া এইখানেই দেখা করিতে আসিলেন। আমার মূর্খতার জন্য ষ্টীমারে দা'দ হইয়াছিল। ষ্টীমারে নোনা জলে স্নান করিতে হইত। সে জলে সাবান ব্যবহার চলে না। আমি সাবান ব্যবহার করা সভ্যতা মনে করিতাম। সেইজন্য সাবান মাখায়—শরীর সাফ্‌ হওয়ার পরিবর্ত্তে চট্‌চটে হইত। ডাক্তারকে দেখাইলাম। তিনি আমাকে এসেটিক্‌ এসিড্‌ দিলেন। এই ঔষধ লাগাইয়া আমাকে কাঁদিতে হইয়াছিল। ডাক্তার মেহ্‌তা আমার কামরা দেখিয়া মাথা ঝাঁকাইয়া অপছন্দ জানাইলেন। বলিলেন—"এ জায়গায় তোমার থাকা চলিবে না। এ দেশে আসিয়া পড়াশুনা করা অপেক্ষা অভিজ্ঞতা লাভ করার দরকার বেশী। এইজন্য কোনও পরিবারের সহিত থাকা আবশ্যক। তাই এখন দিন কতক অন্ততঃ শিক্ষার জন্য......ওখানে তোমাকে রাখিব বলিয়া মনে করিয়াছি। সেখানে তোমাকে লইয়া যাইব।"

আমি তাঁহার প্রস্তাবে উপকৃত বোধ করিয়া উহা স্বীকার করিলাম এবং তাঁহার সেই বন্ধুর নিকট গেলাম। তাঁহার ব্যবহার সদয় ছিল। আমাকে নিজের ভাইয়ের মত রাখিলেন, ইংরাজী রীতি-নীতি শিখাইলেন ও ইংরাজীতে কথা বলায় অভ্যাস করাইলেন। এইবার আমার খোরাকের প্রশ্নটা বড় হইয়া দাঁড়াইল। নূন ও

মসলা ছাড়া শাক ভাল লাগে না। গৃহস্বামিনী আমার জন্য কি রাঁধিবে? সকালে ওট-মিলের জাউ (porridge) দিত, উহা দিয়াই পেট ভরাইতাম। কিন্তু দুপুরে ও সন্ধ্যায় প্রায় না খাইয়াই থাকিতে হইত। বন্ধুবর রোজ মাংসাহার করার জন্য বুঝাইতেন। আমি প্রতিজ্ঞার কথা শুনাইয়া দিতাম। তাঁহাকে তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিতাম না। দুপুরে কেবল রুটি, পালংএর ভাজি ও মোরব্বা খাইয়া থাকিতাম। রাত্রেও তাহাই। রুটি দুই তিন টুকরা দিতেন, তাহাতে আমার কি হইবে? কিন্তু চাহিতে লজ্জা হইত। আমার পেট ভরিয়া খাওয়ার অভ্যাস ছিল। পেট বড় ছিল—ক্ষুধাও খুব লাগিত। দুপুরে ও সন্ধ্যায় দুধ ছিল না। আমার এই অবস্থা দেখিয়া বন্ধু চটিয়া গিয়া বলিলেন—"যদি তুমি আমার নিজের ভাই হইতে তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চিত দেশে ফেরৎ পাঠাইয়া দিতাম। নিরক্ষর মায়ের কাছে এখানকার অবস্থা না জানিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে—তাহার মূল্য কি? ইহাকে প্রতিজ্ঞাই বলা যায় না। সেই প্রতিজ্ঞা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা মূর্খতা। আমি বলিতেছি শোন, তুমি এই প্রতিজ্ঞা লইয়া থাকিলে এ দেশে হইতে কিছুই লইয়া যাইতে পারিবে না। তুমিই বলিয়াছ যে, তুমি মাংস খাইয়াছ—তোমার খাইতেও ভাল লাগিয়াছে। যেখানে খাওয়ার কোনও আবশ্যক ছিল না সেখানে খাইয়াছ, আর যেখানে খাওয়া আবশ্যক সেখানে খাইবে না! এ কেমন অদ্ভুত খেয়াল!"

কিন্তু আমি এতটুকুও টলিলাম না।

এই ধরণের তর্ক প্রতিদিনই করিতেন। তিনি যতই বুঝাইতেন,

আমার দৃঢ়তা ততই বাড়িত। রোজ ঈশ্বরের নিকট আমাকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করিতাম। তাঁহার অনুগ্রহও পাইয়াছিলাম। ঈশ্বর কে—তাহা আমি জানি না। কিন্তু সেই রম্ভার দেওয়া শ্রদ্ধা নিজের কাজ করিতেছিল।

একদিন বন্ধু আমার নিকট বেথামের গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। উপযোগিতা-বাদের বিষয় পড়িলেন। আমি বুদ্ধিতে থই পাইলাম না। ভাষা উঁচু দরের ছিল, আমি বুঝিলাম না। তিনি উহা বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন। আমি উত্তরে বলিলাম—"আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। আমি ইহার কোনও কথাই বুঝিতেছি না। মাংস খাওয়া উচিত—একথা আমি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞার বন্ধন আমি ভাঙ্গিতে পারিব না। এ বিষয়ে যুক্তি করিয়া পারিব না। যুক্তি করিলেও আমি জিতিতে পারিব না জানি। তবুও আমাকে মূর্খ মনে করিয়া অথবা জেদী মনে করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করা ছাড়িয়া দিন। আপনার ভালবাসা আমি বুঝিতে পারি। আপনার বলার হেতু আমি বুঝিতে পারি। আপনাকে আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া গণ্য করি। আমাকে দেখিয়া আপনার দুঃখ হয় বলিয়াই আপনি আগ্রহ করিতেছেন তাহা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমি নিরুপায়। প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে পারিব না।"

বন্ধু বুঝিতে পারিলেন। তিনি পুস্তক বন্ধ করিলেন। "আচ্ছা বেশ, এখন আর যুক্তি-তর্ক করিব না।"—এই বলিয়া চুপ করিলেন। আমি খুসী হইলাম। অতঃপর তিনি আর যুক্তি-তর্ক করেন নাই।

কিন্তু আমাকে লইয়া তাঁহার দুশ্চিন্তা গেল না। তিনি চুরুট খাইতেন, মদ খাইতেন। উহার কোনটাই খাইতে একদিনও বলেন নাই। উল্টা উহা না খাইতেই বলিতেন। মাংস না খাইয়া আমি দুর্ব্বল হইয়া যাইব, ইংলণ্ডে সহজভাবে থাকিতে পারিব না —এই ছিল তাঁহার দুশ্চিন্তা।

এইরূপে এক মাস ধরিয়া আমার শিক্ষা-নবিশীর কাজ চলিল। বন্ধুবরের বাড়ী ছিল রিচ্‌মণ্ডে, এখান হইতে সপ্তাহে দুই একবারের বেশী লণ্ডনে যাওয়া চলিত না। ডাক্তার মেহ্‌তা ও ভাই দলপৎরাম এখন আমার কোনও পরিবারে প্রবেশ করা দরকার বলিয়া মনে করিলেন। ভাই শুক্ল ওয়েষ্ট-কেন্‌সিঙ্গ্‌টনে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার খুঁজিয়া আমাকে সেখানে পাঠাইলেন। গৃহস্বামিনী বিধবা ছিলেন। তাঁহাকে আমার মাংসাহার ত্যাগের কথা বলিলাম। সেই বৃদ্ধা আমার দেখা-শুনার কাজ করিতে স্বীকার করিলেন। আমি সেইখানে রহিয়া গেলাম। এখানেও না খাইয়া দিন কাটিতে লাগিল। আমি বাড়ী হইতে মিঠাই ইত্যাদি চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা তখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। সকল খাদ্যই খারাপ লাগে। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তিনি কি করিবেন। আমি যেমন লাজুক ছিলাম তেমনি রহিয়া গিয়াছিলাম—সেইজন্য বেশী চাহিতে লজ্জা হইত। বৃদ্ধার দুই কন্যা ছিল। তাহারা দুই এক টুক্‌রা রুটি আগ্রহ করিয়া আমাকে বেশী দিত। কিন্তু সে বেচারীরা কি করিয়া জানিবে যে, ঐ আস্ত রুটিখানা খাইলে তবে আমার পেট ভরিবে?

এখন অনেকটা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিয়াছি। পাঠাভ্যাস আরম্ভ করি নাই। সংবাদপত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

ইহা ভাই শুক্লের কৃপায় হইয়াছিল। ভারতবর্ষে আমি কখনো সংবাদপত্র পড়ি নাই। অনবরত পড়িতে পড়িতে পড়ায় সখ জন্মিল। ডেলি নিউজ, ডেলী টেলিগ্রাফ, পেলমেল গেজেট্, ইত্যাদি সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলাইতাম। তাহাতে প্রথমে ঘণ্টাখানেকও লাগিত না।

আমি বেড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার নিরামিষ বা অন্নাহারের স্থান খোঁজার দরকার ছিল। গৃহস্বামিনী বলিয়াছিলেন যে, লণ্ডনে এমন অনেক ভোজনালয় আছে। আমি রোজ দশ বার মাইল হাঁটিতাম। কখনো কখনো গরীবদের ভোজনালয়ে গিয়া পেট ভরিয়া রুটি খাইয়া লইতাম কিন্তু তাহাতে সন্তোষ হইত না। এই রকম ঘুরিতে ঘুরিতে আমি একদিন ফেরিংডন ষ্ট্রীটে পঁহুছিলাম এবং ভেজিটেরিয়ান্ রেষ্টোরাঁ (নিরামিষ ভোজনালয়)— এই নাম পড়িলাম। ছেলেরা মনের মত জিনিষ পাইলে যেমন আনন্দ পায় আমারও তাহাই হইল। হর্ষোৎফুল্ল হইয়া হোটেলে ঢুকিবার পূর্ব্বে আমি কাঁচের জানালার নীচে বিক্রয়ার্থে রক্ষিত সাজানো পুস্তক দেখিলাম। তাহার মধ্যে 'সল্ট'এর "অন্নাহারের মিনতি" নামক পুস্তকখানা দেখিলাম। এক শিলিং মূল্য দিয়া উহা কিনিলাম। তারপর খাইতে বসিলাম। বিলাতে আসার পর এই প্রথম পেট ভরিয়া খাইতে পাইলাম। ঈশ্বর আমার ক্ষুধা মিটাইলেন।

সল্টের পুস্তকখানা পড়িলাম। আমার মনে এই পুস্তকের প্রভাব মুদ্রিত হইল। এই পুস্তক পড়ার পর হইতে আমি ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ বিচার পূর্ব্বক নিরামিষাহার সমর্থন করিতে লাগিলাম। মায়ের কাছে লওয়া প্রতিজ্ঞা এখন বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়া পড়িল। এতদিন পর্য্যন্ত মনে করিতাম যে, সকলে যদি মাংসাহারী হয় তবে ভাল

হয়। কেবল সত্য পালনের জন্য—কেবল প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যই আমি মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা হইত ভবিষ্যতে কোনও দিন যদি মুক্তি পাই, তবে নিজে মাংস খাইয়া অপরকে মাংসাহারীর দলে আনিব। কিন্তু এখন নিজে নিরামিষাশী থাকিয়া অপরকে নিরামিষাশী করার লোভই মনের ভিতর জাগিয়া উঠিল।

১৮

সভ্য বেশে

নিরামিষ-আহারের উপর আমার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। সল্টের পুস্তক আহার-সম্বন্ধে আমার জানিবার ইচ্ছা বাড়াইয়া দিল। যত পুস্তক পাইলাম তাহা ক্রয় করিয়া পড়িতে লাগিলাম। হাউয়ার্ড উইলিয়ামস্ এর 'আহার-নীতি' (The Ethics of Diet) নামক পুস্তকে বিভিন্ন যুগের জ্ঞানীগণের, অবতার ও পয়গম্বরদিগের আহার্য্য ও আহার সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্যের বর্ণনা আছে। পইথাগোরাস, যিশু প্রভৃতি যে কেবল নিরামিষ আহারই করিতেন তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ডাক্তার মিসেস্ অ্যানা কিংগস্‌ফোর্ড-এর "উত্তম আহারের রীতি" বহিখানাও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তার এলিন্‌সনের লেখাও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। ঔষধের বদলে কেবল আহার্য্যের পরিবর্ত্তন দ্বারাই তিনি আরোগ্য করার পদ্ধতি সমর্থন করিয়াছেন।

ডাক্তার এলিন্‌সন নিজে নিরামিষাহারী। তিনি রোগীদের জন্য কেবল নিরামিষ আহারের পরামর্শই দিতেন। এই সকল পুস্তক পড়ার ফল এই হইল যে, আমার জীবন খাদ্যসম্বন্ধে পরীক্ষা করার একটা বড় স্থান রূপে গড়িয়া উঠিল। এই সকল পরীক্ষা প্রথম প্রথম কেবল স্বাস্থ্যের দিক দিয়াই করিতাম। পরে ধর্ম্মের দিক দিয়াও এই সকল পরীক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

আমার সেই মিত্রটি তখনও কিন্তু আমার সম্বন্ধে চিন্তা দূর করিতে পারেন নাই। তিনি ভালবাসিতেন বলিয়াই মনে করিতেন যে, যদি আমি মাংসাহার না করি তবে রোগা হইয়া ত থাকিবই—সেই সঙ্গে সঙ্গে বোকাও বনিয়া যাইব, কেন না আমি ইংরাজ-সমাজে মিশিতে পারিব না। তিনি আমার নিরামিষাহার সম্বন্ধে পুস্তক পড়ার খবরও পাইয়াছিলেন। তিনি ধরিয়া লইলেন যে, ঐ সকল বই পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিয়া যাইবে, খাদ্যের পরীক্ষা করিয়াই জীবনকাল কাটাইয়া দিব এবং আমার কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া মাথা-পাগলা হইয়া থাকিব। সুতরাং তিনি আমার সংশোধনের একবার শেষ চেষ্টা করিলেন— আমাকে নাটক দেখিতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানে যাওয়ার পথে আমাকে লইয়া তিনি 'হবর্ণ'-ভোজনালয়ে উপস্থিত হইলেন। এই গৃহ আমার কাছে রাজ-মহল বলিয়া মনে হইল। ভিক্টোরিয়া-হোটেলে যাওয়ার পর আর এত বড় হোটেলে প্রবেশ করি নাই। ভিক্টোরিয়া-হোটেলের অভিজ্ঞতা আমার নিকট বড় সুখদায়ক ছিল না। বস্তুতঃ সেখানে থাকার সময় আমার মাথা ঘুলাইয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শত শত লোকের মধ্যে আমরা দুইজন এক টেবিলে বসিলাম। প্রথমেই সুপ ছিল—আমি বিব্রত হইয়া পড়িলাম, কারণ উহা কিসের তৈরী জানিতাম না। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। তাই আমি পরিবেশনকারীকে ডাকিলাম। বন্ধু বুঝিতে পারিলেন; রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে।"

আমি শান্ত-ভাবে সঙ্কোচের সহিত বলিলাম—"আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, ইহাতে মাংস আছে কি না?"

"এই রকম জঙ্গলী-পনা এ গৃহে চলিবে না। যদি ভদ্রভাবে ব্যবহার

না করিতে পার, তবে বরঞ্চ উঠিয়া যাও এবং অন্য কোনও হোটেলে খাইয়া আমার জন্য বাহিরে অপেক্ষা কর।"

আমি ইহাতে প্রসন্ন মনে উঠিয়া অন্য হোটেল খুঁজিতে গেলাম। পাশেই এক নিরামিষ-ভোজনালয় ছিল কিন্তু উহা তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং আমি না খাইয়াই রহিলাম। আমরা নাটক দেখিতে গেলাম। বন্ধু আর খাওয়ার বিষয় কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না। আমারই বা বলার কি ছিল ?

ইহাই আমাদের মধ্যে শেষ মিত্র-যুদ্ধ। আমাদের সম্বন্ধ নষ্ট হয় নাই, তিক্তও হয় নাই। আমি তাঁহার প্রত্যেক চেষ্টার পশ্চাতে আমার প্রতি ভালবাসা দেখিতে পাইতাম, সেই জন্য আচার ও বিচারের পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া উঠে।

মনে হইল—আমার সম্বন্ধে তাঁহার ভয় ভাঙ্গাইয়া দেওয়া দরকার। তাই আমি ঠিক করিলাম যে—আমি আর জঙ্গলী থাকিব না, সভ্যের লক্ষণ সমূহ শিখিয়া লইব এবং অন্য প্রকারে সমাজে মেশার উপযুক্ত হইয়া আমার নিরামিষাহারের সমস্ত ত্রুটি ঢাকিয়া ফেলিব। এইজন্য আমি 'ইংরাজ ভদ্রলোক' সাজার অসম্ভব চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

বোম্বাইয়ের দর্জ্জির তৈরী কাপড়-চোপড়ের কাট্-ছাট্ ভাল ইংরাজ-সমাজে শোভা পায় না, সেইজন্য 'আর্মি ও নেভী ষ্টোর' হইতে পোষাক করাইয়া লইলাম। উনিশ শিলিং মূল্যের (এই দাম তখনকার দিনে খুব বেশী বলিয়া গণ্য হইত) চিমনী টুপী মাথায় দিলাম। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বণ্ডষ্ট্রীট—যেখানে সৌখীন লোকেরাই পোষাক প্রস্তুত করায়—সেই স্থান হইতে দশ পাউণ্ড খরচ করিয়া এক সান্ধ্য-

পোষাক তৈরী করিয়া লইলাম। এইবার বাদশাহী মেজাজে আমার গরীব ভাইয়ের নিকট হইতে ঘড়ীর জন্য সোণার ডবল-চেইন চাহিয়া পাঠাইলাম, তিনিও পাঠাইয়া দিলেন। তৈরী বাঁধা-টাই ব্যবহার করা শিষ্টাচার নয় বলিয়া টাই বাঁধা শিখিলাম। দেশে কামাইবার দিনেই আরশী ব্যবহার করিতে পাইতাম—এখন বড় আরশীর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ঠিক করিয়া টাই বাঁধিতে ও চুল পাট করিয়া সিঁথি কাটিতে প্রত্যহ মিনিট-দশেক করিয়া যাইতে লাগিল। চুল মোলায়েম ছিল না। সুতরাং উহা ঠিক মত রাখার জন্য রোজ ব্রুশ লইয়া উহার সহিত যুদ্ধ চলিত। চুলের পাট নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় টুপী পরিবার ও খুলিবার সময় সিঁথি ঠিক করিবার জন্য প্রত্যেকবারই হাত মাথায় উঠিত। সভ্য-সমাজে বসিয়া হাত ঐ প্রকার অন্যান্য সভ্য ক্রিয়ায় নিযুক্ত রাখা ত চলিতই।

কিন্তু পারিপাট্যও যথেষ্ট নহে। কেবল সভ্য পোষাক হইলেই কি সভ্য হওয়া যায়? সভ্যতার আরও কতকগুলি বাহ্য চিহ্ন জানিয়া লইতে ও শিক্ষা করিতে হইবে। সভ্য-পুরুষের নাচিতে জানা চাই। তাহার ভাল ফ্রেঞ্চ বলিতে পারা চাই। ফ্রেঞ্চ ফরাসী দেশের ভাষা এবং সারা ইউরোপের রাষ্ট্র-ভাষা। আমার ইউরোপ ভ্রমণের ইচ্ছাও ছিল। আমি নাচিতে শিক্ষা করা স্থির করিলাম। এক নাচের ক্লাসে যোগ দিলাম। একবারকার কোর্স শিক্ষার ফী—তিন পাউণ্ডও দেওয়া হইল। তিন সপ্তাহে গোটা-ছয়েক পাঠ লইয়াছিলাম। তালে তালে পা পড়ে না। পিয়ানোর তাল আমি ধরিতে পারিতাম না। তাই পিয়ানোর যা বাজে—কিন্তু তাহার সঙ্গে চলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। কি করা যায়? এ যেন বাবাজীর সেই বিড়ালের কাহিনী।

ইঁদুরের জন্য বিড়াল, বিড়ালের জন্য গাই—এমনি করিয়া যেমন বাবাজীর পরিবার বাড়িয়াছিল, আমার লোভের পরিমাণও তেমনি বাড়িতে লাগিল। ধ্বনি জ্ঞান নাই, সেজন্য বেহালা শিখিয়া লইতে হইবে। ইহাতে সুর ও তাল বুঝিতে পারিব। তিন পাউণ্ড দিয়া বেহালা কিনিলাম এবং তাহা শিখিবার জন্য আরও কিছু খরচ করিলাম। বক্তৃতা করিতে শিক্ষা করার জন্য তৃতীয় এক শিক্ষকের গৃহ খুঁজিয়া লইলাম। তাঁহাকে এক গিনি দিলাম। বেলের "ষ্টাণ্ডার্ড ইলোকিউশনিষ্ট" কিনিলাম। পিটের বক্তৃতা লইয়া শিক্ষা আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এই বেল সাহেবই আমার কানে ঘণ্টা বাজাইলেন, আমি জাগিলাম।

আমাকে কি ইংলণ্ডে জন্ম কাটাইতে হইবে? আমি ভাল বক্তৃতা করিতে শিখিয়া কি করিব? নাচ নাচিলে আমি কেমন করিয়া সভ্য হইব? বেহালা ত দেশেই শেখা যায়। আমি বিদ্যার্থী। আমার যে বিদ্যাধন সঞ্চয় করা দরকার। আমাকে আমার ব্যবসার জন্য কাজে লাগিতে হয়। আমার আচারের শুদ্ধতাই আমাকে সভ্য করিবে। আর তাহা যদি না করে, তবে আমার সভ্য হওয়ার লোভই ত্যাগ করা দরকার।

এই ধরণের ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমি ভাষণ-শিক্ষককে লিখিয়া জানাইলাম যে, তাঁহার নিকট আর বক্তৃতা দেওয়া শিখিতে যাইব না। মাত্র দুই তিনটা পাঠই তাঁহার নিকট হইতে লইয়াছিলাম। নাচ-শিক্ষয়িত্রীকেও ঐ প্রকার পত্র পাঠাইলাম। বেহালা-শিক্ষয়িত্রীর নিকট বেহালা লইয়া গেলাম ও যে দামে হয় বেহালাখানা বিক্রয় করিয়া দিতে বলিলাম। তাঁহার সহিত অনেকটা মিত্রতার সম্বন্ধ হইয়াছিল,

তাঁহাকে আমার মোহের কথা শুনাইলাম। নাচ ইত্যাদি জঞ্জালের মত ত্যাগ করার সঙ্কল্প তিনিও অনুমোদন করিলেন।

সভ্য হওয়ার ঝোঁক্ আমার মাস তিনেক ছিল। পোষাকের অনুরাগ ছিল বৎসরখানেক। এখন হইতে আমি বিদ্যার্থী হইয়া গেলাম।

১৩

পরিবর্ত্তন

আমি নাচ ইত্যাদি শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলাম বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি এই সময় স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছিলাম। পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যে, ইহার মধ্যেও আমার আত্ম-পরীক্ষা চলিতেছিল, এই মোহের কালেও আমি কতক পরিমাণে সাবধান ছিলাম। আমি পাই পয়সারও হিসাব রাখিতাম। কত খরচা করিব তাহার ফর্দ্দ করিয়া রাখিতাম। প্রতি মাসে পনের পাউণ্ডের বেশী খরচ না হয় তাহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। 'বাসে' চলার খরচা, কি চিঠিপত্র লেখার খরচা সমস্তই লিখিয়া রাখিতাম এবং শয়নের পূর্ব্বে হিসাব মিলাইয়া শুইতাম। এই অভ্যাস শেষ পর্য্যন্ত বজায় আছে। আমি জানি যে, আমার জন-সেবার জীবনে আমার হাতে লাখো লাখো টাকা আসিয়া পড়িলেও তাহা যোগ্যভাবে সতর্কতার সহিত খরচ করিতে পারিয়াছি। যত আন্দোলন আমার হাত দিয়া হইয়াছে তাহাতে কখনও আমি কর্জ্জ করি নাই, বরঞ্চ দেখিয়াছি—কার্য্য-শেষে প্রত্যেকটিতে কিছু-না-কিছু জমাই আছে। প্রত্যেক যুবক নিজের খরচের টাকার হিসাব যদি যত্ন-পূর্ব্বক রাখে, তবে হিসাব রাখার নিমিত্ত আমার যেমন উপকার হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহাদেরও তেমনি উপকার হইবে।

জীবন-যাত্রার উপর আমার তীক্ষ্ণ নজর ,ছিল বলিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার খরচ কমানো দরকার। খরচ

একেবারে অর্দ্ধেক কমাইয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইল। হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখি যে, গাড়ী ভাড়ার খরচা খুব বেশী হইতেছে। পরিবারের মধ্যে থাকার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা প্রতি সপ্তাহেই দিতে হইত। পরিবারের লোকদিগকে কোনও দিন বাহিরে আহার করাইতে লইয়া যাইতে হয়, আবার কোনও দিন তাঁহারা কোথাও যাইতে যদি সঙ্গে লইয়া যান তবে তখনও গাড়ী ভাড়া দিতে হয়। স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে তাহাকে ভাড়া খরচ করিতে দিতে নাই। আবার বাহিরে খাইলেও ঘরে খাওয়ার খরচ তাহাতে কম হয় না, সেখানে (সাপ্তাহিক) টাকা যাহা দেওয়ার তাহা দিতেই হয়; সেইজন্য বাহিরে খাওয়ার খরচা বাড়্তি ভাগ লাগে। ভাবিয়া দেখিলাম—এই ব্যাপারগুলিতে খরচা কমানো যায় এবং এইরূপে লজ্জার খাতিরে যে খরচ করিতাম তাহাও বাঁচানো যায়।

এখন হইতে পরিবারের ভিতর না থাকিয়া ঘর-ভাড়া লইয়া থাকিব স্থির করিলাম। যখন যে পাড়ায় কাজ তখন সেই পাড়ায় ঘর ভাড়া লইলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা পাওয়ারও সুবিধা হইবে। ঘর এমন জায়গায় যদি লওয়া যায়, যেখান হইতে আধঘণ্টার মধ্যে কর্ম্মস্থানে যাওয়া যায় তবে আর গাড়ী-ভাড়া লাগে না। ইহার পূর্ব্বে কোথাও যাইতে হইলেই গাড়ী ভাড়া করিতাম এবং বেড়াইবার জন্য ভিন্ন সময় রাখিতে হইত। এখন কাজে যাওয়ার সময়েই বেড়ানও হয়—এই ব্যবস্থা হইল। ইহাতে প্রতিদিন আট দশ মাইল সহজেই বেড়ানো হইত। প্রধানতঃ এই এক অভ্যাসের জন্যই বিলাতে আমি অসুখে পড়ি নাই। শরীরও ঠিক ভাবে গড়িয়া

উঠিয়াছিল। পরিবারে বাস করা ছাড়িয়া দুইটা কামরা ভাড়া লইলাম। একটা শোওয়ার—একটা বসার। ইহাই দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন বলা যায়। তৃতীয় পরিবর্ত্তন ভবিষ্যতের জন্য রহিয়াছে।

এমনি করিয়া খরচ অর্দ্ধেক করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সময়? আমি জানিতাম যে, ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য বেশী পড়িতে হয় না। সেই হেতু সময়ের জন্য টানাটানি ছিল না। আমার কাঁচা ইংরাজী জ্ঞানের জন্য আমার ক্ষোভ হইত। লেলী সাহেবের কথা—"তুমি আগে বি, এ, হও পরে আসিও"—আমাকে বিঁধিত। ব্যারিষ্টারী ছাড়া আরও কিছু পড়া আবশ্যক। অক্‌সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজের খবর লইলাম। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গেও দেখা করিলাম। দেখিলাম—সেখানে পড়িতে গেলে খরচ অনেক এবং অনেক দিন থাকিতে হয়। তিন বৎসরের বেশী থাকা হইবে না। একজন বন্ধু বলিলেন যে—যদি সত্য সত্যই কোনও কঠিন পরীক্ষায় পাশ করিতে চাও তবে লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ কর। তাহাতে খুব খাটিতে হইবে ও সাধারণ জ্ঞান বাড়িবে। খরচা ত নাই বলিলেই হয়। কথাটা আমার কাছে ভাল লাগিল। পরীক্ষার বিষয় দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ল্যাটিন ও আর একটা ভাষা অবশ্য শিখিতে হইবে। ল্যাটিন কেমন করিয়া শিখিব? বন্ধু বলিলেন—"উকীলের ল্যাটিন শেখা খুব আবশ্যক। ল্যাটিন জানিলে আইনের পুস্তক পড়িয়া সহজে বুঝা যায়। রোমান ল-এর পরীক্ষায় এক প্রশ্ন-পত্র কেবল ল্যাটিন ভাষাতেই থাকে। ল্যাটিন জানিলে ইংরাজী ভাষার উপরেও দখল বাড়ে।" এই সমস্ত যুক্তির প্রভাব আমার উপর বেশ কাজ করিল। মুস্কিল হোক্ আর যাহাই হোক্, ল্যাটিন শিখিবই। ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষাও আরম্ভ করিয়াছিলাম, উহাও সম্পূর্ণ করিব। সেইজন্য

ছুই ভাষার মধ্যে দ্বিতীয়টা ফ্রেঞ্চ লইব বলিয়া স্থির করিলাম। প্রতি ছয় মাসে পরীক্ষা হয়। সাম্নে প্রায় পাঁচ মাস সময় ছিল। এই সময়ের ভিতর তৈরী হওয়া আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফলে এই হইল যে, আমি সভ্য হওয়ার প্রযত্ন ত্যাগ করিয়া কঠোর পরিশ্রমী ছাত্র হইয়া পড়িলাম। কার্য্য-ক্রম স্থির করিয়া দিন-চর্য্যার মিনিট পর্য্যন্ত বাঁধিয়া লইলাম। কিন্তু যথাশক্তি চেষ্টা করিলেও আমার বুদ্ধি-শক্তি এমন ছিল না যে, অন্য বিষয় গুলির সহিত ল্যাটিন ও ফ্রেঞ্চ এই অল্প সময়ের ভিতর শিখিয়া লইতে পারি। পরীক্ষা দিলাম। ল্যাটিনে ফেল করিলাম। দুঃখিত হইলাম, কিন্তু নিরাশ হইলাম না। ল্যাটিন পড়িয়া রস পাইতে লাগিলাম। ফ্রেঞ্চ ভালই হইতেছিল। বিজ্ঞানে অন্য নূতন বিষয় লইব স্থির করিলাম। আমি এখন দেখিতেছি—রসায়ন শাস্ত্রে খুব রস পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রয়োগ করার ব্যবস্থার অভাবে আমার উহা ভাল লাগিত না। দেশে কলেজে এ বিষয় শিখিতেই হইত, সেইজন্য লণ্ডন-ম্যাট্রিকের প্রথম বারের পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্র লইয়াছিলাম। এই বার বিষয় লইলাম আলো ও উত্তাপ (লাইট্ ও হিট্)। উহা লোকে সহজ বলিত, আমারও সহজ লাগিল।

পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়ার সাথে সাথেই জীবন-যাত্রা সাদাসিধা করিতে চেষ্টা করিলাম। আমি দেখিলাম—আমাদের পরিবার যেমন গরীব, আমার চালচলন তাহার উপযুক্ত নয়। ভাইয়ের আর্থিক অসচ্ছলতা ও তাঁহার উদারতা আমাকে ব্যথিত করিল। যে সব ছেলেরা মাসে আট পাউণ্ড হইতে পনের পাউণ্ড ব্যয় করিত তাহাদের বেশীর ভাগই শিক্ষাবৃত্তি (স্কলারশিপ) পাইত। আমার অপেক্ষা

অনেক বেশী সাদাসিধা ভাবে থাকে—এমন ছাত্রও দেখিতে পাইলাম। আমি অনেক দরিদ্র ছাত্রের সংস্পর্শে আসিলাম যাহারা নিজের অবস্থানুযায়ী থাকে। একজন, লণ্ডনের দরিদ্র-পল্লীতে সপ্তাহে দুই শিলিং ভাড়া দিয়া থাকে ও লোকার্টের সস্তা কোকোর দোকানে দুই পেনী দিয়া কোকো ও রুটি খাইয়া দিন কাটায়। তাহার সহিত প্রতিযোগীতা করার শক্তি আমার ছিল না। তাহা হইলেও আমি দুই কামরা না লইয়া একটা কামরাতেই চালাইতে পারি, অর্দ্ধেক রান্না নিজেই করিয়া লইতে পারি বলিয়া মনে হইল। এই ব্যবস্থায়, আমি প্রতিমাসে চার কি পাঁচ পাউণ্ডে চালাইতে লাগিলাম। সরল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পুস্তকও পড়িতাম। দুই কামরা ত্যাগ করিয়া সপ্তাহে আট শিলিং ভাড়ায় একটা কামরা ভাড়া লইলাম। একটা ষ্টোভ কিনিয়া সকালে নিজেই রান্না করিতে আরম্ভ করিলাম। রান্না করিতে বিশ মিনিটও লাগিত না। ওট্-মিলের জাউ (Porridge) তৈরী করিতে ও কোকোতে গরম জল দিতে আর কত সময় লাগে? দুপুরে বাহিরে খাওয়া আর সন্ধ্যায় কোকোর সহিত রুটি। এমনি করিয়া আমি রোজ এক হইতে সওয়া শিলিংএ খাওয়া শেষ করিতে শিখিলাম। এখন আমার সময়ের বেশীর ভাগ পড়াশুনাতেই কাটিয়া যাইত। জীবনযাত্রা সরল হওয়ায় সময় খুব পাওয়া যাইতে লাগিল। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়া পাস হইলাম।

পাঠকেরা মনে করিবেন না যে, এই সরল জীবন রস-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের জন্য আমার আন্তরিক ও বাহ্যিক স্থিতির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইল। জীবনের মূল্য অনেক বাড়িয়া গেল। আমি অপার আত্মানন্দ ভোগ করিতে লাগিলাম।

১৭

আহার্য্য পরীক্ষা

যেমন আমি অন্তরের ভিতরে গভীর ভাবে ডুবিতে লাগিলাম, তেমনি বাহিরের ও অন্তরের আচারের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া পড়িতে লাগিল। যে গতিতে জীবন-যাত্রার ও খরচার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে তেমনি অথবা দ্রুততর গতিতে আহার্য্যেরও পরিবর্ত্তন হইতেছিল। নিরামিষ আহার সম্বন্ধে ইংরাজী পুস্তকে আমি দেখিলাম যে, লেখকেরা খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছেন। নিরামিষাহারের সম্বন্ধে তাঁহারা ধার্ম্মিক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারিক ও বৈদ্যক দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিয়াছেন। নৈতিক দৃষ্টি হইতে তাঁহারা বিচার করিয়াছেন—মানুষ পশু-পক্ষীর উপর যে সাম্রাজ্য পাইয়াছে, উহা তাহাদিগকে মারিয়া খাওয়ার জন্য নয়, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য। মানুষ যেমন একে অন্যের সহিত ব্যবহার করে, পশু-পক্ষীর সহিতও তাহাকে সেই ব্যবহারই করিতে হইবে, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ খাওয়ার সম্বন্ধ নহে। তাঁহারা ইহাও দেখিয়াছেন যে, মানুষের আহার করাটা কেবল জীবিত থাকার জন্যই আবশ্যক, ভোগের জন্য নহে। এই দৃষ্টি হইতে কেহ কেহ খাদ্যের মধ্য হইতে কেবল মাংসই নয়, ডিম ও দুধও বাদ দিতে বলেন। বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিতে মানুষের শরীরের গঠন দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মানুষের রান্না করারই আবশ্যকতা নাই। বনের পাকা ফলই তাহার স্বাভাবিক খাদ্য। দুধ কেবল মায়ের স্তন হইতে খাওয়া চলে—দাঁত উঠিলে চিবাইয়া খাওয়ার মত খোরাক লইতে হয়।

বৈদ্যের দৃষ্টিতে তাঁহারা মস্‌লা ত্যাগ করিতে বলেন। আবার ব্যবহারিক বা আর্থিক দৃষ্টিতে দেখিলে, তাঁহারা বলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচায় নিরামিষ আহারই হইতে পারে। এই চার রকম দিক হইতে খাদ্যকে বিচার করিয়া দেখার ফলও ফলিল। এই চার দৃষ্টি হইতে যাঁহারা খাদ্যকে দেখেন, নিরামিষ-ভোজনালয়ে এমন লোকের সঙ্গেও আমি মিশিয়াছিলাম। লণ্ডনে তাঁহাদের মণ্ডল ছিল এবং সাপ্তাহিক পত্রও ছিল। আমি সপ্তাহিক-পত্রের গ্রাহক হইলাম এবং মণ্ডলের সভ্য হইলাম। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের কমিটিতে লইলেন। এই স্থানে যাঁহারা নিরামিষ-আহার সমর্থনের স্তম্ভের মত ছিলেন তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইল। আমি খাদ্য পরীক্ষায় রত হইলাম।

দেশ হইতে যে মিঠাই ও মস্‌লা আনাইতাম তাহা খাওয়া বন্ধ করিলাম। আমার মন অন্যদিকে ফিরিল, মস্‌লার আস্বাদের ইচ্ছা কমিয়া গেল। যে ভাজি 'রিচ্‌মণ্ড' মস্‌লা ব্যতীত বিস্বাদ লাগিত এখন তাহা সুস্বাদু বলিয়া মনে হইল। এই প্রকার অনেক অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে, স্বাদের সত্য স্থান জিভ্‌ নহে বরঞ্চ মন।

খরচার দিকে দৃষ্টি ত আমার ছিলই। তখনকার দিনে একদল লোকের মত ছিল যে, চা ও কফি অহিতকারী এবং কোকো ভাল। কেবল যে শরীর-রক্ষার্থ ই খাওয়া অবশ্যক সে সম্বন্ধে আমার আর সংশয় ছিল না। সুতরাং যে দ্রব্য শরীর রক্ষার জন্য দরকার তাহাই খাওয়া উচিত বলিয়া চা ও কফি ত্যাগ করিয়া কোকো খাইতে লাগিলাম।

হোটেলে দুইটি বিভাগ ছিল। একটিতে 'আবশ্যক মত যাহা খুসী চাহিয়া খাইয়া প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য দিতে হয়। ইহাতে এক

শিলিং হইতে দুই শিলিং খরচা হয়। ইহাতে অবস্থাপন্ন লোকেরা আসেন। আর দ্বিতীয় বিভাগে ছয় পেনীতে তিন রকমের খাদ্য ও এক টুক্‌রা রুটি পাওয়া যায়। যখন খরচায় খুব কড়াকড়ি করিতেছিলাম, তখন ছয় পেনীর বিভাগেই খাইতাম।

উপরের পরীক্ষার সঙ্গে ছোট ছোট পরীক্ষাও অনেক রকমের চলিয়াছিল। কখনো ষ্টার্চ-যুক্ত খাদ্য ত্যাগ করিতাম, কখনো বা কেবল মাত্র রুটি ও ফল খাইতাম, আবার কখনো বা পণীর, দুধ ও ডিম লইতাম।

এই শেষোক্ত পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ-যোগ্য। উহা পনের দিনও চালানো যায় নাই। ষ্টার্চ ছাড়া খাদ্যের সমর্থন যাঁহারা করিতেন তাঁহারা ডিমের খুব স্তুতি করিতেন এবং ডিম যে মাংস নয় ইহা প্রমাণ করিতেন। উহা খাইলে কোনও জীবিত প্রাণীকে দুঃখ দেওয়া হয় না—এই যুক্তিতে ভুলিয়া প্রথম প্রথম প্রতিজ্ঞা সত্বেও আমি ডিম খাইতাম। কিন্তু আমার এই মোহ অতি অল্প সময়ের জন্যই ছিল। প্রতিজ্ঞার নূতন অর্থ করার অধিকার আমার ছিল না। প্রতিজ্ঞা যিনি দিয়াছেন তাঁহার কাছে উহার অর্থ যাহা ছিল, আমাকে তাহাই ত পালন করিতে হইবে। মাংস না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা যখন মা করাইয়াছিলেন তখন ডিমের কথা মায়ের খেয়াল ছিল না—একথা আমি জানিতাম। সেইজন্য আমার নিকট প্রতিজ্ঞার সত্য স্বরূপ স্পষ্ট হইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ডিম খাওয়াও ছাড়িয়া দিলাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই পরীক্ষাটাও ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু এই রহস্য সূক্ষ্ম ও প্রণিধান করার যোগ্য। মাংসের তিন রকম ব্যাখ্যার কথা বিলাতে পড়িয়াছি। প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে মাংস বলিতে পশু-পক্ষীর মাংসই বুঝাইত। নিরামিষাশীদের মধ্যে এই ব্যাখ্যা যাঁহারা

গ্রহণ করিতেন তাঁহারা মাংস ত্যাগ করিতেন কিন্তু মাছ খাইতেন, ডিমের ত কথাই নাই। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সাধারণ লোক যাহাকে জীব বলে তাহারই মাংসকে মাংস বলি গণ্য করা হয়। ইহাতে মাছ ত্যাজ্য কিন্তু ডিম গ্রহণীয়। তৃতীয় ব্যাখ্যায় সাধারণতঃ যাহা জীব বলিয়া গণ্য হয় তাহা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সমস্ত বস্তুই মাংস। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ডিম ও দুধও পরিত্যাজ্য। ইহার মধ্যে যদি প্রথম ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে মাছও খাওয়া যায়। কিন্তু আমি একথা বুঝিয়াছিলাম যে, আমার কাছে মায়ের দেওয়া ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য। সুতরাং তাঁহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা পালন করিতে হইলে ডিমও ত্যাগ করিতে হইবে। সেই জন্য ডিম ত্যাগ করিলাম। ইহাতে যথেষ্ট অসুবিধা হইল। কেননা সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, নিরামিষ আহারের হোটেলে ডিম দিয়া অনেক জিনিষ তৈরী হয়। কোন্ জিনিষটা কিসের তৈরী তাহা জানিবার জন্য পরিবেশনকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইত। কারণ অনেক পুডিং ও কেকে ডিম থাকিত। কিন্তু ইহাতে আর একদিক দিয়া একটা ঝঞ্ঝাট হইতেও রক্ষা পাইলাম। অতঃপর আমাকে অল্প সংখ্যক খুব সাদাসিধা খাদ্যই খাইতে হইত। যাহা খাইতে ভাল লাগে এমন অনেক জিনিষ ত্যাগ করিতে হইল সত্য এবং সেজন্য কিছু ক্ষতিও হইল সন্দেহ নাই। কিন্তু এ আঘাত ক্ষণিকের জন্য মাত্র। প্রতিজ্ঞা-পালনের স্বচ্ছ সূক্ষ্ম ও স্থায়ী স্বাদ আমার কাছে সেই ক্ষণিক স্বাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় লাগিল।

কিন্তু আরও কঠিনতর পরীক্ষা ভবিষ্যতের গর্ভে জমা ছিল। তবে তাহা অন্য ব্রতের জন্য। যাহাকে রাম রাখে তাহাকে কে মারে?

এই অধ্যায় শেষ করার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞার অর্থ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমার প্রতিজ্ঞা মায়ের নিকট স্বীকার করা একটা কড়ার। দুনিয়ার অনেক ঝগড়া কেবল কড়ারের অনর্থ হইতেই উৎপন্ন হয়। যতই স্পষ্ট ভাষায় কড়ার লেখা হোক্ না কেন, অর্থশাস্ত্রী তাহার অর্থ বদলাইতে পারেন। ইহাতে সভ্যাসভ্যের ভেদ নাই। স্বার্থ সকলকে অন্ধের মত করিয়া ফেলে। রাজা হইতে দীন-দরিদ্র পর্য্যন্ত অঙ্গীকারের অর্থ নিজের মনোমত করিয়া দুনিয়াকে, নিজেকে ও ঈশ্বরকে প্রতারিত করে। যে শব্দ অথবা বাক্য নিজের অনুকূলে আসে মানুষ সেই অর্থই পক্ষপাত-বশতঃ গ্রহণ করে, ইহাকে ন্যায়শাস্ত্রে দ্বি-অর্থযুক্ত মধ্যম পদ বলে। এ সম্বন্ধে শুদ্ধ-রীতি হইতেছে—যে প্রতিজ্ঞা করায় সে যে অর্থে করাইয়াছে তাহাই সত্য বলিয়া গণ্য করা এবং যাহা আমাদের মনোমত নহে তাহাই মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে না করা। ইহা ভিন্ন আর একটা পথ আছে। তাহা এই—যেখানে দুই রকম অর্থ করা যায় সেখানে দুর্ব্বল পক্ষ যাহা বলে তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া। এই দুই শুদ্ধ-রীতি বা স্বর্ণ-মার্গ ত্যাগ করার জন্যই বেশীর ভাগ ঝগড়া হয় এবং অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এই অন্যায়ের মূলে আছে অসত্য। যাহাকে সত্যের পথেই চলিতে হইবে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে উক্ত সুবর্ণ-পথ বা এই দুই শুদ্ধ-রীতি। তাহাকে শাস্ত্র খুঁজিতে হয় না। 'মাংস'—বলিতে মা যাহা বুঝিয়াছিলেন এবং তখন আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই আমার কাছে সত্য। আমার পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতা হইতে, অথবা আমার পাণ্ডিত্যের অভিমানে যে অর্থ বুঝিয়াছি—প্রতিজ্ঞার সে অর্থ সত্য নহে।

এ পর্য্যন্ত আমার খাদ্য সম্বন্ধীয় পরীক্ষা আর্থিক ও স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতেই করিয়াছি। ইহার ধর্ম্মের দিকটা বিলাতে আমার নিকট ধরা পড়ে

নাই। ধর্ম্মের দিক্ দিয়া আমার কঠিন পরীক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকাতে হইয়াছে, সে কথা পরে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু এ সকলেরই বীজ যে ইংলণ্ডেই রোপিত হইয়াছিল তাহা বলা যায়।

যখন কেহ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে তখন সেই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাহার উত্তেজনা, যে সেই ধর্ম্মেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশী হয়। নিরামিষাহার বিলাতে তখন নূতন ধর্ম্ম, এবং আমার পক্ষেও উহা নূতন ধর্ম্ম বলা যায়। কেননা যখন বিলাতে গিয়াছি তাহার পূর্ব্ব হইতে বুদ্ধিতে আমি মাংসাহারেরই পক্ষপাতী ছিলাম। বিলাতে গিয়াই আমি নিরামিষাহারের নীতি জ্ঞান-পূর্ব্বক গ্রহণ করি। সুতরাং নিরামিষাহার তখন আমার পক্ষে নূতন ধর্ম্মে প্রবেশ করার মতই ছিল। নূতন ধর্ম্মের প্রাথমিক উত্তাপও আমার ভিতরে দেখা দিল। যে পাড়ায় আমি থাকিতাম সেই পাড়ায় নিরামিষাহারীদের একটা মণ্ডলী (ক্লাব) স্থাপন করা ঠিক করিলাম। এই স্থান বেজ্‌ওয়াটারে ছিল। সেই পাড়াতেই সার এডুইন আরনল্ড বাস করিতেন। তাঁহাকে সহকারী-সভাপতি হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করায় তিনি স্বীকার করিলেন। ডাক্তার ওল্ডফীল্ড সভাপতি হইলেন। আমি সেক্রেটারী হইলাম। দিনকতক এই সংস্থা চলিয়াছিল। তার পরেই ভাঙ্গিয়া যায়। আমার প্রথা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে ঐ পাড়া আমি ত্যাগ করিলাম। কিন্তু এই ছোট ও অল্পকাল-স্থায়ী সংস্থার ভিতর দিয়া সংস্থা-রচনা ও পরিচালনারও কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম।

১৮

লাজুক স্বভাব—আমার ঢাল

নিরামিষাহারী-সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহ-সমিতিতে প্রবেশ লাভ করিলাম এবং তাহার প্রত্যেক সভাতে উপস্থিতও থাকিতাম, কিন্তু কোন কথা বলিতে জিভ্ সরিত না। আমাকে ডাঃ ওল্ডফিল্ড বলিলেন—"তুমি আমার সঙ্গে ত বেশ কথা বল, কিন্তু সমিতির বৈঠকে কখনও মুখ খোল না কেন? তুমি অলসের হদ্দ।" তিনি আমাকে পুং-মক্ষিকার উপমা দিয়া কৌতুক করিলেন। মধু-মক্ষিকা সর্ব্বদাই কাজ করে, কিন্তু পুং-মক্ষিকা খাওয়া দাওয়া করিয়া আরামে বসিয়া থাকে, কোনও কাজ করে না। সমিতিতে অন্য সকলে নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, আমি মূকের মত বসিয়া থাকি—এ কেমন? আমার কথা বলিতে যে ইচ্ছা হইত না তাহা নয়,—কিন্তু কি বলিব? সকল সভ্যই আমার অপেক্ষা বেশী জানেন। তাহা ছাড়া যদি কখনও বলার ইচ্ছা হইত ও বলার সাহসও সংগ্রহ করিতাম, প্রায়ই দেখিতাম ততক্ষণ অন্য বিষয়ে আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে।

এই রকম অনেক দিন চলিল। ইতিমধ্যে একটা গুরুতর বিষয় সমিতিতে উপস্থিত হইল। উহাতে যোগ না দেওয়া অন্যায় বলিয়া মনে হইল এবং নিঃশব্দে কেবল ভোট দেওয়াটাও কাপুরুষতা বলিয়া বোধ হইল। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন মিঃ হিল্‌স্—"টেম্‌স্ আয়রণ ওয়ার্কসে"র সত্ত্বাধিকারী। তিনি পবিত্রতা-বাদী ছিলেন। তাঁহার টাকাতেই সমিতি চলিত—একথা বলা যায়। সমিতির অনেকেই

তাঁহার আশ্রিত ছিল। এই সমিতিতে ডাঃ এলিন্সন্‌ও ছিলেন। এই সময়ে কৃত্রিম উপায়ে সন্তানের জন্ম বন্ধ করার আন্দোলন চলিতেছিল। ডাক্তার এলিন্সন ঐ উপায় ব্যবহারের সমর্থক ছিলেন এবং মজুরদের মধ্যে উহার পদ্ধতি প্রচারও করিতেন। কিন্তু মিঃ হিল্‌সের মত ছিল—এই উপায় অবলম্বন করায় নীতির সর্ব্বনাশ হয়। তিনি মনে করিতেন—নিরামিষাহারী-সমিতির কাজ কেবল আহারের সংস্কার করাই নহে, উহা নীতি-বর্দ্ধক সমিতিও বটে। সুতরাং মিঃ হিল্‌সের মতানুসারে ডাঃ এলিন্সনের মত সমাজের পক্ষে অহিতকর এবং তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তির স্থানও এই সমিতির মধ্যে থাকিতে পারে না। সেইজন্য ডাঃ এলিন্সন্‌কে সমিতি হইতে বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন আসিয়াছিল। এই আলোচনায় আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। ডাক্তার এলিন্সনের কৃত্রিম উপায় ব্যবহারের সিদ্ধান্ত আমার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইত। তাঁহার বিপক্ষে মিঃ হিল্‌সের দাঁড়ানো আমি শুদ্ধ নীতি-সম্মত বলিয়া গণ্য করিতাম। তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও খুব বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার উদারতায় আমি মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু একজন নিরামিষাহার-সংসৃষ্ট মণ্ডলের সভ্যকে, শুদ্ধ নীতির নিয়ম অস্বীকার করেন বলিয়া অশ্রদ্ধাবশতঃ মণ্ডল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া আমার নিকট অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হইল। মিঃ এলিন্সনের স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ সম্পর্কিত বিচার তাঁহার ব্যক্তিগত। মণ্ডলের সহিত সে সিদ্ধান্তের কোনও সম্পর্ক নাই। মণ্ডলের উদ্দেশ্য নিরামিষাহার প্রচার করা, অন্য নীতির প্রচার করা নয়। সেই জন্য অন্য নীতির অনাদর যিনি করেন তাঁহারও মণ্ডলে স্থান হইতে পারে—ইহাই ছিল আমার বিশ্বাস। সমিতিতে আরও সভ্য ছিলেন যাঁহারা এই প্রকার মত পোষণ করিতেন। কিন্তু আমার মনে হইল—

এ সম্বন্ধে আমার মত আমার নিজেরই ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। কি করিয়া এই মত প্রকাশ করা যায় তাহাই এক মহা প্রশ্ন হইয়া পড়িল। দাঁড়াইয়া বলার অতখানি সাহস আমার ছিল না। সেই জন্য আমার মন্তব্য সভাপতির নিকট পাঠনো স্থির করিলাম। মন্তব্য লিখিয়াও লইয়া গেলাম। আমার স্মরণ আছে যে, এই লেখাটা পড়ার মত সাহসও আমার হয় নাই। সভাপতি অপর সভ্যকে দিয়া উহা পড়াইয়াছিলেন। ডাঃ এলিন্সনের পক্ষই হারিয়া গেল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমার জীবনের এই অধ্যায়ের এই প্রথম যুদ্ধে আমি হারারই পক্ষ লইয়াছিলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সত্য ছিল, তাই মনে সম্পূর্ণ সন্তোষও ছিল। আমার আজ অল্প অল্প স্মরণ হয় যে, কতকটা এই ধরণের কারণেই আমি সমিতির সভ্যপদে ইস্তাফা দিয়াছিলাম।

যতদিন বিলাতে ছিলাম এই লাজুক ভাব আমি দূর করিতে পারি নাই। যেখানে পাঁচ সাত জন মানুষ একত্র হইয়াছে সেইখানেই আমি মুক হইয়া গিয়াছি।

একবার ভেণ্টনরে যাই। সঙ্গে মজুমদারও ছিলেন। সেখানে এক নিরামিষাশী পরিবারে আমরা উঠিয়াছিলাম। "এথিক্স অফ্ ডায়েটের" (খাদ্য সম্বন্ধীয় নীতি) লেখক মিঃ হাউয়ার্ড এই বন্দরে ছিলেন। আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। এই স্থানের জন-সাধারণকে নিরামিষ আহারে উৎসাহিত করিবার জন্য এক সভা আহুত হইল। সভায় আমরা দু'জনও বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হইলাম এবং নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণও করিলাম। লিখিত ভাষণ পড়ায় কোনো বাধা নাই, একথা আমি জানিয়া লইয়াছিলাম। নিজের বিচার সমূহ দৃঢ়ভাবে অথচ সংক্ষেপে প্রকাশ করার জন্য

অনেকে লিখিয়া পাঠ করেন—আমি দেখিয়াছি। আমি আমার ভাষণ লিখিলাম, কিন্তু পড়ার সাহস হইল না। পড়িতে উঠিয়াও আমি পড়িতে পারিলাম না। চোখে দেখি না, হাত-পা কাঁপে। লেখা ফুলস্কেপের এক পৃষ্ঠার বেশী ছিল না। মজুমদার তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। মজুমদারের ভাষণ সুন্দর হইয়াছিল। শ্রোতারা হাততালি দিয়া তাঁহার বক্তৃতায় সন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল। আমি লজ্জিত হইলাম। বলার শক্তি নাই বলিয়া খুব দুঃখও হইল।

বিলাতে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করার শেষ চেষ্টা করি আমার বিলাত ত্যাগ করার সময়। বিলাত ত্যাগ করার পূর্বে হবর্ণ ভোজন-গৃহে নিরামিষাশী বন্ধুদিগকে আমি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। ভাবিলাম —নিরামিষ-ভোজন-গৃহে ত নিরামিষাহার করানো যায়ই, কিন্তু আমিষ-ভোজন-গৃহে নিরামিষাহারের ব্যবস্থা করিলে কিরূপ হয়। এই রকম ভাবিয়া এই গৃহের ব্যবস্থাপকের সহিত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া সেইস্থানে খাওয়ানো স্থির করিলাম। এই নূতন পরীক্ষা নিরামিষাহারীদেরও ভাল লাগিল। কিন্তু বেকুব বনিতে হইল আমাকেই। খাওয়ার নিমন্ত্রণ স্ফূর্তির নিমিত্তই করা হয়। কিন্তু পশ্চিম দেশ উহাকেও এক কলাতে পরিণত করিয়াছে। ভোজের সময় বিশেষ গীতবাদ্য হয়, বিশেষ আড়ম্বর হয়, ও বক্তৃতা হয়। আমি যে ছোট খাট ভোজ দিয়াছিলাম তাহাতেও খুব আড়ম্বর হইয়াছিল। আমার বক্তৃতা দেওয়ার সময় আসিল। আমি দাঁড়াইলাম। খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া বলার জন্য তৈরী হইয়া গিয়াছিলাম। খুব অল্প বাক্যই রচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথম বাক্যের অধিক আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এডিসনের সম্বন্ধে তাঁহার লাজুক স্বভাবের

কথা পড়িয়াছিলাম। এক সভায় তিনি প্রথমে বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি ধারণা করি, আমি ধারণা করি, আমি ধারণা করি।" তিন বার এই কথা কয়টি উচ্চারণ করা ছাড়া তিনি আর কিছুই বলিতে পারেন নাই। ইংরাজীতে এই ধারণা (Conceive) করার অর্থ 'গর্ভধারণ' করাও হয়। যখন এডিসন আর কিছু বলিতে পারিলেন না তখন, সেই সভাতে এক রসিক সভ্য বলিয়া উঠিলেন—"ভদ্রলোকটি তিনবার গর্ভধারণ করিলেন, কিন্তু কিছুই প্রসব করিতে পারিলেন না!" গল্পটাকে আমি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম এবং উহাকেই অবলম্বন করিয়া ছোট কৌতুক-প্রদ কিছু বলিব বলিয়াও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার ভাষণের আরম্ভও এই এডিসন-কাহিনী দিয়া করিয়াছিলাম, কিন্তু সেইখানেই আটকাইয়া গেলাম। যাহা বলিব ভাবিয়াছিলাম সমস্তই ভুলিয়া গেলাম এবং কৌতুক ও রহস্য-পূর্ণ বাক্য বলার পরিবর্ত্তে আমিই কৌতুকের পাত্র হইয়া গেলাম। "মহোদয়গণ, আপনারা আমার আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"—এই বলিয়া আমাকে বসিয়া পড়িতে হইল।

আমার এই লাজুক ভাব দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু একেবারে চলিয়া গিয়াছে একথা এখনো বলা যায় না। তখনকার-তখন বলিতে পারার শক্তি দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ছিল না। নূতন লোকের মধ্যে বলিতে সঙ্কোচ বোধ হইত। বলিতে বলিতে যদি আটকাইত তবে আর বলিতে পারিতাম না। কোনও গল্পের আসরে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে পারি, অথবা বলার ইচ্ছা হয়—একথা এখনো বলিতে পারি না।

লাজুক স্বভাব—আমার ঢাল

কিন্তু তখনকার লাজুক স্বভাবের জন্য আমি নিজেই সময় সময় হাস্যাস্পদ হইয়াছি, তাহা ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হয় নাই—বরঞ্চ আজ দেখিতেছি লাভই হইয়াছে। কথা বলিতে আমার যে সঙ্কোচ পূর্ব্বে দুঃখদায়ক হইত, এখন তাহাই সুখদায়ক হইয়াছে। একটা বড় লাভ এই হইয়াছে যে, আমি শব্দ-প্রয়োগ সংক্ষেপে করিতে শিখিয়াছি। আমার চিন্তার ধারাও সংযত করার অভ্যাস সহজ হইয়াছে। আমি এখন নিজেকে এ সার্টিফিকেট সহজেই দিতে পারি যে, আমার জিহ্বাগ্র হইতে বা কলমের মুখ হইতে একটা শব্দও বিনা বিচারে, ওজন না করিয়া আমি বাহির করি না। আমার কোনও কথা বা কোনও লেখার কোনও অংশের জন্য আমাকে লজ্জা অথবা অনুতাপ ভোগ করিতে হইয়াছে—এ প্রকারও আমার স্মরণ হয় না। আমি অনেক ভয় হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি। আমার অনেক সময়ও বাঁচিয়া গিয়াছে—ইহাও অধিকন্তু লাভ।

অভিজ্ঞতা আমাকে ইহাও দেখাইয়া দিতেছে যে, সত্যের পূজারীকে মৌনের সেবা করিতে হয়। মানুষ জানিয়াই হোক্ আর না জানিয়াই হোক্, অতিশয়োক্তি করিয়া থাকে, অথবা যাহা .বলার যোগ্য তাহা ছাপাইয়া যায় অথবা ঘুরাইয়া বলে। এই সঙ্কট হইতে বাঁচার জন্য অল্প-ভাষী হওয়া আবশ্যক। যে অল্প কথা বলিয়া থাকে সে বিনা বিচারে কথা বলে না, নিজের প্রত্যেক শব্দ ওজন করে। অনেক সময় লোক কথা বলার জন্য অধীর হয়। "আমার বলার আছে"—এমন চিঠি কোন্ সভার সভাপতি না পাইয়া থাকেন? তারপর যখন তাহাকে বলার সময় দেওয়া হয়, তখন তাহার কথা শেষ হয় না, আরো বলিতে দেওয়ার প্রার্থনা

করে এবং শেষ-পর্য্যন্ত বিনা আদেশেই বলে। এই সকল বাক্য হইতে জগতের লাভ কদাচিৎ হয়। ততটা সময় যে নষ্ট হইল ইহাই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রারম্ভে যে লাজুকতা আমাকে দুঃখ দিত আজ তাহার স্মরণে আমার আনন্দ হয়। উহা হইতে আমি পরিপক্ক হওয়ার সৌভাগ্য পাইয়াছি। আমার সত্যের পূজায় আমি উহা হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

১৯

অসত্য-রূপী গরল

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে বিলাতে অপেক্ষাকৃত কম যাইত। তাহাদের মধ্যে এই প্রথা দাঁড়াইয়াছিল যে, বিবাহিত হইয়াও তাহারা কুমার বলিয়া পরিচয় দিত। সে দেশে স্কুল-কলেজের ছাত্র কেহ বিবাহিত নয়। বিবাহিত ব্যক্তি বিদ্যার্থী-জীবন যাপন করে না। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ত বিদ্যার্থী—ব্রহ্মচারী নামেই পরিচিত হইত। এখনকার দিনেই বাল্য-বিবাহের চলন হইয়াছে। বিলাতে বাল্য-বিবাহ বলিয়া কোন বস্তু নাই। সেই জন্য সেখানে ভারতীয় যুবকেরা নিজেরা বিবাহিত—একথা স্বীকার করিতে লজ্জা পায়। বিবাহ চাপাইবার আর একটা কারণ এই যে, সেকথা প্রকাশ হইলে যে পরিবারে থাকিতে পারা যায় সে পরিবারের যুবতী কুমারীদের সহিত মেলামেশা ও আদর-আপ্যায়ন করা চলে না। এই আদর-আপ্যায়ন বেশীর ভাগই নির্দ্দোষ। পিতা-মাতাও ঐ প্রকার মিত্রাচার পছন্দ করেন। যুবক ও যুবতীর মধ্যে এইরকম একত্র বাস সেখানে আবশ্যক বলিয়া গণ্য, কেননা সেখানে প্রত্যেক যুবককে নিজের সহ-ধর্ম্মিনী খুঁজিয়া লইতে হয়। সেই হেতু যে সম্বন্ধ বিলাতে স্বাভাবিক, ভারতীয় যুবক বিলাতে গিয়া যদি সেই সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা পরে তবে পরিণাম ভয়ঙ্কর হয়। এইরূপ পরিণাম কতবার হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহা হইলেও এই মোহিনী মায়ার ফাঁদে আমাদের যুবকেরা পড়ে। বিলাতের যুবকদের পক্ষে নির্দ্দোষ হইলেও, আমাদের পক্ষে ত্যাজ্য ঐ সখ্যের খাতিরে

তাহারা অসত্যাচরণ করিতেও দ্বিধা করে না। এই জালে আমিও জড়াইয়াছিলাম। আমি পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে পরিণীত হইলেও, এক পুত্রের পিতা হইলেও, কুমার বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে দ্বিধা করি নাই। কিন্তু এই মিথ্যাচারের জন্য আমার সুখ কিছুমাত্র বাড়ে নাই। আমার লাজুক স্বভাব—আমার মৌনভাবই আমাকে বাঁচাইয়াছিল। আমি কথা বলিতাম না সুতরাং আমার সহিত কোন যুবতীও কথা বলিতে আসিত না। আমার সহিত বেড়াইতেও কোনো যুবতী কদাচিৎ আসিত।

আমি যেমন লাজুক তেমনি ভীরু ছিলাম। ভেণ্টনরে যে পরিবারে আমি থাকিতাম, সেই রকম বাড়ীতে যদি কন্যা থাকে, তবে প্রথার খাতিরে, নবাগতদিগকে তাহাদের বেড়াইতে লইয়া যাইতে হয়। এই বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহিনীর কন্যা আমাকে ভেণ্টনরের আস-পাশের সুন্দর পাহাড়গুলির উপর লইয়া গেল। আমি কিছু ধীরে চলিতাম না, কিন্তু তাহার গতি আমার অপেক্ষাও দ্রুত ছিল। সে আমাকে পিছনে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। সমস্ত রাস্তা সে কেবল কথা বলিতে বলিতে চলিতেছিল আর আমার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল—কখনো 'হাঁ', আর কখনো 'না', আর খুব বেশী হয়ত 'কেমন সুন্দর!' সে পবন-বেগে চলে আর আমি ভাবি কখন ঘরে ফিরিব। তাহা হইলেও "এখন ফিরিয়া চলুন" একথা বলার সাহস হইল না। এই সময় একটি টিলার উপর আমরা আসিয়া উঠিলাম। কেমন করিয়া নামিব? পায়ে উঁচু গোড়ালির বুট হইলেও এই বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সের রমণীটি বিদ্যুৎ-বেগে উপর হইতে নীচে নামিয়া গেল। আমি এখন লজ্জায় কেমন করিয়া গড়াইয়া নামিব ভাবিতেছিলাম। সে

নীচে নামিয়া হাসিতেছে, আমাকে সাহস দিতেছে, বলিতেছে—উপরে আসিয়া হাত ধরিয়া নামাইব নাকি ? এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া ভীত হইয়া থাকা যায় ! অতিকষ্টে কোথাও বা পা ঘসড়াইয়া, কোথাও বা বসিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল—ঠাট্টা করিয়া বলিল—'সা-বা-স'। এমনি করিয়া মেয়েটি যতটা পারে আমাকে লজ্জা দিল। এইরূপ ঠাট্টা করিয়া লজ্জা দেওয়ার তাহার অধিকারও ছিল

কিন্তু সব জায়গাতেই এমন করিয়া বাঁচা যায় না। তাই অসত্যের গরল হইতে ঈশ্বরই আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। একবার আমি ব্রাইটনে গিয়াছিলাম। যেমন ভেণ্টনর তেমনি ব্রাইটনও সমুদ্রতীরে হাওয়া খাওয়ার একটা কেন্দ্র। আমি যে হোটেলে উঠিয়াছিলাম সেই হোটেলে এক জন সাধারণ মত ধনশালিনী বিধবা মহিলা থাইতে আসিয়াছিলেন। এ আমার প্রথম বৎসরের কথা। এখানে যে যে খাদ্য দেওয়া হইত তাহার ফর্দ্দ সমস্তই ফরাসী-ভাষায় লেখা ছিল। আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। যে টেবিলে এই বিধবা বসিয়াছিলেন আমিও সেই টেবিলেই বসিয়াছিলাম। বর্ষীয়সী মহিলা দেখিলেন যে, আমি অজানা লোক—কিছু মুস্কিলে পড়িয়াছি। তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"তোমাকে এখানে অপরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি যেন মুশ্‌ড়াইয়া গিয়াছ, তুমি খাবার আনিতে এখনো বল নাই কেন ?"

আমি সেই ফর্দ্দ পড়িতেছিলাম ও পরিবেশনকারীকে জিজ্ঞাসা করিতে তৈরী হইতেছিলাম। মহিলাটির কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—"এ ফর্দ্দ আমি পড়িতে পারি না। আমি

নিরামিষাশী, কি আমি খাইতে পারি তাহাই জানিতে চেষ্টা করিতেছিলাম।"

তিনি বলিলেন—"আমি উহা বুঝিতে পারি, আচ্ছা তোমাকে সাহায্য করিতেছি—তুমি যাহা খাইতে পার তাহা বলিয়া দিতেছি।"

ধন্যবাদের সহিত আমি তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিলাম। এইভাবে আমাদের পরিচয় সুরু হয় এবং যতদিন বিলাতে ছিলাম ততদিন ত তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিলই, তারপরেও বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল। তিনি তাঁহার লণ্ডনের ঠিকানা দিয়া প্রতি রবিবারে আমাকে তাঁহার ওখানে খাইতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার ওখানে অন্য ব্যাপার উপলক্ষেও আমাকে ডাকিতেন, চেষ্টা করিয়া আমার লজ্জা ঘুচাইতেন, যুবতী মহিলাদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেন, আর তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে প্রলুব্ধ করিতেন। একজন মহিলা সেখানে থাকিতেন, বিশেষভাবে তাঁহার সঙ্গেই কথা বলিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইত। কখনও বা আমাদিগকে একা রাখিয়া তিনি বাহির হইয়া যাইতেন। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুব সহজসাধ্য ছিল না। ভাল করিয়া কথাই বলিতে পারিতাম না, হাস্য-পরিহাস আর কি করিব। কিন্তু তিনি আমাকে পথ দেখাইতে লাগিলেন, আমিও শিখিতে লাগিলাম। ক্রমে এমন হইল যে আমি রবিবারের আশায় বসিয়া থাকিতাম। এই যুবতী বন্ধুটির সহিত কথা বলিতে ভাল লাগিত।

বর্ষীয়সী মহিলাটি আমাকে ক্রমাগত লোভ দেখাইয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমাদের এই সৌহার্দ্দ্যে আনন্দ পাইতেন। সম্ভবতঃ আমাদের উভয়ের হিতই তাঁহার ঈপ্সিত ছিল।

এখন আমি কি করি? আমি ভাবিতে লাগিলাম—ভদ্র-মহিলাটিকে যদি আগেই জানাইয়া দিতাম যে আমার বিবাহ হইয়াছে, তবে খুব ভাল হইত? তাহা হইলে তিনি আমাকে বিবাহ করাইবার কথা ভাবিতেও পারিতেন না। কিন্তু এখনও ত প্রতিকারের উপায় আছে। আমি সত্য কথা বলিলেই ত সকল সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলাম। আমার যতটা স্মরণ আছে তাহার সারমর্ম্ম দিতেছি—

"ব্রাইটনে দেখা হওয়ার পর হইতেই আপনি আমাকে স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। যেমন করিয়া মা নিজের পুত্রের যত্ন লন আপনি তেমনি করিয়া আমার যত্ন লইতেছেন। আমার মনে হয়, আপনি আমাকে বিবাহিত দেখিতে ইচ্ছা করেন। তাই আমাকে যুবতীদিগের সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দিতেছেন। এই সব ব্যাপার আর যাহাতে বেশী দূর না গড়ায়, সেই জন্য আপনার নিকট প্রথমেই স্বীকার করিতেছি যে, আমি আপনার স্নেহের যোগ্য নহি। আপনার বাড়ীতে যখন যাতায়াত আরম্ভ করি তখনই আমার বলা উচিত ছিল যে আমি বিবাহিত। আমি জানি যে, ভারতীয় ছাত্রেরা এদেশে আসিয়া তাহারা যে বিবাহিত সে কথা গোপন করে—আমিও সেই প্রথারই অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু আমি এখন দেখিতে পাইতেছি যে, আমার বিবাহের কথা মোটেই গোপন করা সঙ্গত হয় নাই। তাহা ছাড়া আমাকে আরো স্বীকার করিতে হয় যে, আমি বাল্যকালেই বিবাহিত এবং আমার এক পুত্রও আছে। কথাটা আপনার নিকট গোপন করায় আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সত্য বলার সাহস ঈশ্বর দেওয়ায় আবার আনন্দও হইতেছে। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করিবেন? যে ভগ্নীর

সহিত আপনি আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন তাঁহার সহিত আমি কোনও অযোগ্য আচরণ করি নাই, কতদূর যে যাওয়া যায় সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে। আপনি জানেন না যে আমি বিবাহিত। সুতরাং কাহারও সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে এ ইচ্ছা আপনার হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার মন যাহাতে আর এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর না হয় তাহা করা আবশ্যক এবং সে জন্য আপনার নিকট সত্য প্রকাশ করা দরকার।

"যদি আমার এই পত্র পাওয়ার পরে আপনার ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে আপনি আর সঙ্গত বলিয়া মনে না করেন তাহা আমি মোটেই অন্যায় মনে করিব না। আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহের জন্য আমি চিরদিন আপনার নিকট ঋণী হইয়া থাকিব। কিন্তু যদি আপনি আমাকে ত্যাগ না করেন তবে আমি খুশী হইব—একথাও স্বীকার করিতেছি। আমাকে আপনার ওখানে যাওয়ার যদি যোগ্য মনে করেন, তবে আপনার ভালবাসার আর এক নূতন নিদর্শন পাইব এবং সেই ভালবাসার যোগ্য হওয়ার চেষ্টা করিতে থাকিব।"

অবশ্য এইরূপ পত্র মুহূর্ত্তেই লিখিতে পারি নাই, কতবার যে খসড়া করিয়াছি কে জানে! তবে এই পত্র পাঠাইয়া দিয়া মনে হইয়াছিল যে, আমার উপর হইতে বড় একটা বোঝা নামিয়া গিয়াছে।

প্রায় ফিরতি ডাকেই সেই বিধবা বান্ধবীর জবাব আসিল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন :—

"তোমার খোলা হৃদয়ের চিঠি পাইলাম। আমরা দুইজনেই সন্তুষ্ট হইয়াছি ও খুব হাসিয়াছি। তোমার সে অসত্য ক্ষমার যোগ্য।

তবে তোমার অবস্থা জানানোও ঠিকই হইয়াছে। আগামী রবিবারে আমরা তোমার পথ চাহিয়া থাকিব—তোমার বাল্য-বিবাহের গল্প শুনিব ও তোমাকে ঠাট্টা করার আনন্দ পাইব। তোমার সহিত আমাদের মিত্রতা যেমন ছিল তেমনি থাকিবে—এ বিশ্বাস রাখিও।"

আমার মধ্যে অসত্যের যে গরল প্রবেশ করিয়াছিল আমি তাহা এই প্রকারে দূর করিলাম। অতঃপর আমার বিবাহের কথা কোথাও বলিতে আর দ্বিধা করি নাই।

২০
ধর্ম্মের সহিত পরিচয়

বিলাত-প্রবাসের এক বৎসর পরে দুইজন থিয়োসফিষ্টের সহিত পরিচয় হয়। তাঁহারা সহোদর ভাই এবং অবিবাহিত। তাঁহারা আমার নিকট গীতার কথা বলিলেন এবং আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে উহা সংস্কৃততে পড়িতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি লজ্জিত হইলাম, কেননা আমি সংস্কৃতে বা গুজরাটীতে গীতা পড়ি নাই। সুতরাং আমাকে বলিতে হইল—"আমি গীতা পড়ি নাই, কিন্তু আপনাদের সহিত আমি পড়িতে প্রস্তুত আছি। আমার সংস্কৃত জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। তবে আমি উহা এতটুকু বুঝিতে পারি যে, অনুবাদে যদি ভুল অর্থ থাকে তাহা ধরিতে পারিব।" এই ভাবে আমি সেই ভাইদের সঙ্গে গীতা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলির মধ্যে—

> ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২
> ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতি ভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ *

---

* বিষয় চিন্তাকারী পুরুষের সেই বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কামনা হয়—কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে মূঢ়তা উৎপন্ন হয়, মূঢ়তা হইতে ভ্রান্তি হয়, ভ্রান্তি হইতে জ্ঞানের নাশ পায়। যাহার জ্ঞানের নাশ হইয়াছে সে মৃতের তুল্য।

এই শ্লোকগুলি আমার মনের উপর একটা গভীর রেখাপাত করিয়া গেল। উহার শব্দ আমার কানে এখনো বাজিতেছে। তখন আমার মনে হইল যে, ভগবদ্গীতা অমূল্য গ্রন্থ। সেই বোধ ধীরে ধীরে বাড়িয়া যাইতেছে এবং আজ তত্ত্ব-জ্ঞান সম্বন্ধে উহাকেই আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। আমার নিরাশার সময় ঐ গ্রন্থ হইতে অমূল্য সাহায্য পাইয়া থাকি। উহার প্রায় সমস্ত ইংরাজী অনুবাদই পড়িয়া ফেলিয়াছি। এডুইন আরনল্ডের অনুবাদই আমার কাছে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। মূল গ্রন্থের ভাব সম্পূর্ণ রক্ষিত হইলেও উহা অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। এই সময়ে আমি গীতা পড়িলেও উহা তলাইয়া বুঝার জন্য যে রকম পুনঃ পুনঃ পড়া দরকার তাহা করিয়াছি বলা যায় না। কয়েক বৎসর পরে গীতা আমার প্রতিদিনের পাঠের গ্রন্থ হইয়াছিল।

ঐ দুই ভাই আমাকে এডুইন আরনল্ডের বুদ্ধ-চরিত পড়িতে বলেন। আমি এতদিন সার এডুইন আরনল্ডের গীতার কথাই জানিতাম। বুদ্ধ-চরিত আমি ভগবদ্গীতা অপেক্ষাও অধিক আনন্দের সহিত পড়িলাম। পুস্তকখানা হাতে লইয়া শেষ না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

এই ভ্রাতৃদ্বয় একবার আমাকে 'ব্লভটস্কী লজে' লইয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে আমি ম্যাডাম ব্লভটস্কীর ও মিসেস্ বেসাণ্টের দর্শন পাই। মিসেস্ বেসাণ্ট তখন কেবল নূতন থিয়োসফিষ্ট সোসাইটীতে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে সংবাদপত্রে যে সব আলোচনা হইত, আমি তাহা আগ্রহের সহিত পড়িতাম। এই ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে সোসাইটীতে প্রবেশ করিতে বলেন। আমি বিনয় সহকারে অস্বীকার করিয়া বলি—"আমার নিজের ধর্ম্মের সম্বন্ধে জ্ঞান কিছুই নাই, সেইজন্য আমি কোন ধর্ম্ম-পথের সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করি না।" মনে হইতেছে—

সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের কথায় আমি ম্যাডাম ব্লভটস্কীর "কি টু থিয়োসফী" বহিখানা পড়ি। উহা হইতে হিন্দুধর্ম্মের পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা হয় এবং পাদরীদিগের কথা শুনিয়া, হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কারে পূর্ণ বলিয়া যে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা মন হইতে দূর হয়।

এই সময় এক নিরামিষ ভোজনালয়ে ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে আগত এক ভাল খৃষ্টানের সহিত আমার দেখা হইল। তিনি আমার সহিত খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বলিলেন। আমি তাঁহার নিকট আমার রাজকোটের স্মৃতির বর্ণনা করি। শুনিয়া তিনি দুঃখিত হন। তিনি বলিলেন— "আমি নিজে নিরামিষাহারী—মদ্যপানও করি না। অনেক খৃষ্টান মাংসাহার করে, মদ্যপান করে—একথা ঠিক। কিন্তু ঐ দুইয়ের একটাও খাওয়া—ধর্ম্মের আদেশ নহে। আপনাকে 'বাইবেল' পাঠ করিতে বলি।" তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করি। আমার মনে হইতেছে যে, তিনি নিজেই বাইবেল বিক্রয় করিতেন এবং ম্যাপ ও অনুক্রমণিকা সহিত একখানা 'বাইবেল' আমি তাঁহার নিকট হইতেই ক্রয় করিয়াছিলাম। 'বাইবেল' পড়িতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু 'ওল্ড-টেষ্টামেণ্ট' পড়িতেই পারিলাম না। জেনেসিস্ ব. সৃষ্টি-প্রকরণ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। "পড়িয়াছি"—একথা বলার জন্যই পড়িতে রস না পাইয়াও, না বুঝিয়াও দ্বিতীয় প্রকরণ শেষ করিয়াছিলাম। 'নাম্বাস' নামক প্রকরণ পড়িতে আমার ভাল লাগিত না। কিন্তু যখন 'নিউ-টেষ্টামেণ্ট' পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিলাম তখন মনের উপর অন্য প্রকার প্রভাব আসিয়া পড়িল। যিশুর 'সারমন্ অন দি মাউণ্ট' একেবারে হৃদয়ে প্রবেশ করিল। "তোমার কোটটী যদি কেহ চায় তবে র‍্যাপারটাও দিয়া দিও," "তোমাকে যে এক গালে মারিবে অপর গালও তাহার দিকে ধরিবে"—ইহা পড়িয়া মনে

অপার আনন্দ হইল। শামল ভট্টের কবিতা মনে হইল। আমার তরুণ মন গীতা, আরনল্ডের বুদ্ধচরিত, ও যিশুর বাক্য-সমূহের সমন্বয় খুঁজিয়া পাইল। ত্যাগেই ধর্ম্ম—একথা মনে লাগিল।

এই সকল পাঠ করার পর অপর ধর্ম্মাচার্য্যদিগের জীবনী পড়িতে ইচ্ছা হয়। কার্লাইলের 'বীর ও বীর-পূজা' খানা কোনও মিত্র পড়িতে বলেন। উহা হইতে পয়গম্বরের সম্বন্ধে পড়িয়া মহম্মদের মহত্ব, বীরত্ব ও তাঁহার তপশ্চর্য্যার বিষয় জানিলাম।

কিন্তু আমি এই পর্য্যন্ত পরিচয়ের পর তখনকার মত আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পরিলাম না। কারণ পরীক্ষার পুস্তক পাঠ করিয়া আর অপর পুস্তক পড়ার অবকাশ ছিল না। তবে আমি মনে মনে একথা ঠিক করিয়া রাখিলাম যে, আমার ধর্ম্ম-পুস্তক পড়িতে হইবে এবং সমস্ত ধর্ম্মের সঙ্গেই উপযুক্ত পরিচয় করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু নাস্তিকতা সম্বন্ধেও কিছু না জানিলে চলে কেমন করিয়া? "ব্রাড্‌ল"র নাম সকল ভারতবাসীই জানিত। "ব্রাড্‌ল" নাস্তিক ছিলেন। সেই জন্য ঐ বিষয়ে কিছু পুস্তক পড়িলাম—নাম ভুলিয়া গিয়াছি। উহাতে আমার মনে কোনও দাগ পড়ে নাই। নাস্তিকতার সাহারা মরুভূমি আমি তখনই পার হইয়া গিয়াছি। মিসেস্ বেসান্টের কথা তখন খুব আলোচিত হইত। তিনি নাস্তিকতা হইতে আস্তিকতায় আসিয়াছেন একথাতেও আমার মন নাস্তিকতার প্রতি উদাসীন হইল। মিসেস্ বেসান্টের "আমি কেমন করিয়া থিয়োসফিষ্ট হইলাম" নামক পুস্তক-খানা পড়িয়া ফেলিলাম। এই সময় "ব্রাড্‌ল"র দেহান্ত হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ওকিংএ নিষ্পন্ন হইল। আমি সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমার মনে হয় লণ্ডন-প্রবাসী সমস্ত ভারতবাসীই

গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য কয়েকজন পাদ্রীও উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফিরিবার সময় আমরা এক জায়গায় ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। সেই ভিড়ের মধ্য হইতে কোনও পালোয়ান নাস্তিক এই পাদ্রীদিগের মধ্যে একজনকে জেরা করিতে আরম্ভ করিল।

"কি মহাশয়! আপনি ত বলেন ঈশ্বর আছেন।"

সেই ভালমানুষটি নিম্নস্বরে জবাব দিলেন—"হাঁ আমি সত্যই তাহা বলি।"

তিনি হাসিলেন ও পাদ্রী অপেক্ষা ভাল বুঝেন—এই ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা! পৃথিবীর পরিধি ২৮০০০ মাইল তাহা আপনি স্বীকার করেন ত?

"অবশ্য"

"তাহা হইলে বলুন—ঈশ্বরের শরীরটা কত বড় আর তিনি কোথায়ই বা থাকেন?"

"আমরা যদি বুঝি তবে জানিব যে, আমাদের উভয়ের হৃদয়েই তিনি বাস করেন।"

"আমাকে ছেলে ভুলাইবেন না"—এই কথা বলিয়া তিনি বিজয়ী যোদ্ধার ন্যায় আসে-পাশে দৃষ্টিপাত করিলেন।

পাদরী নম্রভাবে মৌন হইয়া রহিলেন।

এই কথোপকথন হইতে নাস্তিকতার প্রতি আমার বিরুদ্ধভাব আরও বাড়িল।

২১

"নির্ব্বলকে বল রাম"

ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ও পৃথিবীর ধর্ম্ম-সমূহের কতক জ্ঞান ত হইল; কিন্তু এই জ্ঞান মানুষকে বাঁচাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিপদের সময় যে বস্তু মানুষকে বাঁচায়, সে সময় সে সম্বন্ধে তাহার বোধ বা জ্ঞান থাকে না। যখন নাস্তিক বাঁচিয়া যায়, তখন সে বলে—ভাগ্যের জোরে বাঁচিয়া গেলাম। আস্তিক সেই অবস্থায় বলে—ঈশ্বর বাঁচাইলেন। ধর্ম্মপুস্তক পাঠের অভ্যাস হইতে, সংযম হইতে—ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে প্রকট আছেন এই প্রকার সিদ্ধান্ত সে পরে করিয়া লয়। এই প্রকার অনুমান করার তাহার অধিকার আছে। কিন্তু যখন বাঁচে তখন কে বাঁচাইতেছে, উহা তাহার সংযম, কি আর কিছু—সে কথা সে জানে না। যে নিজের সংযম-বলের অভিমান করে তাহার সংযম ধূলিসাৎ হয় ইহা কে না অনুভব করিয়াছে? শাস্ত্রজ্ঞানের ত এ সময় কোনই মূল্য থাকে না। এই বুদ্ধি-গ্রাহ্য ধর্ম্মজ্ঞান যে মিথ্যা, তাহার অভিজ্ঞতা আমার বিলাতে হইয়াছিল। পূর্ব্বেও যখন এই প্রকার ভয় হইতে বাঁচিয়াছি তখন কেমন করিয়া যে বাঁচিয়াছি তাহা বুঝিতে পারি নাই। তখন আমার বয়স খুব অল্প ছিল। কিন্তু এখন আমার বয়স কুড়ি বৎসর হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি।

যতদূর স্মরণ হয় আমার বিলাত-বাসের শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৮৯০ সালে পোর্টস্‌মাউথে নিরামিষাহারীদের এক সম্মেলন হয়। সেখানে আমার ও আমার এক ভারতীয় মিত্রের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমরা

উভয়েই গিয়াছিলাম। সেখানে এক স্ত্রীলোকের বাড়ীতে আমাদের উঠিতে হইয়াছিল।

পোর্টস্‌মাউথকে খালাসীদিগের বন্দর বলা হয়। সেখানে অনেক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের বাস। এই স্ত্রীলোকেরা ঠিক বেশ্যা নয়, আবার নির্দোষও নয়। এই রকম এক বাড়ীতে আমাদিগকে উঠিতে হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতি ইচ্ছা করিয়া যে এই প্রকার বাড়ী ঠিক করিয়াছিলেন একথা বলা যায় না। পোর্টস্‌মাউথের মত বন্দরে কোনও যাত্রীকে রাখার জন্য কোনও ঘর ঠিক করিলে, কোনটা যে ভাল আর কোনটা যে খারাপ বাড়ী তাহা নির্ণয় করা শক্ত।

রাত্রি হইল। আমরা সভা হইতে বাড়ীতে ফিরিলাম। খাওয়ার পর তাস খেলা আরম্ভ হইল। বিলাতে ভাল ঘরেও অভ্যাগতের সহিত গৃহিনী তাস খেলিতে বসিয়া থাকেন। এই তাস খেলা নির্দোষ আমোদের সহিতই হয়। এখানে কিন্তু বীভৎস আমোদ আরম্ভ হইল। আমার সাথী যে উহাতে নিপুণ তাহা জানিতাম না। আমি এই কৌতুকে রস অনুভব করিলাম। আমি ফাঁদে পড়িয়াছিলাম। আমি কু-বাক্য হইতে কু-কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তাস ফেলিয়া উঠিতে উদ্যত হইয়াছি এমন সময় আমার হিতকারী সাথীর মধ্যে যে রামচন্দ্র বাস করিতেছিলেন তিনি বলিয়া উঠিলেন—বাঃ রে ছোক্‌রা! তোমার মধ্যেও শয়তান আছে দেখিতেছি—কিন্তু একাজ ত তোমার নয়! তুমি পালাও—শীঘ্র পালাও।

আমি লজ্জিত হইলাম। সাবধান হইলাম। হৃদয়ের ভিতরে বন্ধুর এই উপকার অনুভব করিলাম। মায়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ হইল। আমি পলাইলাম। নিজের কামরায়

কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া পঁহুছিলাম। বুক দপ্‌দপ্‌ করিতেছিল। ব্যাধের হাত হইতে পলাইতে পারিলে শীকারের যে অবস্থা হয়, আমারও তাহাই হইয়াছিল।

পর-স্ত্রী দেখিয়া বিকারগ্রস্ত হওয়া ও তাহার সহিত বাসনা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা এই আমার প্রথম বলিয়া মনে হয়। বিনা নিদ্রায় সে রাত্রি কাটিল। অনেক প্রকারের চিন্তা আমার মনের ভিতর আসিয়া জুটিল। এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইব ? পলাইব ? আমি কোথায় আছি ? আমি যদি সাবধান না হই তবে আমার অবস্থা কি হইবে ?—এই সব চিন্তা। অবশেষে স্থির করিলাম—আমি সাবধান হইয়া চলিব, এ বাড়ী ছাড়িব না, তবে যেমন তেমন করিয়া পোর্টস্‌মাউথ তাড়াতাড়ি ত্যাগ করিব। সম্মেলন দুই দিনের বেশী ছিল না। আমার স্মরণ আছে দ্বিতীয় দিনেই আমি পোর্টসমাউথ ত্যাগ করি। আমার সাথী পোর্টস্‌মাউথে কিছুদিন রহিয়া গেলেন।

ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর কি, তিনি কি ভাবে আমাদের মধ্যে কার্য্য করেন তাহা তখন কিছুই জানিতাম না। ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইলেন—লৌকিক রীতিতে আমি এইটুকু বুঝিলাম। কিন্তু বিবিধ ক্ষেত্রে আমার এই অভিজ্ঞতাই হইয়াছে। "ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন"—এই বাক্যের যে একটা গভীর অর্থ আছে তাহা আজ বুঝিতেছি, আর তাহার সঙ্গে ইহাও বুঝিতেছি যে, এই বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ এখনও আমার কাছে ধরা পরে নাই। অভিজ্ঞতা দ্বারাই ইহা বোধগম্য। ওকালতীর সম্পর্কে, সংস্থা চালাইবার কাজে, রাজনৈতিক ব্যাপারে—যখনই আধ্যাত্মিক প্রয়োগ সম্পর্কে পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি "ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়াছেন"। যখন সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া

বসিয়াছি, দুই হাত উঠাইয়া লইয়াছি, তখন কোথাও না কোথাও হইতে সাহায্য আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। স্তুতি, উপাসনা, প্রার্থনা—এ সকল কুসংস্কার নহে; আমাদের খাওয়া-দাওয়া, চলা, বসা—এগুলি যেমন সত্য তাহা অপেক্ষা উহা অধিক সত্য বস্তু। ইহাই সত্য আর সকলই মিথ্যা—একথা বলা অতিশয়োক্তি নহে।

এই উপাসনা, এই প্রার্থনা ইহা কিছু বাক্যের আড়ম্বর নহে। উহার মূল কণ্ঠে নয়—হৃদয়ে। সেই হেতু যদি আমাদের হৃদয় নির্ম্মল করি, যদি হৃদয়ের তার ঠিকভাবে বাঁধিয়া লই, তবে হৃদয় হইতে যে সুর উৎপন্ন হয় তাহা উর্দ্ধগামী হয়। সে সুরের জন্য জিহ্বার আবশ্যকতা নাই। উহা স্বভাবতঃই অদ্ভুত বস্তু। বিকার-রূপী মলিনতা দূর করার জন্য উপাসনা যে ঔষধ—এ বিষয়ে আমার সংশয় নাই। কিন্তু সেই প্রসাদ পাইতে হইলে নিজের ভিতরে সম্পূর্ণ নম্রতা আনা চাই।

২২

নারায়ণ হেমচন্দ্র

ইতিমধ্যে নারায়ণ হেমচন্দ্র বিলাতে আসিলেন। লেখক বলিয়া তাঁহার নাম আমি শুনিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মিস্ ম্যানিং-এর ওখানে দেখিলাম। মিস্ ম্যানিং জানিতেন যে, আমি লোকের সাথে মিশিতে জানি না। আমি তাঁহার ওখানে যাইতাম, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, কেহ কিছু বলিলে তবে কথা বলিতাম।

তিনি নারায়ণ হেমচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার পোষাক ছিল বিচিত্র। একটা বে-ঢপ পাত্‌লুন পরিয়াছিলেন, গায়ে একটা কোঁচ্‌কান ময়লা ব্রাউন রংএর কোট ছিল। নেকটাই, কলার ছিল না। কোটটা পার্শী কোটের মত কিন্তু তাহার গড়ন ঠিক ছিল না। মাথায় থোপা দেওয়া উলের টুপী ছিল। তিনি লম্বা দাড়ী রাখিতেন।

তাঁহার আকৃতি ছিল পাতলা, বেঁটে ধরণের। মুখে বসন্তের দাগ। মুখ গোলপানা, নাক না ছুঁচল, না মোটা। দাড়ির উপর হাত বুলাইতেন।

সকল সম্ভ্রান্ত সমাজেই নারায়ণ হেমচন্দ্রকে অদ্ভুত লাগিত এবং তাঁহার উপর চোখ পড়িতই।

"আপনার নাম আমি খুব শুনিয়াছি; আপনার কিছু লেখাও পড়িয়াছি। আপনি কি আমাদের ওখানে যাইবেন?"

নারায়ণ হেমচন্দ্রের স্বর কর্কশ ছিল। তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন—"আপনি কোথায় থাকেন ?"

"ষ্টোর ষ্ট্রীটে।"

"তাহা হইলে ত আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি। আমার ইংরাজী শিখিতে হইবে, আপনি কি আমাকে শিখাইতে পারিবেন ?"

আমি জবাব দিলাম—"আপনাকে যদি কোনও সাহায্য করিতে পারি তবে সুখী হইব। আমার দ্বারা যতটুকু পরিশ্রম হইতে পারে তাহা করিব। আপনি বলেন ত আপনার ওখানেই যাইব।"

"না, না, আমিই আপনার নিকট যাইব। আমার একখানা পাঠমালা আছে তাহা লইয়া যাইব।"

আমরা সময় স্থির করিলাম। আমাদের মধ্যে খুব সৌহার্দ্দ্য জন্মিল।

নারায়ণ হেমচন্দ্র ব্যাকরণ মোটেই জানিতেন না। 'ঘোড়া'কে বলেন ক্রিয়াপদ, আর 'দৌড়ান'কে বলেন বিশেষ্য। এই প্রকার কৌতুকাবহ ব্যাপার আমার কত মনে আছে। কিন্তু নারায়ণ হেমচন্দ্র দমিবার লোক ছিলেন না। আমার অল্প ব্যাকরণ জ্ঞান তাঁহার বিশেষ কিছু কাজে আসিত না। ব্যাকরণ না জানার জন্য তাঁহার কোন লজ্জাও ছিল না।

"আমি ত আপনার মত স্কুলে পড়ি নাই। আমার ভাব প্রকাশ করার জন্য ব্যাকরণের আবশ্যক হয় না। দেখুন আপনি কি বাংলা জানেন ? আমি বাংলা জানি। আমি বাংলায় ঘুরিয়াছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তক সমূহের অনুবাদ গুজরাটবাসীকে আমিই কি দিই নাই ? আমার ত অনেক ভাষা হইতে তরজমা

করিয়া গুজরাটকে দিতে হইবে। তরজমায় আমি শব্দার্থ গ্রাহ্যই করি না। ভাবার্থ দিই—তাহাতেই আমার সন্তোষ। আরও বেশী যদি দিতে হয়, তবে পরে যিনি বেশী জ্ঞান লইয়া আসিবেন তিনিই না হয় দিবেন। আমি ব্যাকরণ না শিখিয়াই মারাঠী জানি, হিন্দী জানি, এখন ইংরাজী জানিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার চাই শব্দ-সম্ভার। আপনি জানেন না, কেবল ইংরাজী শিখিয়াই আমার সন্তোষ নাই। আমাকে ফ্রান্সেও যাইতে হইবে এবং ফরাসী ভাষাও শিখিতে হইবে। আমি শুনিয়াছি ফরাসী ভাষায় বিস্তীর্ণ সাহিত্য আছে। যদি সম্ভব হয় তবে জার্ম্মাণীতেও যাইব এবং জার্ম্মাণ ভাষাও শিখিয়া লইব।"

এই ভাবে নারায়ণ হেমচন্দ্রের বাক্য-প্রবাহ চলিতে লাগিল। ভাষা জানিতে আর তেমনি ভ্রমণ করিতে তাঁহার লোভের অন্ত ছিল না।

"তাহা হইলে আপনি আমেরিকাতেও ত যাইবেন ?"

"নিশ্চয়, নূতন দুনিয়া না দেখিয়া কি আমি ফিরিব নাকি ?"

"কিন্তু আপনার কাছে এত বেশী পয়সা কোথায় ?"

"আমার পয়সার দরকারটা কি ? আমার কি আপনার মত ফিটফাট্ থাকিতে হয় ? আমি খাইবই বা কত আর পরিবই বা কত ? আমার পুস্তক হইতে কিছু পাই, বন্ধু-বান্ধবেরাও কিছু দেয়, তাহাতেই যথেষ্ট হইয়া যায়। আমি সকল সময় তৃতীয়-শ্রেণীতেই গিয়া থাকি। আমেরিকায় ডেকে যাইব।"

নারায়ণ হেমচন্দ্রের সাদাসিধা ধরণ তাঁহার নিজস্ব ছিল। তাঁহার সরলতাও উহার অনুরূপ ছিল। মনের ভিতর অভিমানের

নাম গন্ধও ছিল না। কেবল লেখক হিসাবে নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার একটা বড় রকমের ধারণা ছিল।

আমাদের রোজ সাক্ষাৎ হইত। আমাদের মধ্যে বিচার ও আচারের সাদৃশ্য ছিল। উভয়েই নিরামিষাহারী ছিলাম। দুপুরে অনেক সময় একত্র খাইতাম। এ সেই সময়ের কথা—যখন আমি সতের শিলিং-এ সপ্তাহ চালাইতাম এবং নিজে রান্না করিয়া খাইতাম। কখনো বা আমি তাঁহার কামরায় যাইতাম, কখনো বা তিনি আমার কামরায় আসিতেন। আমি ইংরাজী ঢংএ রান্না করিতাম। তাঁহার দেশী ঢংএর রান্না ছাড়া তৃপ্তি হইত না। ডাল ত চাই-ই। আমি গাজর ইত্যাদি দিয়া সুপ রাঁধিতাম, তাহাতে তাঁহার আমার প্রতি দয়া হইত। কোথা হইতে তিনি মুগ যোগাড় করিয়া আনিলেন। একদিন আমার জন্য মুগের ডাল রাঁধিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত তাহা খাইয়াছিলাম। এই ভাবে একে অপরকে রাঁধিয়া দেওয়ার পালা চলিল। আমার তৈরী খাদ্য আমি তাঁহাকে দিতাম, তিনি আমাকে দিতেন তাঁহার তৈরী আহার্য্য।

এই সময় কার্ডিনাল ম্যানিংএর নাম সকলের মুখেই ছিল। ডকের মজুরদের যে হরতাল (strike) হইয়াছিল, জন বার্ণস ও কর্ডিনাল ম্যানিং এর প্রযত্নে তাহা শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। কার্ডিনাল ম্যানিংএর সাদাসিধা ধরণ সম্বন্ধে ডিজ্‌রেলী খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই প্রশংসা আমি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন—"তাহা হইলে ত আমার এই সাধুপুরুষের সহিত দেখা করা চাই।"

"তিনি ত মস্ত বড় লোক, আপনি কেমন করিয়া দেখা করিবেন?"

"কেমন করিয়া দেখা করিতে হইবে তাহা আমি জানি। আপনাকে আমার নাম দিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে। আমি যে লেখক, এ পরিচয়ও দিতে হইবে। লিখিতে হইবে—তাঁহার জনহিতকর কার্য্যের নিমিত্ত ধন্যবাদ নিজে গিয়া দিয়া আসার জন্য দেখা করিতে চাই। আর ইহাও লিখিবেন—আমি ইংরাজী জানি না বলিয়া আপনাকে আমার সহিত দ্বি-ভাষী করিয়া লইয়া যাইব।"

ঐরূপ পত্র আমি লিখিয়া দিলাম। দুই তিন দিনের মধ্যেই কার্ডিনাল ম্যানিং-এর জবাব আসিল। তিনি দেখা করার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

আমরা দু'জনে গেলাম! আমি দস্তুর মাফিক দেখা করার পোষাক পড়িলাম। আর নারায়ণ হেমচন্দ্র চলিলেন যেমন ছিলেন তেমনি ভাবে—সেই কোট আর সেই পাত্‌লুন। আমি পরিহাস করিলাম। তিনি আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"তোমরা সভ্যরা বড় ভীরু। মহাপুরুষেরা কাহারও পোষাকের দিকে তাকান না। তাঁহারা হৃদয়ের দিকটাই দেখেন।"

আমরা কার্ডিনালের মহলে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীটা রাজবাড়ীর মত। আমরা বসা মাত্রই এক পাতলা, বুড়া, লম্বা পুরুষ প্রবেশ করিলেন। আমাদের দুইজনের সঙ্গেই করমর্দ্দন করিলেন। নারায়ণ হেমচন্দ্র তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন—

"আপনার সময় আমি লইব না। আমি আপনার কথা বহু শুনিয়াছি। আপনি হরতালের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। দুনিয়ার সাধু পুরুষ দর্শন করা আমার একটি প্রথা এবং আমি

আপনাকে দেখিতে আসিয়া সেই প্রথাই পালন করিয়াছি। আর সেই জন্য আপনাকে আমি এই কষ্ট দিলাম।"

একথাগুলি আমার তরজমা। নারায়ণ হেমচন্দ্র উহা গুজরাটী ভাষায় বলিয়াছিলেন।

"আপনি আসাতে সন্তুষ্ট হইলাম। আমি আশা করি এখানে (বিলাতে) থাকা আপনার পক্ষে অসুবিধা-জনক হইবে না এবং আপনি এখানকার লোকের সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিবেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"—এই কথা কয়টি বলিয়া কার্ডিনাল আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

একবার নারায়ণ হেমচন্দ্র ধুতি ও সার্ট পড়িয়া আমার ওখানে আসেন। আমাদের গৃহকর্ত্রী দরজা খুলিয়াই ভীত হইয়া দৌড়াইয়া আমার কাছে আসিলেন। (আমি যে বাড়ী বদলাইয়া থাকি তাহা ত পাঠক জানেন, এই গৃহ-স্বামিনীটি নারায়ণ হেমচন্দ্রকে পূর্ব্বে দেখেন নাই।) তিনি বলিলেন—"একটা পাগলের মত লোক তোমার সাথে দেখা করিতে চায়"। আমি দরজার কাছে গিয়া নারায়ণ হেমচন্দ্রকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার মুখে চোখে সেই পরিচিত হাস্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না!

"আপনাকে ছোকরারা ক্ষেপাইয়া তুলিল না!"

তিনি জবাব দিলেন "আমার পিছনে ছুটিতেছিল কিন্তু আমি গ্রাহ্য না করায় শান্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।"

নারায়ণ হেমচন্দ্র কয়েক মাস বিলাতে থাকিয়া প্যারিসে যান। সেখানে ফরাসী-ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন ও ফরাসী পুস্তকের তরজমা করেন। তাঁহার তরজমা দেখিয়া দেওয়ার মত ফরাসী ভাষা আমি

জানিতাম। সেই জন্য আমাকে তিনি দেখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তরজমা বলা যায় না—তাহা ভাবার্থ মাত্র।

অবশেষে তিনি তাঁহার আমেরিকা যাওয়ার সঙ্কল্পও পূর্ণ করেন। বহু কষ্টে তিনি ডেক অথবা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিতে পারিয়াছিলেন। আমেরিকাতে ধুতি-সার্ট পরিয়া বাহির হওয়ার জন্য "অসভ্য পোষাক পরিধান"—অপরাধে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমার স্মরণ আছে—পরে তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন।

২৩
বিরাট প্রদর্শনী

সন ১৮৯০ সালে প্যারিসে এক বিরাট প্রদর্শনী হয়। উহার জন্য যে আয়োজন হইতেছিল তাহার বিবরণ সংবাদ পত্রে পড়িয়া প্যারিসে যাওয়ারও খুব ইচ্ছা হইল। তাহা ছাড়া প্রদর্শনী দেখিতে গেলে প্রদর্শনী ও প্যারিস দুই-ই দেখা হয়। প্রদর্শনীতে বিশেষ আকর্ষণ ছিল—'এফিল টাওয়ার'। এই 'টাওয়ার' আগাগোড়া লোহার তৈরী। উহা এক-হাজার ফুট উচ্চ। এক হাজার ফুট উঁচু বাড়ী খাড়া করিয়া রাখাই যায় না বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। ইহা ছাড়াও প্রদর্শনীতে দেখিবার জিনিষ আরো অনেক কিছু ছিল।

প্যারিসের এক নিরামিষ ভোজনালয়ের কথা পড়িয়াছিলাম। সেইখানে একটা কামরা স্থির করা গেল। গরীবের মত চলিয়া প্যারিসে পঁহুছিলাম। সেখানে সাত দিন থাকি। পায় হাঁটিয়াই যাহা কিছু দ্রষ্টব্য দেখিয়া লইয়াছিলাম। সঙ্গে প্যারিসের ও প্রদর্শনীর গাইড্ ও নক্সা ছিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া রাস্তা চিনিয়া প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখি।

প্রদর্শনীর বিশাল রচনা ও নানা প্রকার দ্রব্য-সম্ভারের বাহুল্যের কথা ছাড়া আর কিছু মনে নাই। এফিল-টাওয়ারের উপর দুই তিনবার চড়িয়াছিলাম সে কথা স্মরণ আছে। প্রথম তলায় খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এত উঁচুতে বসিয়া ভোজন করিয়াছি বলিতে পারার জন্য, সেখানে সাত শিলিং জলে ফেলিয়া দিয়াও

কিছু খাইয়াছিলাম। প্যারিসের প্রাচীন মন্দিরগুলির বিষয় স্মরণ আছে। সেখানকার মহিমা ও তাহার ভিতরের শান্তির কথা ভুলিতে পারা যায় না। নোতর্‌দামের অপূর্ব্ব কারিগরী ও ভিতরের চিত্রকার্য্যের কথাও স্মরণ আছে। যাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই স্বর্গীয় দেবালয় গড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের ভিতরে যে গভীর ঈশ্বর-প্রেম ছিল তাহা আমি অনুভব করিলাম।

প্যারিসের ফ্যাসন, প্যারিসের স্বেচ্ছাচার, সেখানকার ভোগবিলাসের কথা অনেক পড়িয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহা অলিতে গলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্যারিসের দেবালয়গুলি তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে দেবালয়ে প্রবেশ করিলেই বাহিরের অশান্তির কথা আর মনে থাকে না—লোকের ব্যবহার বদলাইয়া যায়, লোকের ধরণ বদলাইয়া যায়, মনের ভিতর একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠে। কুমারী মরিয়মের মূর্ত্তির সম্মুখে কেহ না কেহ প্রার্থনা করিতেছেন। ইহা যে কুসংস্কার নয়, ইহা যে ভক্তি—সে বিশ্বাস আমার সেই সময়েই হইয়াছিল এবং তাহা এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে। কুমারীর মূর্ত্তির সম্মুখে হাটু গাড়িয়া প্রার্থনা-রত উপাসকেরা মার্ব্বেল পাথরের পূজা করেন না, উহার অন্তরস্থ ভাব-ধারারই পূজা করেন। উহাতে ঈশ্বরের মহিমা কম হয় না, বরঞ্চ বাড়িয়া যায়—এই প্রকারের একটা ভাব যে তখন আমার মনে উদয় হইয়াছিল তাহার অস্পষ্ট স্মৃতি আজও রহিয়াছে।

এফিল-টাওয়ার সম্বন্ধে কিছু বলার আবশ্যক আছে। এফিল-টাওয়ারের দ্বারা আজ কি প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয় তাহা জানি না। প্রদর্শনীতে যাওয়ার পর উহার সম্বন্ধে বর্ণনা কতই পড়িয়াছি। টাওয়ারের স্তুতি ও নিন্দা উভয়ই শুনিয়াছি। যাঁহারা নিন্দা করিয়াছেন তাঁহাদের

মধ্যে টোলষ্টোয়ই ছিলেন প্রধান। তিনি লিখেন যে, এফিল-টাওয়ার মনুষ্যের মূর্খতার নিদর্শন, উহা জ্ঞানের ফল নয়। তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে যত প্রচলিত নেশা আছে তাহার মধ্যে তামাকের ব্যসন একদিক দিয়া দেখিলে সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ। মদ খাইয়া যে কুকর্ম্ম করার সাহস হয় না, চুরট খাইয়া তাহা হয়। মদ খাইয়া মানুষ মাতাল হয়। কিন্তু যে ধূম পান করে তাহার বুদ্ধিই ধোঁয়াচ্ছন্ন হয় এবং সেই জন্য সে হাওয়ার কেল্লা রচনা করে। এফিল-টাওয়ার এই প্রকার ব্যসনের পরিণাম। টোলষ্টোয় এমনি ভাবে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করেন।

এফিল-টাওয়ারে ত কোনই সৌন্দর্য্য নাই। প্রদর্শনীকে উহা যে কোনও সৌষ্ঠব দিয়াছিল—এ কথাও বলা যায় না। একটা নূতন জিনিষ, একটা বৃহদাকার জিনিষ বলিয়াই উহা দেখার জন্য হাজার হাজার লোক ছুটিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এফিল-টাওয়ার প্রদর্শনীর একটা খেলনা মাত্র ছিল। যতক্ষণ আমরা মোহের বশীভূত থাকি ততক্ষণ আমরা বালকের ন্যায় থাকি, টাওয়ার এই কথাই ভাল করিয়া প্রমাণ করিতেছে —ইহাই উহার সার্থকতা বলিয়া গণ্য করা যায়।

২৪

ব্যারিষ্টার হইলাম—তারপর ?

যে কার্য্যের জন্য বিলাত আসিয়াছিলাম সেই কার্য্য অর্থাৎ ব্যারিষ্টার হওয়া সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই বলি নাই। এখন সে বিষয়ে কিছু লিখিবার সময় আসিয়াছে।

ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্য দুইটী জিনিষ দরকার। প্রথম—টার্ম অর্থাৎ সর্ত্ত রক্ষা করা। বৎসরে চারটা করিয়া টার্ম আছে—তিন বৎসরে বারটা টার্ম। দ্বিতীয় আবশ্যক হইতেছে—আইনের পরীক্ষা দেওয়া। 'টার্ম রক্ষা' করার অর্থ 'খানা খাওয়া'। প্রত্যেক টার্মে প্রায় চব্বিশটী করিয়া খানা হয়—তাহার মধ্যে ছয়টা অন্ততঃ খাওয়া চাই। খানা খাওয়া মানে খাইতেই যে হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই। কেবল নির্দ্দিষ্ট সময় হাজিরা দিয়া খানা খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ সকলেই খাওয়া-দাওয়া করেন। খানায় সারি সারি প্লেট আসে ও উত্তম মদ্য আসে। তাহার দাম অবশ্য দিতে হয়। উহা আড়াই হইতে সাড়ে তিন শিলিং পর্য্যন্ত হয়, অর্থাৎ দুই তিন টাকা খরচ হয়। এই দাম খুবই কম, কেননা বাহিরের হোটেলে কেবল মদের খরচই ঐরূপ পড়িয়া থাকে। খাওয়ার খরচা হইতে মদ খাওয়ার খরচা অধিক—একথা ভারতবর্ষে যাঁহারা রিফর্ম্মড্ বা সংস্কৃত হন নাই, তাঁহাদিগের নিকট আশ্চর্য্য মনে হইবে। বিলাতে গিয়া ইহা জানিয়া আমি খুব আহত হই ও ভাবি যে, মদ খাইতে মানুষ এত টাকা কেমন করিয়া নষ্ট করে! প্রথম দিকে এই সব আহার্য্যের আমি কিছুই খাইতাম

না। আমার খাওয়ার মধ্যে থাকিত কেবল রুটি, আলু-সিদ্ধ ও কপি-সিদ্ধ। তখন উহা খাইতে ভাল লাগিত না বলিয়াই খাইতাম না। কিন্তু পরে যখন উহার স্বাদ লইতে শিখিয়াছিলাম তখন অন্য প্লেট চাহিয়া লওয়ার শক্তিও আমার হইয়াছিল।

ছাত্রদিগের জন্য এক প্রকার খানা ও বেঞ্চারদিগের জন্য অন্য প্রকার ভাল খানা থাকে। আমার সহিত এক পার্শী বিদ্যার্থী ছিলেন, তিনি নিরামিষাহারী। আমরা দুইজনে নিরামিষাহার প্রচারার্থে বেঞ্চারদের খানা হইতে নিরামিষ যাহা পাওয়া যায় তাহার জন্য আবেদন করি, আবেদন মঞ্জুর হওয়ায় আমরা বেঞ্চারদের টেবিল হইতে ফল ও অন্যান্য তরকারি খাইতে লাগিলাম।

মদ আমার চলিত না। চারজনের মধ্যে দুই বোতল মদ পাওয়া যায়। অনেকের আমাকে চতুর্থ ব্যক্তি করিয়া লওয়ার খুব আগ্রহ ছিল। আমি মদ খাই না বলিয়া বাকী তিন জনে দুই বোতল মদ উড়াইতে পারে—আমার সম্বন্ধে আগ্রহের এই ছিল কারণ। আবার প্রতি টার্মে একটা করিয়া মহা-রাত্রি (গ্রাণ্ড নাইট) আসিত। সেদিন পোর্ট ও শেরী ছাড়াও পাওয়া যাইত শ্যাম্পেন মদ। এই সব মহা-রাত্রিতে আমার মূল্য আরও বাড়িয়া যাইত, আমার উপস্থিতির জন্য নিমন্ত্রণ আসিত।

এই খাওয়া-দাওয়া হইতে ব্যারিষ্টারীতে কি লাভ হয় তাহা তখনও বুঝি নাই, পরেও বুঝি নাই। এমন এক সময় অবশ্য ছিল যখন খানায় লোক বেশী হইত না—তাহাতে বিদ্যার্থী ও বেঞ্চারের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিত, বক্তৃতা হইত এবং তাহা হইতে ছাত্রেরা ব্যবহারিক জ্ঞানও পাইতে পারিত। মোটের উপর একপ্রকার সভ্যতা শিক্ষা ও বক্তৃতা

দেওয়ার শক্তি বাড়াইবার একটা সুযোগ তখন তাহাতে ছিল। কিন্তু আমাদের সময়ে এ সমস্ত কিছুই সম্ভব ছিল না। বেঞ্চারেরা একেবারে অস্পৃশ্য হইয়া বসিয়াছিলেন। সুতরাং পুরানো রীতির এখন আর কোনই অর্থ নাই। তবুও প্রাচীনতা-প্রেমী ধীর-গামী ইংলণ্ড সেই প্রথা এখনো বজায় রাখিয়াছে।

পাঠের অনুক্রম খুবই সহজ। তাই ব্যারিষ্টারদিগকে পরিহাস করিয়া ডিনার(ভোজ)—ব্যারিষ্টার বলা হয়। সকলেই জানে—এ পরীক্ষার মূল্য না থাকারই মত। আমাদের সময়ে দুইটা বিষয়ে পরীক্ষা হইত। রোমান-ল ও ইংলণ্ডের আইন। উভয় পরীক্ষার জন্যই পুস্তক নির্দ্দিষ্ট থাকিত। কিন্তু তাহা কেহ পড়িত না। রোমান-ল-এর উপর ছোট নোট আছে, উহা পড়িয়া পনের দিনেও পাশ করিতে আমি দেখিয়াছি। ইংলণ্ডের আইন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আমি জানি নোট হইতে পড়িয়া দুই তিন মাসেই অনেকে উহাতে পাশ হইয়াছেন। পরীক্ষার প্রশ্ন সহজ, পরীক্ষকেরা উদার। রোমান-ল-তে শতকরা ৯৫ হইতে ৯৯ জন পাশ হয়। শেষ পরীক্ষায় শতকরা ৭৫ জন পাশ হয়। আবার পরীক্ষা বৎসরে একবার নয়—চারবার হয়। এত সুবিধার পরীক্ষা কাহারও নিকট শক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে না।

কিন্তু আমি উহাকে শক্ত করিয়া তুলিয়াছিলাম। আমার মনে হইল যে, আমার আসল পুস্তকগুলিই পড়িয়া লওয়া দরকার। না পড়া, আমার কাছে ঠকানো বলিয়া মনে হইল। সেইজন্য আদত বইগুলি কিনিতে আমি অনেক ব্যয় করিলাম। আমি ল্যাটিন ভাষায় রোমান-ল পড়া স্থির করিলাম। বিলাতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যে ল্যাটিন শিখিয়াছিলাম এখন তাহা কাজে লাগিল। এই পাঠ ব্যর্থ হয় নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় রোমান ও ডচ্-ল প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য। উহা বুঝিতে জাষ্টিনিয়ান পাঠ আমার খুব সাহায্য করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের আইন পড়িতে আমার নয়মাস কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ব্রুমের 'কমন ল' একখানা বড় কিন্তু চিত্ত-রঞ্জক পুস্তক। উহা পড়িতে অনেক সময় গেল। স্নেলের 'ইকুইটি' পড়িতে ভাল লাগিত কিন্তু বুঝিতে দম বাহির হইত। হোয়াইট ও ট্যুডরের 'প্রধান কেস সমূহ' হইতে যাহা পড়িতে হইত তাহাও পড়িতে ভাল লাগিত, জ্ঞানও বাড়িয়াছিল। উইলিয়াম্‌স্ ও এড্‌ওয়ার্ডের স্থাবর সম্পত্তির উপর পুস্তক ও গুডিভের অস্থাবর সম্পত্তির উপর পুস্তক আমি আগ্রহের সহিত পড়িতে পারিয়াছিলাম। উইলিয়াম্‌সের পুস্তক ত আমার কাছে নভেলের মত লাগিয়াছিল। উহা পড়িতে ক্লান্তি আসিত না। আইন পুস্তকের মধ্যে ঐ প্রকার রসের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া আমি এক মেইনের 'হিন্দু-ল' পড়িতে পারিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের আইনের কথা এখানে নয়।

পরীক্ষাগুলিতে পাস করিলাম। ১৮৯১ সালের ১০ই জুন আমাকে ব্যারিষ্টার করা হয়, আড়াই শিলিং দিয়া ইংলণ্ডের হাইকোর্টের তালিকায় আমি নাম উঠাইলাম। ১২ই জুন ভারত অভিমুখে ফিরিলাম।

কিন্তু আমার নিরাশা ও ভীতির শেষ ছিল না। আইন পড়িয়াছি সত্য কিন্তু ওকালতী করিতে পারি এমন জ্ঞান পাইয়াছি বলিয়া আমার মনে হইল না।

এই ব্যর্থতার বর্ণনার জন্য অন্য আর একটি অধ্যায় আবশ্যক।

২৫

আমার সহায়হীনতা

ব্যারিষ্টার হওয়া সহজ, ব্যারিষ্টারী করা কঠিন। আইন পড়িয়াছি কিন্তু ওকালতী করিতে শিখি নাই। আইনের ভিতর আমি কতকগুলি ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত পড়িয়াছি ও তাহা ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু ব্যবসার মধ্যে কেমন করিয়া তাহার প্রয়োগ করা যায় ইহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। "তোমার সম্পত্তি এমন ভাবে ব্যবহার কর যেন অন্যের সম্পত্তির লোকসান না হয়"—ইহা ত ধর্ম্ম বচন। কিন্তু ওকালতী করিতে গিয়া মক্কেলের মোকদ্দমায় কেমন করিয়া উহার ব্যবহার করা যাইবে তাহা বুঝিতে পারি নাই। যাহাতে উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যবহার করা হইয়াছে এমন মোকদ্দমার উদাহরণ পড়িয়াছি, কিন্তু তাহা হইতে ঐ সিদ্ধান্ত কাজে লাগাইবার যুক্তি খুঁজিয়া পাই নাই।

তারপর ভারতবর্ষের আইনের নাম পর্য্যন্তও আমাদের পাঠ্য আইনের ভিতর ছিল না। হিন্দু-শাস্ত্র, ইস্‌লামী-আইন কেমন জিনিষ তাহাও জানি না। একখানা আরজি লিখিতেও শিখি নাই। আমি খুবই অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম। ফিরোজশা-মেহ্‌তার নাম শুনিয়াছিলাম। তিনি আদালতে যেমন করিয়া সিংহের মত গর্জ্জন করেন তাহা বিলাতে কি করিয়া শিখিয়াছিলেন? তাঁহার মত জ্ঞান জন্মেও পাইব না, কিন্তু উকীল হিসাবে জীবিকা উপার্জ্জনের শক্তি পাওয়ার সম্বন্ধেও আমার মনে মহা আশঙ্কা উপস্থিত হইল।

যখন আইন পড়িতেছিলাম তখনই এই ধরণের চিন্তা মনের ভিতর

চলিতেছিল। আমার মুস্কিলের কথা দুই এক জন মিত্রের নিকট জানাইলাম। তাঁহারা দাদা-ভাইয়ের পরামর্শ লইতে বলিলেন। দাদা-ভাইয়ের নামে আমার নিকট চিঠি ছিল তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ঢের দিন পরে আমি এই চিঠির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। এইরূপ মহান্ পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার কি অধিকার আছে? তাঁহার যখন কোনও বক্তৃতা থাকে তখন শুনিতে যাই, এক কোনে বসিয়া কান তৃপ্ত করিয়া উঠিয়া আসি। তিনি বিদ্যার্থীদের সহিত মেলা-মেশার জন্য এক মণ্ডল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি উপস্থিত থাকিতাম। বিদ্যার্থীদিগের জন্য দাদাভাইয়ের হৃদয়ের যেমন আগ্রহ ছিল, তেমনি শ্রদ্ধা ছিল, দাদাভাইয়ের প্রতি বিদ্যার্থীদিগের। দেখিয়া আমি আনন্দ পাইতাম। অবশেষে একদিন তাঁহাকে সেই পরিচয়-পত্র দেওয়ার সাহস সঞ্চয় করিলাম। তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—তোমার দেখা করিবার যদি প্রয়োজন হয়, অথবা কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক হয় তবে অবশ্য আসিও। কিন্তু আমি তাঁহাকে কখনো কষ্ট দিই নাই। বিশেষ দরকার না হইলে তাঁহার সময় লওয়া আমার পাপ বলিয়া মনে হইত। সেই জন্য বন্ধুটির পরামর্শ সত্ত্বেও দাদাভাইয়ের কাছে মুস্কিলের কথা বলার জন্য যাওয়ার সাহস আমার হয় নাই।

এখন মনে নাই—এই বন্ধুটিই বা অন্য কেহ মিঃ ফ্রেডরিক পিঙ্কাট-এর সঙ্গেও আমাকে দেখা করিতে বলেন। মিঃ পিঙ্কাট কন্জারভেটিভ্ দল-ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার প্রেম নির্ম্মল ও নিঃস্বার্থ ছিল। অনেক বিদ্যার্থী তাঁহার পরামর্শ লইত। সেই জন্য চিঠি লিখিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার সময়

চাহিলাম। তিনি সময় দিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। এই সাক্ষাৎকার আমি কখনো ভুলিতে পারিব না। যেন বন্ধু বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন, এমনি ভাবেই তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমার নিরাশা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন—"তুমি কি মনে কর সকলেরই ফিরোজশা মেহ্‌তা হওয়ার আবশ্যক আছে? ফিরোজশা কি বদরুদ্দীন একজন কি দুইজন হয়। তুমি নিশ্চয় জানিও যে সাধারণ উকীল হইতে বিশেষ বুদ্ধির আবশ্যক নাই। সাধারণ সততা ও পরিশ্রম দ্বারাই লোক ওকালতী ব্যবসা সুখে চালাইতে পারে। সকল মোকদ্দমাই কিছু গোলমালের নহে। আচ্ছা, তোমার সাধারণ জ্ঞান কেমন?"

যাহা পড়িয়াছি তাহা যখন তাঁহাকে জানাইলাম—মনে হইল তাহাতে তিনি যেন কতকটা নিরাশ হইলেন। কিন্তু সে নিরাশা ক্ষণিকের, আবার তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন:—"তোমার ব্যাধি আমি বুঝিয়াছি। তোমার সাধারণ পড়া খুব কম। তোমার সংসারের জ্ঞান নাই। আর উকীলের উহা না হইলেই চলে না। তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাসও পড় নাই। উকীলের মনুষ্য-স্বভাবের খবর লইতে হয়। চেহারা দেখিয়াই মানুষের চরিত্র তাহার বুঝিতে পারা চাই। তাহা ছাড়া প্রত্যেক ভারতবাসীরই ভারতবর্ষের ইতিহাস জানা আবশ্যক। ইহার সহিত ওকালতীর সম্বন্ধ নাই, তবুও তোমার ঐ জ্ঞান থাকা দরকার। আমি দেখিতেছি যে তুমি কে ও মলিসনের ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিহাসও পড় নাই। উহা শীঘ্রই পড়িয়া ফেলিও। আরও দুই খানা গ্রন্থের নাম দিতেছি—তুমি মানুষের পরিচয় পাওয়ার জন্য উহা পড়িও।"—এই

বলিয়া লভেটর ও শেমেল পেনিকের মুখ-সামুদ্রিক বিদ্যা সম্পর্কীয় দুই খানা পুস্তকের নাম লিখিয়া দিলেন।

এই মাননীয় বন্ধুর কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁহার সাম্‌নে আমার ভয় ক্ষণমাত্রেই দূর হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে আসার পরেই আবার আমার ভয় ফিরিয়া আসিল। "মুখ দেখিয়াই লোক চিনিয়া ফেলিব"—এই বাক্য ও ঐ পুস্তক দুইখানার কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম। পরদিন লভেটরের পুস্তক খরিদ করিলাম। শেমেল পেনিকের পুস্তক দোকানে পাওয়া গেল না। লভেটরের পুস্তক পড়িলাম, উহা স্নেল হইতেও কঠিন বোধ হইল। শেক্‌সপীয়রের চেহারা-সম্পর্কীয় পুস্তকও পড়িলাম। কিন্তু লণ্ডনের রাস্তায় চলিতে চলিতে সেক্‌সপীয়রের লোক-পরিচয়-শক্তি অর্জ্জন করিতে পারি নাই।

লভেটর হইতেও আমি কোনো জ্ঞান পাইলাম না। মিঃ পিঙ্কাটের উপদেশ সোজাসুজি কোনও কাজে লাগিল না বটে—কিন্তু তাহার স্নেহের ব্যবহারের ফল খুব ভালই হইয়াছিল। তাঁহার হাসি-মুখ, উদার চেহারা স্মরণে রহিয়া গেল। তাঁহার বাক্যের উপর শ্রদ্ধা রাখিলাম যে, ওকালতী করিতে ফিরোজশা মেহ্‌তার বুদ্ধি, স্মরণ-শক্তি ইত্যাদির আবশ্যকতা নাই—সাধুতা ও পরিশ্রম দ্বারাই কাজ চালানো যায়। এই দুই পদার্থ আমার ভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সুতরাং কিছু আশাও আসিল।

কে ও মলিসনের ইতিহাস আমি বিলাতে পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু প্রথম সুযোগেই পড়িয়া লওয়া স্থির করিয়াছিলাম। সেই অবকাশ দক্ষিণ আফ্রিকাতে পাইয়াছিলাম।

আমার সহায়হীনতা

এই নিরাশার মধ্যে এতটুকু মাত্র আশা সম্বল করিয়া আমি কম্পিত পদে বোম্বাই বন্দরে 'আসাম, ষ্টীমার হইতে নামিলাম। বন্দরে সমুদ্র উত্তাল ছিল। লঞ্চে করিয়া নামিতে হইল।

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

দ্বিতীয় ভাগ

১

রায়চন্দ্ ভাই

শেষ অধ্যায়ে আমি লিখিয়াছি যে, বোম্বাই বন্দরে সমুদ্র উত্তাল ছিল। জুন জুলাই মাসে ভারত-মহাসাগরে ইহা কিছু নূতন নয়। সমুদ্র এডেন হইতেই ঐ রকম ছিল। সকলেই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, একলা আমিই সুস্থ ছিলাম। তুফান দেখার জন্য ডেকের উপর থাকিতাম—আর খুব ভিজিয়া যাইতাম। আমি ছাড়া সকাল বেলায় প্রাতরাশের সময় আর দুই এক জন মাত্র উপস্থিত থাকিতেন। কোলে ডিস্ রাখিয়া খাইতে হইত, নতুবা ডিস্ সমেত জাউ কোলেই পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা—ঝড়ের অবস্থা এমনি ছিল।

বাহিরের এই তুফান আমার অন্তরের তুফানেরই চিহ্নস্বরূপ ছিল। বাহিরের তুফান সত্ত্বেও আমি যেমন শান্ত ছিলাম, অন্তরের তুফান সত্ত্বেও তেমনি শান্ত ছিলাম একথা বলা যায়। জাতি হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার প্রশ্ন মনে আসিত। ব্যবসার চিন্তার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তারপর আমি সংস্কারক হইয়াছি, মনে অনেক সংস্কারের কল্পনা করিয়া রাখিয়াছি—সেজন্যও চিন্তা আসিত। কিন্তু ইহা হইতেও গুরুতর দুঃখ আমার জন্য সঞ্চিত ছিল।

মাকে দেখার জন্য আমি অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। বন্দরে পৌঁছিয়া দেখিলাম আমার বড় ভাই উপস্থিত আছেন। তিনি ডাক্তার মেহ্‌তা ও তাঁহার বড় ভাইয়ের সহিত পরিচয় করিয়া লইয়াছিলেন। ডাক্তার মেহ্‌তার আগ্রহে আমাকে তাঁহার ওখানেই উঠিতে হইল।

যে সম্বন্ধ বিলাতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা দেশেও এইভাবে স্থায়ী রহিয়া গেল এবং আরও দৃঢ় হইয়া দুই পরিবারে বিস্তৃত হইল।

মাতার স্বর্গবাস সম্বন্ধে আমি কিছু জানিতাম না। বাড়ী পৌছিলে আমাকে সেই সংবাদ দিয়া স্নান করাইলেন। আমি এ সংবাদ বিলাতেই পাইতে পারিতাম, কিন্তু আঘাত যাহাতে কম পাই সেজন্য যতদিন না বোম্বাই পৌছিতেছি ততদিন খবর না দেওয়াই বড় ভাই স্থির করিয়াছিলেন। আমার দুঃখ লইয়া আমি বেশী আলোচনা করিতে চাই না। কেবল এইমাত্র বলিতে চাই যে, পিতার মৃত্যুতে যত আঘাত পাইয়াছিলাম এই মৃত্যুতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আঘাত পাইলাম। আমার সকল আশা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কিন্তু আমার স্মরণ আছে যে, আমি মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া সোরগোল করিয়া কাঁদাকাটি করি নাই। চোখের জলও অনেকটা আটকাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলাম।

ডাক্তার মেহ্‌তা তাঁহার বাড়ীতে যাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু না লিখিলে চলে না। তাঁহার বড় ভাই রেবাশঙ্কর জগজীবনের সহিত জন্মের মত সম্বন্ধের গাঁট বাঁধা হইয়াছে। কিন্তু যাহার কথা বলিতে চাহিতেছি তিনি হইতেছেন কবি রায়চাঁদ বা রাজচন্দ। ডাক্তারের বড় ভাইয়ের ইনি জামাতা ছিলেন ও রেবাশঙ্কর জগজীবনের কারবারের অংশীদার ও হর্তাকর্তা ছিলেন। সে সময় তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসরের বেশী নয়। তাহা হইলেও তিনি যে চরিত্রবান ও জ্ঞানী ছিলেন তাহা প্রথম সাক্ষাতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহাকে শতাবধানী বলা হইত। শতাবধান শক্তি ডাঃ মেহ্‌তা আমাকে যাচাই করিয়া দেখিতে বলিলেন। আমি আমার বিদেশী ভাষা জ্ঞানের ভাণ্ডার খালি করিয়া নানা শব্দ বলিয়া গেলাম। প্রথম

হইতে শব্দগুলি যে অনুক্রমে আমি বলিয়া গিয়াছি ঠিক সেই অনুক্রমেই তিনি তাহাদের পুনরাবৃত্তি করিলেন। এই শক্তি দেখিয়া আমার হিংসা হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে আমি মুগ্ধ হই নাই। তাঁহার যে গুণ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহার পরিচয় পরে পাইয়াছিলাম। তাহা হইতেছে তাঁহার বহু বিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার শুদ্ধ চরিত্র ও তাঁহার আত্মদর্শন করার তীব্র ইচ্ছা। আমি পরে দেখিয়াছিলাম যে তিনি আত্মদর্শনের জন্যই জীবন ধারণ করিতেছেন:—

"হাসিতে খেলিতে প্রকট করি দেখিরে
আমার জীবন সফল তবে লেখিরে;
মুক্তানন্দ নাথ বিহারী রে—
রাখে জীবন ভোর আমারি রে।"

মুক্তানন্দের এই বচন তাঁহার মুখে ত ছিলই, তাঁহার হৃদয়-মধ্যেও অঙ্কিত ছিল।

নিজে হাজার হাজার টাকার ব্যবসা করিতেন, হীরা-মতি পরখ করিতেন, ব্যবসায়ের জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতেন। কিন্তু ইহা তাঁহার নিজস্ব বিষয় ছিল না, তাঁহার নিজের বিষয় ছিল তাঁহার পুরুষার্থ, তাঁহার আত্মদর্শন বা হরি-দর্শন। তাঁহার টেবিলের উপর আর কোনও দ্রব্য থাকুক আর নাই থাকুক, কোন না কোন ধর্ম্মপুস্তক অথবা তাঁহার ডায়েরী থাকিবেই। যখন ব্যবসার কথা শেষ হয় তখনই ধর্ম্মপুস্তক খোলেন, অথবা সেই লেখার খাতা খোলেন। তাঁহার লেখার যে সংগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই এই নোট বহি হইতে লওয়া। যে ব্যক্তি লক্ষ টাকার কেনা-বেচার কথা বলিয়া তখনই আত্মজ্ঞানের গূঢ় বাক্য লিখিতে বসিয়া যায়, সে ব্যক্তি ব্যবসাদারের জাতের নহে, সে

ব্যক্তি শুদ্ধ-জ্ঞানীর জাতের। তাঁহার এই প্রকার জাতের অনুভব আমার একবার নহে অনেকবার হইয়াছে। আমি কখনও তাঁহাকে শান্তি হইতে বিচ্যুত অবস্থায় দেখি নাই। আমার সহিত তাঁহার কোনও স্বার্থের সম্বন্ধ ছিল না, তবুও আমি তাঁহার সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশিয়াছিলাম। তখন আমি ভিখারী ব্যারিষ্টার। কিন্তু যখনই আমি তাঁহার দোকানে গিয়াছি তখনই আমার সহিত ধর্ম্ম-কথা ভিন্ন অন্য কথাই বলিতেন না। তখনও আমার চোখ খোলে নাই, এবং সাধারণতঃ ধর্ম্ম-কথায় যে আনন্দ হইত এমনও বলা যায় না, তথাপি রায়চন্দ্ ভাইয়ের ধর্ম্ম-কথায় আনন্দ পাইতাম। অনেক ধর্ম্মাচার্য্যের সংসর্গে আমি তাহার পর আসিয়াছি, প্রত্যেক ধর্ম্মের আচার্য্যদিগের সহিত মিশিতে প্রযত্ন করিয়াছি, কিন্তু রায়চন্দ ভাই আমার উপর যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন আর কেহ তেমন ছাপ রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার বাক্য আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিত। তাঁহার বুদ্ধিকে আমি যেমন সম্মান করিতাম, তাঁহার নৈতিক চরিত্রের উপরেও আমার তেমনি বিশ্বাস ছিল। আমি জানিতাম যে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে কখনো বিপথে চলিতে দিবেন না। নিজের মনের গুহ্য কথাও তিনি আমার কাছে ব্যক্ত করিবেন। এইজন্য আমার আধ্যাত্মিক অশান্তি উপস্থিত হইলেই আমি তাঁহার আশ্রয় লইতাম।

রায়চন্দ ভাই সম্বন্ধে আমার এত গভীর শ্রদ্ধা থাকিলেও তাঁহাকে আমি আমার ধর্ম্মগুরু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিতে পারি নাই। আমার সেই স্থান পূরণের সন্ধান আজও চলিতেছে।

হিন্দুধর্ম্ম 'গুরু'শব্দকে যে মহত্ব দান করিয়াছে তাহার প্রতি আমার আস্থা আছে। গুরু বিনা জ্ঞান হয় না এ বাক্য আমি অনেক অংশে

সত্য বলিয়া মনে করি। অপূর্ণ শিক্ষককে দিয়া পুঁথিগত জ্ঞান পাওয়ার কাজ চালাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু যে আত্মদর্শন করিতে চাহে তাহার সে কাজ অপূর্ণ শিক্ষক দ্বারা হয় না। গুরুর পদ কেবল পূর্ণ জ্ঞানীকেই দেওয়া যায়। গুরুর জন্য অনুসন্ধানের ভিতরেই সফলতা রহিয়াছে, কেননা শিষ্যের যোগ্যতা অনুযায়ীই গুরু মিলে। যোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক সাধকেরই সম্পূর্ণ প্রযত্ন করার অধিকার আছে। উহাতেই তাহার পুরস্কার রহিয়াছে। এই প্রযত্নের ফল ঈশ্বরের হাতে।

যদিও আমি রায়চন্দ ভাইকে হৃদয়ের সিংহাসনে গুরুর পদে অভিষিক্ত করিতে পারি নাই, তবুও তাঁহার সাহায্য বহু ক্ষেত্রে আমি গ্রহণ করিয়াছি। এই সব উপকারের পরিচয় পরে দিব। এখানে এই পর্য্যন্ত বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, আমার জীবনের উপর গভীর ছাপ আধুনিক জগতের তিনজন লোক অঙ্কিত করিয়াছেন। রায়চন্দ ভাই তাঁহার জীবন্ত সংসর্গ দ্বারা, টলষ্টয় তাঁহার "বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়ে" (Kingdom of God is within you) নামক পুস্তক দ্বারা ও রাস্কিন "অন টু দিস্ লাষ্ট" নামে পুস্তক দ্বারা আমাকে চমৎকৃত করিয়াছেন। এই সব প্রসঙ্গ উপযুক্ত স্থানে আলোচিত হইবে।

২

সংসার-প্রবেশ

বড় ভাই আমার উপর অনেক আশা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ধন মান ও পদের জন্য খুব লোভ ছিল। তাঁহার উদারতা এত বেশী ছিল যে, তাহা যেন তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া যাইত। এইজন্য এবং তাঁহার সরল মনের জন্য কাহারও সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব করিতে বাধিত না। তিনি মনে করিতেন—এই মিত্রবর্গের সাহায্যেই তিনি আমার জন্য মোকদ্দমা জোগাড় করিয়া দিবেন। আমি রোজগার যে খুব করিব তাহা তিনি পূর্ব্বেই ধরিয়া লইয়াছিলেন এবং সেইজন্য বাড়ীর খরচও খুব বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আমার জন্য ওকালতীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে তিনি আর কিছু বাকী রাখেন নাই।

জ্ঞাতিদিগের ঝগড়া উদ্যত হইয়াই ছিল। তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। এক পক্ষ আমাকে তৎক্ষণাৎ জাতিতে গ্রহণ করিলেন। অপর পক্ষ না লওয়ার দিকে দৃঢ় রহিলেন। যাঁহারা জাতিতে লওয়ার পক্ষ ছিলেন তাঁহাদের সন্তোষের জন্য ভাই আমাকে প্রথমেই নাসিকে লইয়া যান। সেইখানে আমি গঙ্গা-স্নান করি। তাহার পর রাজকোটে পঁহুছিয়া তাঁহাদিগকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়।

এই কার্য্যে আমি আনন্দ পাই নাই। আমার প্রতি বড় ভাইয়ের অগাধ প্রেম ছিল, আমার ভক্তিও তদনুরূপ ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছাই আমার কাছে তাঁহার

হুকুম ছিল। সেই হুকুম মানিয়া আমি যন্ত্রের মত, না বিচার করিয়া তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল কাজ করিয়াছিলাম। জাতের ব্যাপার ইহাতে মিটিল। যে তরফ হইতে আমি জাতিচ্যুত ছিলাম তাহাতে প্রবেশ করিতেও আমি কখনো চেষ্টা করি নাই, বা সেই দলের কোনও প্রধান ব্যক্তির প্রতি মনে মনে রোষও পোষণ করি নাই। যাঁহারা আমাকে দেখিতে পারিতেন না, তাঁহাদের সহিতও আমি নম্র ব্যবহার করিতাম। জাতি হইতে বহিষ্কার করার নিয়মকে আমি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার শ্বশুর শাশুড়ীর বাড়ীতে, কি আমার ভগ্নীর ওখানে, জল পর্য্যন্তও খাইতাম না। তাঁহারা লুকাইয়া আমার সহিত খাইতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু যে কাজ প্রকাশ্যভাবে করা যায় না তাহা লুকাইয়া করিতে আমার মন স্বীকার করিত না।

আমার এই প্রকার আচরণের পরিণাম হইয়াছিল এই যে, আমাকে জাতির দিক হইতে কোনও উপদ্রব কখনো সহ্য করিতে হয় নাই। কেবল তাহাই নয়, আজও যদিও আমি নিজেকে জাতির এক অংশ হইতে নিয়ম মত বহিষ্কৃত বলিয়াই মনে করি, তবুও তাঁহাদের দিক হইতে আমার প্রতি মান, উদারতা ও অনুকম্পার ভাব আছে। জাতির জন্য আমি কিছু করিব, আমার নিকট এরূপ কিছুই প্রত্যাশা না করিয়াও তাঁহারা আমার কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহাকে আমার অপ্রতিকার (Non-resistance)-নীতির শুভফল বলিয়াই আমি গণ্য করি। যদি আমি জাতিতে প্রবেশ করার জন্য হাঙ্গামা করিতাম, যদি আরও দলাদলি বাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম, যদি আমি

তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিতাম, তাহা হইলে তাঁহারাও নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধতা করিতেন এবং আমি বিলাত হইতে আসার পর উদাসীন ও অলিপ্ত থাকার পরিবর্তে জাতির গোলমালের মধ্যে পড়িয়া আমি কেবল মিথ্যাচরণ পোষণ করাইবার হেতু হইতাম।

স্ত্রীর সহিত আমার মনোমত সম্বন্ধ তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিলাত যাওয়াতেও তাঁহার প্রতি আমার সন্দেহের ভাব দূর হইল না। সকল কাজেই খুঁতখুঁতে ভাব ও সংশয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলাম। সুতরাং আমার মনের ইচ্ছাও পূরণ করিতে পারিলাম না। পত্নীর বহি-পড়া-বিদ্যা হওয়া চাই এবং তাহা শিখাইব বলিয়া স্থির করিলাম। কিন্তু আমার ভোগ-লিপ্সা আমাকে সেকাজে বাধা দিল। পড়াইতে না পারার জন্য যে দোষ তাহা আমার—অথচ সে দোষের দায়িত্ব নিক্ষেপ করিলাম আমি স্ত্রীর উপরেই। এক সময় এমনও হইয়াছিল—আমি তাঁহাকে তাঁহার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহার পর তাঁহার দুঃখ একেবারে চরমে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিতে দেই নাই। এই সকলই যে আমার দোষ, পরে তাহা আমার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধেও সংস্কার করিতে মনস্থ করি। বড়ভাইএর এক ছেলে ছিল, আমার যে ছেলেটিকে রাখিয়া আমি বিলাতে গিয়াছিলাম সে এখন প্রায় চার বৎসরের। স্থির করিলাম—এই ছেলেদিগকে দিয়া ব্যায়াম করাইব, তাহাদিগকে শক্ত করিব ও তাহাদিগকে আমার সঙ্গ দান করিব। ইহাতে আমার ভাইএর সহানুভূতি ছিল। আমার আশা অল্প-বিস্তর সফলও করিতে পারিয়াছিলাম। ছেলেদের সঙ্গ আমার কাছে ভারি ভাল লাগিত এবং তাহাদের সহিত

খেলা করার অভ্যাস আজও রহিয়া গিয়াছে। তখন হইতেই আমি জানিয়াছি যে, ছেলেদের শিক্ষকের কাজ আমি ভালই করিতে পারি।

খাদ্য-সংস্কার করাও একান্ত দরকার। কিন্তু ইহাতে সঙ্কট ছিল। বাড়ীতে চা, কফি ঢুকিয়াছিল। বিলাত-ফেরৎ হইয়া আসার পূর্ব্বেই বাড়ীতে কতকটা বিলাতী হাওয়া প্রবেশ করানো দরকার বলিয়া বড়ভাই স্থির করিয়াছিলেন। সেইজন্য চীনামাটির বাসন, চা ইত্যাদি বস্তু যাহা কেবল ঔষধাদির প্রয়োজনে, অথবা সংস্কার-প্রাপ্ত অতিথির জন্য রাখা হইত, তাহা সকলের জন্য ব্যবহার হইতেছিল। এই আবেষ্টনের মধ্যে আমি আমার 'সংস্কার' লইয়া আসিলাম।

ওট্-মিল পরিজ (জাউ) প্রবেশ করানো হইল, চা কফির সহিত কোকো যোগ দিল। জুতা মোজা ত ঘরে ছিলই, আমি তাহার উপর কোট পাতলুন দ্বারা বাড়ীর পরিবর্ত্তন করিলাম।

ইহাতে খরচ বাড়িল। নূতনত্ব বাড়িল। ঘরে শ্বেত হস্তী বাঁধা হইল। কিন্তু খরচ আসে কোথা হইতে? রাজকোটে ব্যবসা (প্রাক্‌টিস) আরম্ভ করার কথায় ত হাসি পায়। রাজকোটের পাস করা উকীলের সমান জ্ঞান ছিল না, কিন্তু ফী তাহার দশগুণ চাই! কোন্ মূর্খ মক্কেল আমাকে নিযুক্ত করিবে? আর যদি এই প্রকারের মূর্খও জোটে তবে আমিই কি আমার অজ্ঞতার সহিত ঔদ্ধত্য ও প্রতারণা যোগ করিয়া জগতের নিকট আমার ঋণ আরও বাড়াইব?

মিত্রবর্গ পরামর্শ দিলেন যে, আমার কিছুদিন বোম্বাই গিয়া হাই-কোর্টের অভিজ্ঞতা পাওয়া দরকার। সেখানে গেলে ভারতবর্ষের আইনের জ্ঞানও পাওয়া যাইবে, আর মোকদ্দমা পাওয়ার চেষ্টাও করা চলিবে। আমি বোম্বাই রওনা হইলাম।

ঘর বাঁধিলাম। পাচক রাখিলাম—সেও আমারই মত পারদর্শী। জাতিতে সে ব্রাহ্মণ ছিল। আমি তাহাকে চাকরের মত না রাখিয়া বাড়ীর পরিজনের মতই রাখিয়াছিলাম। এই বামুন স্নান করিতে জল ঢালিত কিন্তু গা ধুইত না—ধুতিগুলি ময়লা, পৈতা ময়লা, শাস্ত্রের জ্ঞান ছিল না। আর ইহা অপেক্ষা ভাল পাচকই বা পাইব কোথায়?

"কেমন, রবিশঙ্কর (নাম ছিল রবিশঙ্কর), রসুই না হয় নাই জানিলে কিন্তু সন্ধ্যাদি কি রকম?"

"সন্ধ্যা, ভাই সাহেব? 'সন্ধ্যা তর্পণ ক্ষেতী চাষ, কোদালে মোর নিত্য কাম'—আমি এই রকম বামুন। তোমাদের কৃপায় বাঁচিয়া আছি। আর তা না হয়ত চাষ ত আছেই।"

আমি বুঝিলাম, আমাকে রবিশঙ্করের শিক্ষক হইতে হইবে। অর্দ্ধেক রবিশঙ্কর রাঁধে অর্দ্ধেক আমি। বিলাতের নিরামিষ আহারের পরীক্ষা এইখানে চালাইতে লাগিলাম। একটা ষ্টোভ খরিদ করিলাম। আমি নিজে পংক্তি-ভেদ মানিতাম না, রবিশঙ্করেরও সেদিকে আগ্রহ ছিল না। এই জন্য আমাদের মিল বেশ হইল। কেবল একটা মুস্কিল ছিল, রবিশঙ্কর নিজে ময়লা থাকিত ও খাদ্য অপরিচ্ছন্ন করিবার প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করিয়াছিল!

আমার চার পাঁচ মাসের বেশী বোম্বাই থাকা হয় নাই, কেননা খরচা বাড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু আয় ছিল না।

এইরূপে আমার সংসার-প্রবেশ সুরু হইল। ব্যারিষ্টারী আমার কাছে খারাপ লাগিল—বহু আড়ম্বর, অল্প জ্ঞান। দায়িত্ব-জ্ঞান আমাকে পীড়া দিতে লাগিল।

৩

প্রথম মোকদ্দমা

বোম্বাইয়ে এক দিক দিয়া যেমন আইন অভ্যাস করিতে লাগিলাম, অন্যদিক দিয়া তেমনি আহারের উপর পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইহাতে আমার সহিত বীরচন্দ গান্ধী যোগ দিলেন। তৃতীয় দিক দিয়া আমার জন্য ভাই কেস্ যোগাড় করিয়া দেওয়ার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

আইন পড়ার কাজ ঢিলা ভাবে চলিতেছিল। "সিভিল প্রসিজোর কোড" আমার ভাল লাগিত না। সাক্ষ্যের আইন আমার কাছে ভাল লাগিত। বীরচন্দ গান্ধী সলিসিটর হওয়ার জন্য তৈরী হইতেছিল। সে উকীলদের অনেক গল্প করিত। সার ফিরোজশার শক্তির মূলে ছিল তাঁহার আইনের অগাধ জ্ঞান। তাঁহার 'এভিডেন্স অ্যাক্ট' ত মুখস্থ। বত্রিশ-ধারার সমস্ত কেস্ তাঁহার জানা আছে। বদরুদ্দীনের সওয়াল-জবাব এমন যে জজও ভয় পায়। তাঁহার যুক্তি-করার শক্তি অদ্ভুত। যতই এই সকল মহারথাদের কথা শুনিতাম ততই আমার ভয় হইত।

তিনি বলিতেন,—"পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া হাইকোর্টে ভেরেণ্ডা ভাজা নূতন কিছু নয়। সেইজন্যই ত আমি সলিসিটর হওয়া ঠিক করিয়াছি। বৎসর তিনেক পরেও যদি আপনি খরচ চালাইবার মত উপার্জ্জন করিতে পারেন তবেই ঢের বলা যায়।"

প্রতি মাসেই খরচ বাড়িতে লাগিল। বাড়ীর বাহিরে ব্যারিষ্টারের নামের প্লেট আঁটিয়া রাখা, আর ভিতরে ব্যারিষ্টারীর জন্য তৈরী হওয়া—ইহা আমি বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলাম না। সেইজন্য

আমার পড়াও চঞ্চল-চিত্তে চলিতেছিল। সাক্ষ্য আইনে আমি কিছু রস-বোধ করিতেছিলাম বলিয়াছি। 'মেইনের হিন্দু ল' খুব আগ্রহের সহিত পড়িলাম। কিন্তু কেস্ চালাইবার সাহস আসিল না। আমার দুঃখের কথা কাহাকে বলিব? শ্বশুর বাড়ীর নূতন বধূর মত আমার অবস্থা হইয়াছিল।

এই অবস্থায় মমী-বাঈএর মামলা আমার হাতে আসিল। আমাকে বলা হইল—"'স্মল কজ কোর্টে' যাইতে হইবে—দালালকে কমিশন দিতে হইবে।" আমি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিলাম।

"কিন্তু ফৌজদারী কোর্টের পুরানো উকীল......মাসে তিন চার হাজার টাকা রোজগার করেন, তিনিও কমিশন দেন।"

"আমাকেও কি তাঁহার মতই হইতে হইবে? আমার মাসে ৩০০৲ টাকা পাইলেই যথেষ্ট। বাবা কি আর বেশী রোজগার করিতেন?"

"সে দিন ত আর নাই। বোম্বাইয়ের খরচ অনেক, সে কথা বুঝিয়া চলা চাই।"

আমি টলিলাম না। কমিশন দিলাম না। তবু মমী-বাঈএর কেস্ পাওয়া গেল। কেস্ সোজা ছিল। আমি ৩০৲ ব্রীফ্ পাইলাম। এক দিনের বেশী কেস্ চলার কথা নয়।

'স্মল কজ কোর্টে' প্রবেশ করিলাম। আমি প্রতিবাদীর তরফ হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। সেইজন্য আমাকে জেরা করিতে হইল। আমি ত উঠিলাম, কিন্তু গা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল যেন কোর্ট ঘুরিতেছে। প্রশ্ন করার মত বোধ-শক্তি রহিল না। জজ হাসিয়া থাকিবেন, উকীলেরা অবশ্যই হাসিয়া লুটাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি কি কিছু চোখে দেখিতেছিলাম?

আমি বসিয়া পড়িলাম, দালালকে বলিলাম যে, আমি এ মামলা চালাইতে পারিব না, পাটেলকে নিযুক্ত কর—আমাকে যে ফী দিয়াছ তাহা ফেরত লও। পাটেলকে সেদিনের জন্য একান্ন টাকায় নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার কাছে এ মামলা খেলার সামিল।

আমি ফিরিলাম। মক্কেল জিতিল কি হারিল তাহা জানি নাই। আমার লজ্জা হইল। পুরা সাহস না আসা পর্য্যন্ত কেস্ না লওয়া স্থির করিলাম এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় না যাওয়া পর্য্যন্ত আর কেস্ লই নাই। ইহা স্থির করায় আমার কোন বাহাদুরী ছিল না। হারার জন্য কে আমাকে কেস্ দেওয়ার মত বোকামি করিবে? আমি স্থির না করিলেও, কোর্টে যাওয়ার ক্লেশ কেহ আমাকে দিত না।

তবে আর একটা কেস্ বোম্বাইতে পাইয়াছিলাম বটে। এই কেস্ ছিল দরখাস্ত করার। এক গরীব মুসলমানের জমি পোরবন্দরে সরকার খাস করিয়া লইয়াছিল। আমার পিতার নাম শুনিয়া এই দরিদ্র লোকটি তাঁহার ব্যারিষ্টার ছেলের কাছে আসিয়াছে। তাহার কেস্ আমার নিকট কম-জোরী বলিয়া মনে হইল। কিন্তু আরজী লিখিয়া দিতে স্বীকার করিলাম। মিত্রবর্গকে শুনাইলাম। সে আরজী তাঁহারা পছন্দ করিলেন। আমার মনে বিশ্বাস হইল যে, আরজী লেখার মত যোগ্যতা আমার আছে,—সত্যই তাহা আছেও।

আমার কাজ বাড়িল। বিনা পয়সায় আরজী লেখার ব্যবসা করিলে আরজী লিখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহাতে ত দিন চলে না।

আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমি শিক্ষকের কাজ করিতে পারি ইংরাজী ভালই জানা আছে। যদি কোন স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে ইংরাজী পড়াইতে হয় তবে তাহা করিব। কিছু খরচ ত উঠিবে!

আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পড়িলাম, "চাই ইংরাজী শিক্ষক। প্রতিদিন এক ঘণ্টা। বেতন ৭৫৲ টাকা।" বিজ্ঞাপনটি একটি খ্যাত-নামা হাইস্কুলের দেওয়া। আমি আবেদন করিলাম। দেখা করিতে আহ্বান আসিল। আমি আশা করিয়াই দেখা করিতে গেলাম। কিন্তু যখন অধ্যক্ষ জানিলেন যে, আমি বি, এ নই তখন দুঃখিত হইয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

"কিন্তু আমি লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছি। আমার দ্বিতীয় ভাষা ল্যাটিন।"

"তাহা সত্য, কিন্তু আমার যে গ্রাজুয়েটই চাই।"

আমি নিরুপায়। নিরাশায় হাত কচলাইতে লাগিলাম। বড়ভাইও চিন্তায় পড়িলেন। আমরা দুইজনেই ঠিক করিলাম যে, বোম্বাইতে আর কালযাপন করা নিরর্থক। আমার রাজকোট যাওয়াই স্থির হইল। তিনি নিজে ছোট উকীল ছিলেন, আমাকে কিছু কিছু ছোট আরজী করার কাজ ত দিতে পারিবেন। রাজকোটের বাড়ীর খরচা ছিলই; সুতরাং বোম্বাইয়ের খরচ বন্ধ হইলে ভারও অনেকটা লাঘব হইবে। এ প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল। মাস ছয় বাস করার পর বোম্বাইয়ের বাড়ী উঠাইয়া দিলাম।

বোম্বাই থাকা কালে রোজ হাইকোর্টে যাইতাম। সেখানে কিছু শিখিয়াছিলাম একথা বলিতে পারি না। শিখিবার জন্য যেটুকু জ্ঞান আবশ্যক তাহাও ছিল না। কত সময় ত কেস্ না পারিতাম বুঝিতে—না ইচ্ছা হইত শুনিতে, সেখানে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতাম। আমার মত অপরকেও ঝিমাইতে দেখিয়া আমার লজ্জার বোঝা কমিত। অবশেষে এরূপও মনে হইত যে, হাইকোর্টে বসিয়া বসিয়া ঝিমোনোও

একটা ফ্যাসান। উহাতে যে লজ্জা আছে সে বোধও চলিয়া গিয়াছিল।

আজকার দিনে যদি আমার মত বেকার ব্যারিষ্টার বোম্বাই কোর্টে কেহ থাকে তবে তাহাদের জন্য ছোটখাট একটা অভিজ্ঞতার কথা এখানে লিখিব।

বাড়ী ছিল গীরগামে তবুও আমি কখন গাড়ীভাড়া খরচ করি নাই। ট্রামেও কদাচিৎ উঠিয়াছি। গীরগাম হইতে অধিকাংশ সময়েই নিয়ম মত হাঁটিয়া যাইতাম। তাহাতে পুরা ৪৫ মিনিট লাগিত। বাড়ীতে ফিরিতেও হাঁটিয়াই ফিরিতাম। রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করার শক্তি লাভ করিয়াছিলাম। ইহাতে অনেক পয়সা বাঁচাইয়াছি। বোম্বাইতে আমাদের সঙ্গীদের অসুখ হইলেও আমি কখনো অসুস্থ হইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পরে যখন রোজগার করিতেছিলাম তখনও এই অফিসে হাঁটিয়া যাওয়ার অভ্যাস শেষ পর্য্যন্ত ঠিক রাখিয়াছিলাম। তাহার সুফল আজও ভোগ করিতেছি।

৪

প্রথম আঘাত

বোম্বাইএ নিরাশ হইয়া রাজকোটে গেলাম। ভিন্ন অফিস খুলিলাম। কোনও রকমে চলিতে লাগিল। আর্‌জী লেখার কাজ পাইতে লাগিলাম এবং মাসে গড়ে তিনশত টাকা আসিতে লাগিল। এই আর্‌জীর কার্য্য আমার শক্তি-বশতঃ পাই নাই—উহার মূলে ছিল খাতির। উকীল-ভাইএর অংশীদারের ওকালতী জমিয়া গিয়াছিল। যে সব বড়রকমের আর্‌জী তাঁহার কাছে তৈরী হইতে আসিত, অথবা যে সকল আর্‌জী তিনি গুরুতর মনে করিতেন, সেগুলি তিনি কোনও বড় ব্যারিষ্টারকে পাঠাইয়া দিতেন। কেবল তাঁহার গরীব মক্কেলের আরজী লেখার কাজই আমি পাইতাম।

কমিশন না দেওয়ার যে সঙ্কল্প বোম্বাইএ পালন করিয়াছি এখানে তাহা ভাঙ্গিয়াছি বলা যায়। ব্যাপারটা ছিল এই রকমের—বোম্বাইতে আমার কেবল দালালকে পয়সা দেওয়ার কথা হইয়াছিল, এখানে দিতে হইত উকীলকে। বোম্বাইয়ের মত এখানেও সকল ব্যারিষ্টারই প্রকাশ্য ভাবে এই প্রকার টাকা উকীলকে দিয়া থাকেন বলিয়া আমাকে জানানো হইল। আমার ভাইএর যুক্তির বিরুদ্ধে অন্য কোন যুক্তি দেখাইবার শক্তি আমার ছিল না। তিনি বলিলেন—"তুমি দেখিতেছ আমি অন্য এক উকীলের অংশীদার। আমার কাছে যে মামলা আসে তাহার যেগুলি তোমাকে দিই তাহার মধ্যে আমার ভাগ ত থাকিয়াই যায়, কিন্তু যদি তুমি আমার ভাগীদারের অংশ তাহাকে না দাও তবে তাহা

আমার অবস্থাকেই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলে। এক সাথে থাকি বলিয়া তোমার ফীর অংশ তোমার আমার যুক্ত-ভাণ্ডারেই প্রবেশ করে—তাহা আমার পাওয়া হইয়া যায়, কিন্তু আমার অংশীদারের কথা একবার ভাবিয়া দেখ। তিনি যদি কেস্ অন্যত্র দিতেন তবে তাঁহার কমিশনের ভাগ ত তিনি পাইতেনই।" এই যুক্তিতে আমি ভুলিলাম। মনে হইল যে, যদি আমাকে ব্যারিষ্টারী করিতে হয় তবে এই সকল কেসে কমিশন না দেওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইবে। এই যুক্তিতে মনকে বুঝাইলাম, অথবা স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়—মনকে ঠকাইলাম। ইহা ছাড়া অন্য কোনও কেসে আমি কমিশন দিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না।

যদিও আমার আর্থিক অভাব একরকম মিটিয়া যাইতেছিল, তবুও জীবনের প্রথম আঘাত এই সময়েই পাই। ব্রিটিশ্-অফিসার কি পদার্থ তাহা কানে শুনিয়াছি। সাম্‌না-সাম্‌নি এইবার দেখা হইল।

পোরবন্দরের রাণা-সাহেবের গদি পাওয়ার পূর্ব্বে আমার ভাই তাঁহার মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। সেই সময় তিনি রাণাসাহেবকে খারাপ পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর অভিযোগ আনা হয়। এই সংবাদ পলিটিকাল এজেণ্টের কাছে গিয়াছিল ও তিনি ভাইএর উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। এই কর্ম্মচারীটিকে আমি বিলাতে জানিতাম। তাঁহার সহিত খানিকটা বন্ধুত্বও হইয়াছিল—একথা বলা যায়। ভাই ভাবিলেন যে, এই পরিচয়ের সুবিধা লইয়া আমি পলিটিকাল এজেণ্টকে যদি দু'কথা বলি, তবে হয়ত তাঁহার উপর হইতে এজেণ্টের বিরুদ্ধভাব চলিয়া যায়। কথাটি আমার এতটুকুও পছন্দ হয় নাই। বিলাতের এই পরিচয়টুকুর সুবিধা লওয়াও উচিত নয় বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

যদি আমার ভাই কোন দোষের কাজ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার হইয়া বলা কেন? আর যদি অন্যায় না করিয়া থাকেন, তবে নিয়মমত আর্জী করিবেন অথবা নিজের নির্দ্দোষিতার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবেন। এই যুক্তি ভাইএর পছন্দ হইল না। তিনি বলিলেন—"তুমি কাথিয়াওয়াড়ের ব্যাপার জান না, পৃথিবীকে চিনিতে এখনও তোমার দেরী আছে। এখানে খাতিরই সবচেয়ে বড় জিনিষ। তোমার একটা কথায় যদি কাজ হয় তবে ভাই হইয়া তাহা অস্বীকার করা ভাল না।"

ভাইএর কথা আমি ফেলিতে পারিলাম না। সুতরাং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে কাজ করিতে হইল। কর্ম্মচারীটির নিকট যাওয়ার আমার কোনও অধিকার ছিল না। যাওয়াতে যে আমার আত্ম-সম্মান নষ্ট করা হয় তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। তথাপি আমি দেখা করার জন্য সময় চাহিলাম এবং তিনি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে দেখা করিতে গেলাম। পুরাতন পরিচয়ের কথা বলিলাম। কিন্তু আমি তখনই দেখিলাম যে, বিলাতে ও কাথিয়াওয়াড়ে প্রভেদ আছে। সরকারী আমলা যখন নিজ আসনে বসিয়া থাকে, আর যখন সে ছুটিতে দেশে বসিয়া থাকে—এ দুইয়ের মধ্যে ঢের প্রভেদ। আমলাটি পরিচয় স্বীকার করিলেন, কিন্তু এই পরিচয় স্বীকারের সঙ্গেই তিনি খুব কঠিন হইয়াও উঠিলেন। তাঁহার কাঠিন্য, তাঁহার চোখের দৃষ্টি যেন আমাকে এই কথা বলিল—"সেই পরিচয়ের সুবিধা লইতে আসিয়াছ—তাই নয় কি?" বুঝিয়াও আমার কাহিনী তুলিলাম। সাহেব অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"আপনার ভাই চক্রান্তকারী। আপনার কাছে বেশী কথা শুনিতে

চাই না। সে সময় আমার নাই। আপনার ভাইএর যাহা কিছু বলার আছে তাহা যেন নিয়মমত আর্জীতে লিখিয়া জানান।" এই উত্তরই যথেষ্ট ছিল—যথার্থ ছিল। কিন্তু গরজ থাকিলে কি জ্ঞান থাকে? আমি নিজের কথাই চালাইতে লাগিলাম। সাহেব উঠিয়া বলিলেন—"আপনি এখন যান।"

আমি বলিলাম—"তা আমার কথাটা পুরাপুরি শুনুন।"

সাহেব জ্বলিয়া উঠিলেন—"চাপ্‌রাশী! ইহাকে দরজা দেখাও।"

'হজুর'—বলিয়া চাপ্‌রাশী দৌড়াইয়া আসিল। আমি তখনও কতক অনিশ্চিত-ভাবে ছিলাম। পেয়াদা আমার হাত ধরিল ও দরজার বাহির করিয়া দিল।

সাহেব গেল। পেয়াদা গেল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া—ক্রোধে আগুন হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়াই চিঠি দিলাম—"আপনি আমাকে অপমান করিয়াছেন, পেয়াদা দিয়া আমার উপর জবরদস্তি করিয়াছেন। আপনি মাফ না চাহিলে, আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করিব।" অল্পক্ষণ পরেই সাহেবের সোওয়ার্ জবাব দিয়া গেল।

"আপনি আমার সহিত অসভ্য আচরণ করিয়াছেন। আপনাকে চলিয়া যাইতে বলিলেও যান নাই, সেইজন্য আমি আপনাকে দরজা দেখাইতে চাপরাশীকে বলি, তাহার পরেও আপনি অফিস ত্যাগ না করাতে সে আপনাকে বাহির করার জন্য যতটুকু বল দরকার তাহাই প্রয়োগ করিয়াছে। আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।"—জবাবের মর্ম্ম এই রকম ছিল।

এই জবাব পকেটে লইয়া মাথা নীচু করিয়া বাড়ী আসিলাম। ভাইকে সকল কথা বলিলাম। তিনি দুঃখিত হইলেন। কিন্তু

তিনি আমাকে কি সান্ত্বনা দিবেন? উকীল-বন্ধুদের সহিত তিনি কথা বলিলেন। কেস্ করিতেই কি আমি জানি? এই সময় সার ফিরোজশা মেহ্‌তা কোনও মোকদ্দমায় রাজকোটে আসিয়াছিলেন। আমার মত নূতন ব্যারিষ্টার তাহার সহিত কেমন করিয়া দেখা করিবে? তবে তাঁহাকে যে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার হাত দিয়া পত্র পাঠাইয়া দিই ও পরামর্শ চাই। তিনি বলিলেন—"গান্ধীকে বলিবেন, এ প্রকার ঘটনা সকল উকীল ব্যারিষ্টারের অভিজ্ঞতাতেই আসে। তাহার রক্ত গরম, সে বিলাত হইতে নূতন আসিয়াছে। সে ব্রিটিশ কর্ম্মচারীকে চিনে না। যদি সুখে বাস করিতে চায় ও দু'পয়সা রোজগার করিতে চায়, তবে সে চিঠি সে যেন ছিঁড়িয়া ফেলে ও অপমান সহ্য করে। নালিশ করিলে ফল কিছুই হইবে না—উল্টা নষ্ট পাইবে। জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার এখনো অর্জ্জন করা হয় নাই।"

এই উপদেশ আমার নিকট বিষের ন্যায় তিক্ত লাগিল। তবু সেই তিক্ত ঔষধই গিলিতে হইল। এই অপমান ভুলিতে পারিলাম না। তবে তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। স্থির করিলাম—এরূপ অবস্থায় আর কখনো পড়িব না, কাহারও সুপারিস করিব না। এই নিয়ম কখনো ভঙ্গ করি নাই। এই আঘাত আমার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিল।

৫

দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য প্রস্তুত

সরকারী আমলার নিকট আমার যাওয়া যে অন্যায় হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমলার অধীরতা, তাঁহার রোষ, তাঁহার ঔদ্ধত্যের সম্মুখে আমার দোষ ছোট হইয়া যায়। আমার দোষের সাজা ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া নয়। আমি তাঁহার নিকট পাঁচ মিনিটও বসি নাই। আমার কথাই তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইয়াছিল—তিনি আমাকে ভদ্রতার সঙ্গেও যাইতে বলিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার নেশায় তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। পরে জানিয়াছিলাম যে, এই আমলাটির ধৈর্য্য বলিয়া কোনও বস্তু নাই। তাঁহার নিকট যে যায় তাহাকে অপমান করা তাঁহার পক্ষে সাধারণ ঘটনা। তাঁহার ভাল লাগে না—এমন কথা যদি কেহ বলে, তবেই সাহেবের মেজাজ বিগড়াইয়া যায়।

আমার সকল কাজই তাঁহার কোর্টে হয়। খোসামোদ করা আমার দ্বারা অসম্ভব। তাঁহাকে অযোগ্য উপায়ে খুশী করিবার প্রবৃত্তিও আমার নাই। তাঁহার উপর নালিশের ধম্‌কি দিয়া নালিশ না করা ও তাঁহাকে কিছু না বলাও আমার ভাল লাগিল না।

ইতিমধ্যে আমার কাথিয়াওয়াড়ের চক্রান্ত সম্বন্ধেও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হইল। কাথিয়াওয়াড় অনেক ছোট ছোট রাজ্যের মুল্লুক। এখানে রাজনৈতিকের ভিড় রহিয়াছে। রাজ্যে রাজ্যে এখানে ছোট

খাট চক্রান্ত—পদ পাওয়ার জন্য চক্রান্ত। রাজাদের কান অত্যন্ত পাত্‌লা—রাজারা পরবশ। এখানে সাহেবের চাপ্‌রাশীরও খোসামোদ করিতে হয়। সেরেস্তাদার এখানে সাহেবেরও বাড়া, কেননা তাহারাই সাহেবের চোখ, তাহার কান, তাহার দো-ভাষী। তাহারা যাহা ধার্য্য করিবে তাহাই আইন। সেরেস্তাদারের ইচ্ছা সাহেবের ইচ্ছা অপেক্ষা বড় বলিয়া গণ্য। ইহাতে অতিশয়োক্তি থাকিতে পারে সত্য। কিন্তু সেরেস্তাদারের অল্প বেতনের তুলনায় তাহারা ব্যয় করিত ঢের বেশী।

এই বায়ুমণ্ডল আমার নিকট বিষের মত লাগিল। আমি কি করিয়া নিজের স্বাধীনতা রাখিব—তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

আমি একেবারে মন-মরা হইয়া গেলাম। বড় ভাই আমার উদাসীনতা লক্ষ্য করিলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বুঝিলেন—আমি কোথাও চাকুরী লইয়া বসিয়া যাইতে পারিলেই ভাল হয়। আমার এই চক্রান্ত হইতে মুক্ত হওয়া দরকার—কিন্তু চক্রান্ত না করিলে মন্ত্রীর কাজ কি জজের কাজই বা কি করিয়া মিলিতে পারে? ওকালতী ব্যবসায়ে ত সাহেবের সহিত ঝগড়াই একটা অন্তরায়-স্বরূপ হইল।

পোরবন্দর এড্‌মিনিষ্ট্রেটরের অধীন ছিল। সেইখানে রাজা সাহেবের জন্য কতকগুলি অধিকার পাওয়ার কার্য্য হাতে লইয়াছিলাম। ওখানকার 'মের' লোকদের নিকট হইতে বড় বেশী খাজনা লওয়া হইত। সেজন্যও সেখানে আমার এডমিনিষ্ট্রেটরের সহিত দেখা করিতে হইয়াছিল। এড্‌মিনিষ্ট্রেটর দেশী লোক হইলেও তাঁহার ব্যবহার সাহেবের অপেক্ষাও বেশী রূঢ়। তাঁহার কার্য্য-দক্ষতা ছিল। কিন্তু তাঁহার দক্ষতায় রায়ত্‌দের বিশেষ কোনই সুবিধা হইল না। রাণা-সাহেব সামান্য অধিকার পাইলেন। কিন্তু 'মের' লোকেরা কিছুই পাইল না

বলা যায়। তাহাদের কেস্ ভাল করিয়া খোঁজ করা হইয়াছে বলিয়াও আমার মনে হইল না।

অর্থাৎ এই কাজেও আমি নিরাশ হইলাম। আমার বোধ হইল যে ন্যায়বিচার পাওয়া গেল না। ন্যায়বিচার পাওয়ার এক উপায় ছিল —বড় সাহেবের নিকট আপিল করা। কিন্তু এ সব ব্যাপারে তিনি সাধারণতঃ এই জবাবই দিতেন—"আমি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অপারগ।" এই প্রকার নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে কোনও আইন কানুনের প্রয়োগ থাকিলে কিছু আশা করা যায়। কিন্তু এখানে সাহেবের মর্জিই আইন।

মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ভাইএর নিকট পোরবন্দরের এক মেমানের পত্রে এই প্রস্তাব আসিল—"আমাদের কারবার দক্ষিণ আফ্রিকায়। কারবার খুব বড়। কোর্টে আমাদের এক বড় মামলা চলিতেছে। দাবী চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের। কেস্ অনেকদিন হইতেই চলিতেছে। আমরা বড় উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছি। আপনার ভাইকে যদি পাঠাইয়া দেন তবে তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন, তাঁহারও সাহায্য হইবে। তিনি আমাদের কেস্ আমাদের উকীলকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিবেন। তাহা ছাড়া তিনি নূতন দেশ ও নূতন লোকের সঙ্গেও পরিচয় করিতে পারিবেন।"

প্রস্তাবটি লইয়া ভাই আমার সহিত আলোচনা করিলেন। উহার অর্থ পরিস্কার বুঝিতে পারিলাম না। আমার কেবল উকীলকে বুঝাইতে হইবে না, কোর্টের কাজও করিতে হইবে তাহা জানা গেল না। কিন্তু আমার লোভ হইল।

দাদা আবদুল্লার অংশীদার স্বর্গগত শেঠ আবদুল করিম ঝভেরীর

সহিত ভাই আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। শেঠ বলিলেন—"আপনার বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না। আমাদের বড় বড় গোরাদের সহিত মিত্রতা আছে। তাহাদের সহিত আপনি পরিচয় করিবেন। আমাদের দোকানেরও আপনি সাহায্য করিতে পারিবেন। আমাদের ইংরাজীতে পত্র ব্যবহার অনেক আছে, ইহাতেও আপনি সাহায্য করিতে পারিবেন। আমাদের বাংলাতেই আপনি থাকিবেন। সুতরাং সেজন্যও আপনার কোনও খরচাই নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কত দিনের জন্য আমাকে চাকুরীতে রাখিতে চাহেন ? আপনারা আমাকে কি বেতন দিবেন ?

"আপনার কাজ এক বৎসরের বেশী লাগিবে না। আপনাকে ফার্ষ্ট-ক্লাশে যাতায়াতের ভাড়া ও থাকার সমস্ত খরচ ছাড়া ১০৫ পাউণ্ড দিব।"

ইহাকে ওকালাতী বলে না। ইহা চাকুরী মাত্র। কিন্তু যেমন করিয়া হউক আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে চাই। নূতন দেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে ও অভিজ্ঞতা লাভ হইবে—ইহা অন্য কথা। ১০৫ পাউণ্ড ভাইকে পাঠাইব, তাহাতে বাড়ীর খরচার কিছু সাহায্য হইবে। এই প্রকার বিচার করিয়া বেতন সম্বন্ধে ঝকাঝকি না করিয়া শেঠ আবদুল করিমের অভিপ্রায় বজায় রাখিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবার জন্য তৈরী হইলাম।

৬

নাতাল পঁহুছান

বিলাত যাওয়ার সময় বিচ্ছেদের যে দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম দক্ষিণ-আফ্রিকা যাইতে তাহা অনুভব করিলাম না। মা ত চলিয়াই গিয়াছেন।—পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইবার অভিজ্ঞতাও হইয়াছিল। রাজকোট ও বোম্বাইএর মধ্যে যাতায়াত হইতেছিল। এইবার পত্নীর সহিত বিচ্ছেদের জন্যই যাহা কিছু দুঃখ। বিলাত হইতে আসার পর আর একটি পুত্র হইয়াছে। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে ভোগের স্থান ছিলই। তাহা হইলেও তাহাতে নির্ম্মলতা আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিলাত হইতে আসার পর আমরা খুব কমই একত্র থাকিয়াছি। যতটা পারি তাঁহার শিক্ষকতা করিয়াছি এবং তাঁহার ভিতর-কার কতকগুলি দোষেরও সংস্কার করিয়াছি। আরও সংস্কারের জন্য আমাদের একত্র থাকার আবশ্যকতা আমরা উভয়েই বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু আফ্রিকা আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল। তাই তাঁহার বিচ্ছেদও অসহ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এক বৎসর পরে ত আমাদের দেখা হইবেই—এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া আমি রাজকোট ত্যাগ করিয়া বোম্বাই পঁহুছিলাম।

দাদা আবদুল্লার বোম্বাই-এজেন্ট আমার টিকিট কিনিয়া দিবেন। কিন্তু ষ্টীমারে কেবিন খালি পাওয়া গেল না! যদি এখন না যাইতে পারি তবে একমাস আমাকে বোম্বাইএ বৃথা বসিয়া থাকিতে হয়। এজেন্ট বলিলেন—"আমি ত অনেক চেষ্টা করিয়াও টিকিট কিনিতে পারিলাম না।

ডেকে যান ত টিকিট পাওয়া যায়। খাওয়ার ব্যবস্থা স্তালুনে (ভোজন-গৃহে) হইতে পারিবে।" এই সময় আমি ফার্ষ্ট-ক্লাশে চড়িতাম। ডেক-প্যাসেঞ্জার হইয়া কোনও ব্যারিষ্টার কি যায়? আমি ডেকে যাইতে অস্বীকার করিলাম। আমার এজেণ্টের উপর সন্দেহ হইল। ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট পাওয়া যায় না—ইহা আমার মনে লাগিল না। এজেন্টকে বলিয়া আমিই টিকিট কেনার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমি ষ্টীমারে গেলাম। ষ্টীমারের প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত দেখা করিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি আমাকে খোলসা করিয়া বলিলেন—"আমাদের জাহাজে সাধারণতঃ এত ভিড় হয় না। কিন্তু মোজাম্বিকের গভর্ণর-জেনারেল এই ষ্টীমারে যাইতেছেন, সেইজন্য সমস্ত যায়গা ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে।"

"আপনি কি কোনও রকম করিয়া আমার জন্য একটা জায়গা করিয়া দিতে পারেন না?

প্রধান কর্ম্মচারী আমাকে দেখিয়া লইলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"এক উপায় আছে। আমার ক্যাবিনে একটা বার্থ খালি আছে। সেখানে আমরা যাত্রী লই না—কিন্তু আপনাকে আমি জায়গা দিতে প্রস্তুত আছি।" আমি সন্তুষ্ট হইলাম। প্রধান কর্ম্মচারীকে ধন্যবাদ দিলাম। শেঠের সহিত কথা বলিয়া টিকিট কাটাইলাম। ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে আমি আগ্রহ-ভরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যাত্রা করিলাম।

প্রথম বন্দর ছিল লামু। সেখানে পঁহুছিতে প্রায় তের দিন লাগিল। রাস্তায় কাপ্তেনের সহিত খুব বন্ধুত্ব হয়। কাপ্তেনের দাবা খেলার সখ ছিল। তিনি নূতন শিখিতেছিলেন। তাঁহার

চাইতেও নূতন লোকের সহিত খেলিতে তাঁহার সখ গেল, তিনি আমাকে খেলিতে ডাকিলেন। আমি দাবা কখনো খেলি নাই। যাঁহারা খেলেন তাঁহারা বলেন যে, এই খেলায় বুদ্ধির ব্যবহার খুব হয়। কাপ্তেন নিজেই আমাকে শিখাইয়া লইবেন বলিলেন। তিনি আমাকে ভাল ছাত্রই পাইলেন, কেননা আমার অসীম ধৈর্য্য ছিল। আমিই হারিতাম আর তাহাতেই তিনি আমাকে শিখাইতে আরও উৎসাহিত হইতেন। আমার দাবা খেলা ভাল লাগিল। কিন্তু এই সখ ষ্টীমারে থাকা পর্য্যন্তই ছিল। খেলার জ্ঞানও গুটিগুলির চাল শেখার উপরে উঠে নাই।

লামু বন্দরে আসিলাম। সেখানে ষ্টীমার তিন চার ঘণ্টা থামায়। আমি বন্দর দেখিতে নীচে নামিলাম। কাপ্তেনও নামিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সাবধান করিয়া বলিলেন যে—"এখানকার বন্দরের অবস্থার উপর নির্ভর করা যায় না, শীঘ্রই ফিরিবেন।"

জায়গাটা একেবারেই ছোট। পোষ্টাফিসে গেলাম—সেখানে ভারতবাসী কেরাণী দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া আনন্দ হইল। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিলাম। হাব্‌সীদের সাক্ষাৎ পাইলাম। তাহাদের চাল-চলন দেখিয়া ভাল লাগিল—সেখানে কতকটা সময় গেল। কতকগুলি ডেকের যাত্রী আমার পরিচিত ছিল,—তাহারা রান্না করিয়া খাওয়ার জন্য নীচে নামিয়াছিল। আমি তাহাদের নৌকাতেই উঠিলাম। নৌকা খুব ভরা ছিল। জলের টান এত বেশী ছিল যে নৌকার দড়ি ষ্টীমারের সিঁড়ির সঙ্গে কোন ক্রমেই বাঁধা যাইতিছিল না। নৌকা ষ্টীমারের সিঁড়ির নিকট যায় আবার তৎক্ষণাৎ হটিয়া আসে। ষ্টীমার ছাড়ার প্রথম সিটি বাজিয়া গেল। আমি বিচলিত হইলাম।

কাপ্তেন উপর হইতে দেখিতেছিলেন। তিনি আরও পাঁচ মিনিট ষ্টীমার দাঁড়াইতে বলিলেন। ষ্টীমারের নিকট এক ডিঙ্গী ছিল। আমার এক বন্ধু দশ টাকা দিয়া উহা আমার জন্য ভাড়া করিলেন ও সেই মাঝি আমাকে নৌকা হইতে টানিয়া তুলিয়া লইল। ষ্টীমারের সিঁড়ি তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। দড়ি ধরিয়া আমাকে উপরে টানিয়া তুলিল ও ষ্টীমার চলিতে লাগিল। অন্য যাত্রীরা রহিয়া গেল। কাপ্তেন যে সাবধান করিয়াছিলেন তাহার অর্থ এখন বুঝিলাম।

লামু হইতে মোম্বাসা ও সেখান হইতে জাঞ্জীবার পঁহুছিলাম। জাঞ্জীবারে অনেক দিন বসিয়া থাকিতে হইল—আট কি দশ দিন হইবে। সেখানে ষ্টীমার বদলাইতে হইল।

কাপ্তেনের ভালবাসার অন্ত ছিল না। কিন্তু এই ভালবাসা আমার পক্ষে পরিণামে বিশেষ প্রীতিকর হয় নাই। তিনি একদিন আমাকে তাঁহার সহিত বেড়াইতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। এক ইংরাজ মিত্রকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমরা তিনজনে কাপ্তেনের ডিঙ্গীতে চড়িয়া পারে আসিলাম। এই বেড়ানোর মর্ম্ম আমি মোটেই বুঝিতে পারি নাই। আমি এ সব বিষয়ে যে কত অনভিজ্ঞ তাহার খবর কাপ্তেনও রাখিতেন না। আমরা হাব্‌সী স্ত্রীলোকদের বাড়ীতে পঁহুছিলাম। এক দালাল আমাদিগকে সেখানে লইয়া গেল। প্রত্যেককে এক একটি কামরা দেখাইয়া দিল। সেখানে ঢুকিয়া লজ্জায় আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। স্ত্রীলোক বেচারী কি যে ভাবিল তাহা সেই জানে। কাপ্তেন ডাক দিলেন। যেমন ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তেমনি ভাবেই বাহির হইয়া

আসিলাম। কাপ্তেন আমার শুদ্ধতা বুঝিলেন। প্রথমে আমার লজ্জাবোধ হইয়াছিল, কিন্তু যেমন মনে হইল কাজটা কোনও ক্রমেই অনুমোদন করা যায় না, অমনি আমার লজ্জার ভাবও মিলাইয়া গেল। ঐ বহিন্‌কে দেখিয়া আমার মনে একটু বিকারও যে স্পর্শ করে নাই সেজন্য আমি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। এইবার রমণীটির ঘরে প্রবেশ করিবার অনুরোধ যে অস্বীকার করিতে পারি নাই—সেই দুর্ব্বলতার জন্য আমার গ্লানি উপস্থিত হইল।

এই প্রকারের পরীক্ষা আমার জীবনে এই তৃতীয়বার। কত যুবক প্রথমে নির্দ্দোষ থাকিয়াও, মিথ্যা লজ্জায় দোষের ভিতর ডুবিয়া যায়। আমার বাঁচা আমার নিজের শক্তিতে হয় নাই। যদি আমি কামরায় প্রবেশ করিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিতাম, তবে উহা আমার কৃতিত্ব বলা যাইত। আমাকে কেবল ঈশ্বরই বাঁচাইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে ঈশ্বরের উপর আমার আস্থা বাড়িল এবং মিথ্যা লজ্জা ত্যাগ করার কতকটা শিক্ষা হইল।

জাঞ্জীবারে এক সপ্তাহ কাটাইতে হইল। সেই জন্য আমি একটী ঘর ভাড়া লইয়া সহরেই থাকিলাম। সহর খুব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম—জাঞ্জীবারের বৃক্ষ লতাদির ধারণা আমাদের দেশে এক মালাবারেই হইতে পারে। সেখানকার বিশাল বৃক্ষ, বৃহৎ ফল ইত্যাদি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

জাঞ্জীবার হইতে মোজাম্বিক ও সেখান হইতে মে মাসের প্রায় শেষের দিকে নাতাল পঁহুছিলাম।

৭

অভিজ্ঞতার নমুনা

নাতালের বন্দরকে ডারবান্ বলে, পোর্ট নাতালও বলা হয়। ষ্টীমার ঘাটে আসিল। আবদুল্লা শেঠ আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন। নাতালের আরও অনেকে নিজেদের মিত্রদিগকে ষ্টীমার হইতে লইতে আসিয়াছিল। তখনই আমি লক্ষ্য করিলাম যে, এখানে ভারতবাসীদের বিশেষ সম্মান নাই। আবদুল্লা শেঠের পরিচিতেরা যে ভাবে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহাতেই একটা অবজ্ঞার ভাব দেখা যাইতেছিল। উহাতে আমি ব্যথিত হইলাম। আবদুল্লা শেঠের এই অবজ্ঞা সহ্য করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। আমাকে যাহারা দেখিতেছিল তাহাদের মধ্যে একটা কৌতুহলের ভাব ছিল। তখন আমি ফ্রক্-কোট ইত্যাদি পরিতাম ও মাথায় বাঙ্গালী ধরণের পাগড়ী দিতাম।

আমাকে বাড়ী লইয়া যাওয়া হইল। নিজের কামরার পাশেই আর একটা কামরা আবদুল্লা শেঠ আমাকে দিলেন। তিনি আমাকে বুঝিতে পারিলেন না, আমিও তাঁহাকে বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার ভাই যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহা পড়িয়া তিনি আরো বিচলিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে, ভাই তাঁহার জন্য একটী শ্বেত হস্তী পাঠাইয়াছেন। আমার সাহেবী চালের জন্য তাঁহার খরচা পড়িবে। আমার জন্য বিশেষ কাজ তখন কিছু ছিল না। তাঁহার কেস্ চলিতেছিল ট্রান্সভালে —আমাকে শীঘ্র পাঠাইয়াই বা কি হইবে? আমার দক্ষতা ও বিশ্বস্ততাই বা কতদূর? তিনি নিজে আমার সহিত প্রিটোরিয়ায় থাকিতে

পারিবেন না। প্রতিবাদী প্রিটোরিয়ায় আছেন, তিনি যদি আমাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করেন? আর যদি আমাকে এই মোকদ্দমার কাজ না দেওয়া যায় তবে অন্য কাজ ত তাঁহার কেরাণীরাই আমার অপেক্ষা ভাল করিতে পারে। কেরাণী ভুল করিলে তাহাকে শাসন করা যায়, কিন্তু আমাকে? এই ত গেল মোকদ্দমা ও কেরাণীগিরীর কথা, বাকী আর তৃতীয় কোনও কাজ ত ছিল না। সুতরাং যদি কেসের কাজ না দেওয়া হয় তাহা হইলে আমাকে বসাইয়া খাওয়াইতে হয়।

আবদুল্লা শেঠের পুস্তকের বিদ্যা খুবই কম ছিল, তবে ব্যবহারিক জ্ঞান খুব ছিল। তাঁহার বুদ্ধি প্রখর ছিল এবং তিনিও তাহা জানিতেন। ইংরাজী জ্ঞান কেবল কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া কাজ চালাইবার মত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই ইংরাজী দিয়াই তিনি নিজের সমস্ত কাজ সারিয়া লইতেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সহিত কথা বলিতেন, ইউরোপীয়ান্ ব্যবসায়ীদের সহিত সওদা করিয়া আসিতেন, উকীলকে নিজের মামলা বুঝাইতে পারিতেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তাঁহার খুব সম্মান ছিল। সে সময় তাঁহার কারবার ভারতীয়দের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বড় ছিল—অথবা যাহারা খুব বড় তাহাদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। তাঁহার স্বভাব সন্দিগ্ধ ছিল।

তিনি ইস্‌লামের গর্ব্ব করিতেন। তত্ত্ব-জ্ঞান বিষয়ে কথা বলিতে ভালবাসিতেন। আরবী জানিতেন না, কিন্তু কোরাণ-সরিফ্ ও অন্যান্য ইস্‌লামীয় সাহিত্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ভালই ছিল। দৃষ্টান্ত ত তাঁহার মুখে লাগিয়াই ছিল। তাঁহার সহিত বাস করিয়া আমি ইস্‌লামীয় ব্যবহারের ভালরূপ জ্ঞান পাইয়াছিলাম। আমাদের পরস্পরের সহিত পরিচয়ের পরে তিনি আমার সহিত খুব ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন তিনি আমাকে ডারবানের কোর্ট দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং কোর্টে তাঁহার উকীলের নিকট আমার বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার দিকে তাকাইলেন, তিনি আমাকে পাগড়ী খুলিতে বলিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া আদালত হইতে চলিয়া আসিলাম।

আমার ভাগ্যে এখানেও লড়াই ছিল।

কতকগুলি ভারতবাসীকে আদালতে ঢুকিতে হইলেই পাগড়ী খুলিতে হইত। কেন খুলিতে হইত তাহার কারণ আবদুল্লা শেঠ আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—যাহারা মুসলমান পরিচ্ছদ পরিধান করে তাহাদিগকে পাগড়ী খুলিতে হয় না—কিন্তু অন্যান্য ভারতবাসীকে আদালতে প্রবেশ করিতে হইলেই পাগড়ী খুলিতে হয়।

এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বুঝিতে হইলে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার। দুই তিন দিনের ভিতরেই আমি দেখিতে পাইলাম, ভারতবাসীরা সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ মুসলমান বেপারীদের—তাঁহারা নিজেদিগকে 'আরব' বলিতেন। অন্য এক ভাগ হিন্দুদের এবং আর এক ভাগ পার্শী কেরাণীদের। হিন্দু কেরাণীরা মাঝামাঝি ঝুলিতেছিল। তাহাদের কেহ কেহ 'আরব' বলিয়া চলিয়া যাইত। পার্শীরা নিজেদের পরিচয় দিত পারস্যদেশীয় বলিয়া। এই তিন ভাগের পরস্পরের ভিতর ব্যবসা ছাড়া অল্প-স্বল্প সামাজিক সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় ছিল—তামিল তেলুগু ও উত্তর ভারতের চুক্তি-বদ্ধ বা চুক্তি-মুক্ত ভারতবাসী। যে সকল গরীব ভারতবাসী পাঁচ বৎসরের

জন্য চুক্তি বা এগ্রিমেণ্ট করিয়া নাতালে মজুরী করিতে আসিত তাহাদিগকে সেখানে 'গিরমিট্' বলা হয়। গিরমিট্ ইংরাজী 'এগ্রিমেণ্ট' শব্দের অপভ্রংশ। অন্য তিন শ্রেণীর সহিত ইহাদের কাজ-কর্ম্মের সম্বন্ধ ছাড়া আর কোনও সম্বন্ধ ছিল না। এই গিরমিটিয়াদিগকে ইংরাজেরা 'কুলী' বলিত এবং তাহাদের সংখ্যাই অধিক ছিল বলিয়া সকল ভারতবাসীকেই 'কুলী' বলা হইত। কুলীর বদলে তাহাদিগকে 'সামী'ও বলা হইত। 'সামী' কথা তামিল নামের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত থাকে। 'সামী' মানে স্বামী। স্বামীর অর্থ ত মালিক। সেইজন্য কোনও ভারতবাসী 'সামী' শব্দ ব্যবহারে রাগ করিলে এবং তাহার সাহস থাকিলে সে জবাব দিত—"তুমি আমাকে সামী বলিতেছ, কিন্তু জান সামী মানে, মনিব? আমি তোমার মনিব ত নহি।" কোনও কোনও ইংরাজ ইহাতে লজ্জাবোধ করিত, আবার কেহ বা জ্বলিয়া উঠিয়া গালি দিত অথবা সুবিধা হইলে মার-ধরও করিত। কেননা তাহার কাছে "সামী" শব্দটা অবজ্ঞা-সূচক। তাহার অর্থ 'মুনিব' করাতেও তাহার ভিতরের অপমানের ভাবটা ঘুচিত না।

সেইজন্য আমাকে 'কুলী'-ব্যারিষ্টার বলা হইত। বেপারীদিগকে বলা হইত কুলী-বেপারী। কুলীর মুল অর্থ যে মজুর তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বেপারীরা ঐ শব্দ ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া বলিত—"আমি কুলি নহি—আমি ত আরব।" অথবা "আমি ত বেপারী"। যদি বিনয়ী ইংরাজ হইত তবে একথা শুনিয়া সেও মাফ্ চাহিত।

এই অবস্থায় পাগ্ড়ী পরার প্রশ্নটাও বড় হইয়া পড়িয়াছিল।

পাগ্‌ড়ী খোলা মানেই অপমান সহ্য করা। আমি ভাবিলাম—হিন্দুস্থানী পাগ্‌ড়ী পরা ছাড়িয়া দিয়া যদি ইংরাজী টুপী পরি তবে পাগ্‌ড়ী খোলায় অপমানও হয় না এবং ঝগড়া হইতেও বাঁচিয়া যাই।

আবছুল্লা শেঠের কাছে ইহা ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, আপনি যদি এখন এইরূপ পরিবর্ত্তন করেন তবে তাহার খারাপ অর্থ হইবে। তাহা ছাড়া যাহারা দেশী পাগ্‌ড়ী পরিতে চায় তাহাদের অবস্থা আরও কঠিন হইবে। আপনার মাথায় দেশী পাগ্‌ড়ীই মানায় ভাল। ইংরাজী টুপি পরিলে আপনি ওয়েটারদের মধ্যে পরিগণিত হইবেন।

এই উপদেশের মধ্যে সাংসারিক বিজ্ঞতা ছিল, দেশপ্রেম ছিল ও কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণতাও ছিল। সাংসারিক অভিজ্ঞতার ছাপ ত সুস্পষ্ট। দেশপ্রেম না থাকিলে পাগ্‌ড়ী পরায় আগ্রহ থাকিত না। সঙ্কীর্ণতা না থাকিলে 'ওয়েটারের' কথা উঠিত না। গিরিমিটিয়া ভারতীয়-দিগের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান তিন ভাগ ছিল। এই শেষোক্ত ভাগ তাহাদেরই সন্তান যে সকল গিরমিটিয়া ভারতবাসী খৃষ্টান হইয়াছিল। ১৮৯৩ সালেও ইহাদের সংখ্যা অনেক ছিল। তাহারা সকলেই ইংরাজী পোষাক পরিত ও তাহাদের অধিকাংশই হোটেলে চাকুরী করিয়া রোজগার করিত। আবছুল্লা শেঠ এই শ্রেণীর কথাই তাঁহার টুপী সম্বন্ধীয় মন্তব্যে উল্লেখ করিয়াছিলেন। হোটেল ওয়েটারের কাজকে একটা নীচুবৃত্তি বলিয়া তিনি মনে করিতেন। এই রকম আজও অনেকে মনে করেন।

আবছুল্লা শেঠের কথা আমার কাছে মোটের উপর ভালই

লাগিল। আমি কোর্টের এই ঘটনাটি সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দিলাম ও আমার পাগ্‌ড়ী পরার সমর্থন করিলাম। আমার পাগ্‌ড়ী লইয়া সংবাদ-পত্রে অনেক আলোচনা হইল এবং "আনওয়েলকম্‌ ভিজিটর" 'অনাদৃত আগন্তুক' বলিয়া হেডিং দিয়া আমার কথা ছাপা হইল। এইরূপে তিন চার দিনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনায়াসে আমার নামের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়া গেল। কেহ আমার পক্ষ লইলেন, কেহ বা আমার ঔদ্ধত্যের খুব নিন্দা করিলেন।

আমার পাগ্‌ড়ী প্রায় শেষ পর্য্যন্ত ছিল। অবশেষে কখন তাহা গেল তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

৮

প্রিটোরিয়ার পথে

অল্পদিনের মধ্যেই ডারবানে অবস্থিত ভারতীয় খৃষ্টানদের সংস্পর্শে আসিলাম। সেখানে কোর্টের দোভাষী মিঃ প'ল রোমান ক্যাথলিক ছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় করার পর প্রটেষ্টাণ্ট মিশনের শিক্ষক পরলোকগত মিঃ সুভান গড্‌ফ্রের সঙ্গে পরিচয় করিলাম। ইঁহারই পুত্র জেম্‌স গড্‌ফ্রে গতবৎসর সাউথ আফ্রিকান ডেপুটেশনের প্রতিনিধি মণ্ডল-ভুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এই সময়েই পরলোকগত পার্শী রোস্তমজীর এবং পরলোকগত আদমজী মিঞা খানের সহিতও পরিচয় হয়। ইঁহারা সকলেই কাজের আবশ্যকতা ভিন্ন পরস্পরের সহিত মিশিতেন না। কিন্তু পরে দেখা যাইবে যে, ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবারও প্রয়োজন হইয়াছিল।

আমি যখন এই প্রকার পরিচয় করিয়া ফিরিতেছিলাম তখন কারবারের উকীলের নিকট হইতে পত্র আসিল যে, কেসের জন্য তৈরী হইতে হইবে। সেজন্য হয় শেঠ নিজেই যেন প্রিটোরিয়ায় যান, এবং নিজে না যাইতে পারিলে আর কাহাকেও যেন সেখানে পাঠাইয়া দেন।

আমাকে শেঠ এই পত্র পড়িয়া শুনাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি প্রিটোরিয়ায় যাইবেন ?" আমি বলিলাম—"আমাকে কেস্ বুঝাইয়া দিলে বলিতে পারি। সেখানে যে কি করিতে হইবে তাহাই ত এখনো জানি না।" তিনি তাঁহার কেরাণীদিগকে কেস্ বুঝাইয়া দিতে আদেশ দিলেন।

আমি দেখিলাম আমাকে একেবারে গোড়া হইতে সুরু করিতে হইবে। জাঞ্জীবারে যখন নামিয়াছিলাম তখন সেখানকার আদালতের কাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। এক পার্শী উকীল কোন সাক্ষীর জবানবন্দী লইতেছিলেন। তিনি জমা-খরচের প্রশ্ন করিতেছিলেন। আমি জমা-খরচের খবর জানি না। উহা না স্কুলে, না বিলাতে শিখিয়াছিলাম।

দেখিলাম কেস্‌টি হিসাবের উপরেই নির্ভর করিতেছে। হিসাবের জ্ঞান যাহার আছে সেই এই কেস্ বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে। মুহুরী জমার আর খরচের কথা যত বলিতে লাগিল আমি ততই গোলে পড়িতে লাগিলাম। পি, নোট কি পদার্থ আমি জানিতাম না। অভিধানে শব্দটা পাইলাম না। আমার অজ্ঞতা আমি কেরাণীর নিকট ব্যক্ত করিলাম ও তাহার নিকট হইতে জানিলাম যে, পি, নোট মানে প্রমিসরী নোট। হিসাব শিক্ষার বহি কিনিয়া তাহা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কতকটা আত্ম-বিশ্বাস আসিল। মামলাটা বুঝিতে পারিলাম। আবদুল্লা শেঠ হিসাব লিখিতে না জানিলেও তাঁহার ব্যবহারিক জ্ঞান এমন ছিল যে, তিনি হিসাব সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্নও সামাধান করিতে পারিতেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমি প্রিটোরিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।

শেঠ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় উঠিবেন ?" আমি জবাব দিলাম—"আপনি যেখানে বলেন সেইখানে"।

"আপনাকে আমি আমার উকীলের নিকট পাঠাইয়া দিব। তিনি আপনার থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। প্রিটোরিয়াতে আমার একজন মেমন দোস্ত আছেন, তাঁহাকেও আমি লিখিব। কিন্তু আপনার সেখানে উঠা ঠিক হইবে না। সেখানে বিপক্ষের খুব খাতির। আপনার

নিকট আমার গোপনীয় কাগজপত্র থাকিবে, তাহা যদি কেহ পড়ে তবে আমাদের কেসের ক্ষতি হইবে। সুতরাং তাহাদের সহিত আপনার যত কম পরিচয় হয় ততই ভাল।"

আমি বলিলাম—"আপনার উকীল যেখানে রাখিবেন আমি সেখানেই থাকিব, অথবা আমি নিজেও কোন ঘর খুঁজিয়া লইতে পারিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার একটা গোপনীয় কথাও বাহিরে যাইবে না। তবে আমি দেখাশুনা সকলের সঙ্গেই করিব। বিপক্ষের সহিতও আমাকে মিত্রাচার করিতে হইবে। যদি সম্ভব হয়, এই কেস্ ঘরে ঘরেই যাহাতে মিটিয়া যায় আমি তাহারও চেষ্টা করিব। তৈয়ব শেঠ ত আপনার আত্মীয়ই—না?"

বিপক্ষ পরলোকগত তৈয়ব হাজি খান মহম্মদ, আবদুল্লা শেঠের নিকট আত্মীয় ছিলেন।

আবদুল্লা শেঠ একটু চমকিয়া উঠিলেন দেখিলাম। কিন্তু আমি ডারবানে পহুঁছিবার ছয় সাত দিন পরে একথা হইতেছিল। আমরা পরস্পরকে জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি যে 'শ্বেত হস্তী' সে বিশ্বাস অনেকটা দূর হইয়াছিল। তিনি বলিলেন :—

"হাঁ—আঁ—আঁ। যদি মিটমাট হয় তবে তাহা অপেক্ষা আর ভাল কিছুই হইতে পারে না। আমরা ত আত্মীয়ই, আর পরস্পর বরাবর পরিচিত। কিন্তু তৈয়ব শেঠ সহজে কোনও মীমাংসা মানিয়া লওয়ার লোক নয়। আপনার পেটের কথা জানিয়া লইয়া পরে আপনাকেই ফাঁসাইবে। মোদ্দা কথা—যাহা করেন সাবধান হইয়া করিবেন।"

আমি বলিলাম—"আপনি মোটেই চিন্তা করিবেন না। আমাদের কেসের কথা তৈয়ব শেঠকে আমি কিছুই বলিব না। আমি তাঁহাকে

কেবল এইটুকুই বলিব যে—দুইজনে ঘরোয়া মিটাইয়া ফেলিলে আর উকীলের পেট ভরাইতে হয় না।"

সপ্তম কি অষ্টম দিনে আমি ডারবান হইতে রওনা হইলাম। আমার জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দেওয়া হইল। রাত্রিতে শোওয়ার বিছানা লইলে আরো পাঁচ শিলিং বেশী দিয়া টিকিট করিতে হয়। অবদুল্লা শেঠ শয্যার জন্যও টিকিট করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমি জেদ বশতঃ, অহঙ্কার বশতঃ, অথবা পাঁচ শিলিং বাঁচাইবার জন্য শয্যার টিকিট করিলাম না।

আবদুল্লা শেঠ আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন—"সাবধান থাকিবেন। এ মুলুক ভারতবর্ষ নয়। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের পয়সা আছে। আপনি পয়সার কৃপণতা করিবেন না। যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই করিবেন।"

আমি কৃতজ্ঞতা জানাইলাম ও আমার জন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিলাম।

নাতালের রাজধানী মরিৎজবর্গে ট্রেন প্রায় নয়টায় পহুঁছিল। এইখানেই বিছানা দিতে আসে। রেলের লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি বিছানার আবশ্যক আছে?"

আমি বলিলাম "আমার কাছে আমার বিছানা আছে।" সে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে এক প্যাসেঞ্জার আসিল। সে আমাকে বেশ করিয়া দেখিল। আমার চামড়ার রং সাদা নয় দেখিয়া চটিয়া গেল। সে বাহির হইয়া গেল এবং দুই একজন আমলা লইয়া ফিরিয়া আসিল। কেহ আমাকে কিছু বলিল না। অবশেষে আর একজন আমলা আসিল। সে বলিল—"নামিয়া আসুন, আপনাকে শেষের গাড়ীতে যাইতে হইবে"।

আমি বলিলাম—"আমার কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে।"

তিনি জবাব দিলেন—"সে হউক, আমি বলিতেছি আপনাকে শেষের কামরায় যাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম "আমি ডারবান হইতে এই কামরায় আসিয়াছি, আর ইহাতেই যাইব।"

আমলা বলিল—"সে হইবে না। আপনাকে নামিতেই হইবে, না নামিলে সিপাহী নামাইয়া দিবে।"

আমি বলিলাম—"তাহা হইলে সিপাহীই নামাইয়া দিক্, আমি ইচ্ছা করিয়া নামিব না।"

সিপাহী আসিল। সে আমার হাত ধরিল ও ধাক্কা মারিয়া নীচে নামাইয়া দিল। আমার জিনিষ-পত্র নামাইয়া ফেলিল। আমি অন্য কামরায় যাইতে অস্বীকার করিলাম। ট্রেণ রওনা হইয়া গেল। আমি ওয়েটিং-রুমে গেলাম। আমার হ্যাণ্ড ব্যাগ সঙ্গে রহিল, অন্য জিনিষ সেখানেই পড়িয়াছিল, রেলওয়ের লোক উহার জিম্বা লইয়াছিল।

শীতকাল ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার উপর-প্রদেশে শীত বড় বিষম হয়। মরিৎজবর্গ উচ্চস্থান ছিল। সেইজন্য ঠাণ্ডা খুব লাগিতেছিল। আমার ওভারকোট আমার জিনিষের সঙ্গে ছিল। জিনিষ চাওয়ার সাহস হইল না, যদি আবার অপমান করে। শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। কামরায় আলো ছিল না। মধ্যরাত্রে এক প্যাসেঞ্জার আসিল ও আমার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তখন আমার কথা বলার মত মনের অবস্থা ছিল না।

আমার কর্ত্তব্য, কি তাহাই বিচার করিতে লাগিলাম। "আমার যাহা ন্যায্য অধিকার তাহার জন্য কি লড়িব না, ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইব,

না অপমান সহ্য করিয়াই প্রিটোরিয়া পঁহুছিব? তারপর কেস্ শেষ করিয়া দেশে ফিরিব! কেস্ আরম্ভের পর ফেলিয়া পলানো কাপুরুষের কাজ। আমার উপর যে দুঃখ নামিয়া আসিয়াছে উহা ত বাহ্য দুঃখ। একটা মহারোগ ভিতরে রহিয়াছে, ইহা তাহারই বাহ্য লক্ষণ। এই মহারোগ হইতেছে বর্ণ-বিদ্বেষ। ইহা দূর করার শক্তি থাকে ত সেই শক্তির ব্যবহার করিব। তাহাতে যদি আরও দুঃখ হয় সে সকল সহ্য করিব। বর্ণ-বিদ্বেষ দূর করা পর্য্যন্তই এই বিরোধের সীমা রাখিব।"

ইহা স্থির করিয়া অন্য ট্রেণে যেমন করিয়া হউক অগ্রসর হইব স্থির করিলাম।

সকালে আমি জেনারেল ম্যানেজারের নিকট অভিযোগ করিয়া তার করিলাম। দাদা আবদুল্লাকেও খবর দিলাম। আবদুল্লা শেঠ তখনই জেনারেল ম্যানেজারের সহিত দেখা করিলেন। জেনারেল ম্যানেজার নিজের লোকের ব্যবহারই সমর্থন করিলেন, তবে জানাইলেন যে, বিনা হাঙ্গামায় যাহাতে আমি গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে পারি সেজন্য তিনি ষ্টেশন মাষ্টারকে উপদেশ দিয়াছেন। আবদুল্লা শেঠ মরিৎজবর্গের হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকেও আমার সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিবার জন্য তার করিয়াছিলেন ও অন্য ষ্টেশনেও সেই প্রকার তার পাঠাইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহারা নিজেরা যে অপমান পাইয়া থাকেন, আমার নিকট তাহার বর্ণনা করিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে, আমার যাহা ঘটিয়াছে ইহা নূতন কিছুই নহে; প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে যদি ভারতবাসীরা ভ্রমণ করে তবে তাহাদের সহিত আমলারা ও গোরা প্যাসেঞ্জারেরা ঐ প্রকার ব্যবহারই করিয়া থাকে। এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে দিন কাটিয়া

গেল, রাত্রি হইল, ট্রেণ আসিল। আমার জন্য স্থান তৈরী ছিল। যে বিছানার টিকিট লইতে ডারবানে চাই নাই, তাহা মরিৎজবর্গে লইলাম। ট্রেণ আমাকে চার্লস টাউন লইয়া চলিল।

৯

আরও দুর্গতি

চার্লস টাউনে ট্রেন প্রাতে পঁহুছে। চার্লস-টাউন হইতে জোহানেসবর্গ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে তখনকার দিনে ট্রেন ছিল না। ঘোড়ার 'সিগরাম' ছিল। মধ্যপথে ষ্টণ্ডারটনে একরাত্রি থাকিতে হইত। আমার নিকট সিগরামের টিকিট ছিল। এই টিকিট একদিন পরে পঁহুছিলেও রদ হয় না। আবার আবদুল্লা শেঠ চার্লস-টাউনে সিগরাম-ওয়ালার নিকট তারও করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা ত কেবল একটা অজুহাতই খুঁজিয়া ফেরে! সেই জন্য আমাকে নূতন লোক জানিয়া বলিল—"আপনার টিকিট তো রদ হইয়া গিয়াছে।" আমি উহার উত্তর দিলাম। 'টিকিট রদ হইয়াছে' —একথা বলার কারণ অন্য কিছু ছিল। যাত্রীরা সকলেই সিগরামের ভিতরে বসে। আমি ত কুলী বলিয়া গণ্য, চেহারাতেই বিদেশীর মত দেখাইতেছিল। সেইজন্য আমাকে গোরা যাত্রীদের মধ্যে যদি বসাইতে না হয় তাহা হইলেই ভাল। বস্তুতঃ ইহাই ছিল সিগরাম-ওয়ালার অভিপ্রায়। কোচবাক্সের দুইদিকে দুইটা সিট ছিল। উহার একটাতে সিগরাম কোম্পানীর এক গোরা কণ্ডাক্টর বসিত। সে ভিতরে বসিল ও আমাকে ড্রাইভারের পাশে বসাইল। আমি বুঝিলাম যে ইহা অন্যায়—ইহা কেবল অপমান। কিন্তু এ অপমান আমি গিলিয়া ফেলার যোগ্য মনে করিলাম। জোর করিয়া ভিতরে বসা আমার দ্বারা হইবে না।

যদি আমি তর্ক আরম্ভ করি, তবে সিগরাম চলিয়া যাইবে এবং

আমার আর একদিন মিথ্যা যাইবে। পর দিনই বা কি হইবে দৈব জানে। এইজন্য আমি বিজ্ঞের মত বাহিরেই বসিয়া গেলাম। মনে বড়ই ক্ষোভ হইল।

প্রায় তিনটার সময় সিগরাম পারডীকোপে পঁহুছিল। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেইখানে এখন গোরা কণ্ডাক্টরের বসার ইচ্ছা হইল। তাহার চুরট খাওয়ার দরকার—একটু হাওয়া খাওয়াও চাই। সেইজন্য সে একটা ময়লা চট্ ড্রাইভারের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া পাদানের উপর বিছাইয়া দিয়া আমাকে বলিল—"স্বামী, তুমি এইখানে ব'স, আমাকে ড্রাইভারের পাশে বসিতে হইবে।"

এই অপমান আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। সেইজন্য আমি ভয়ে ভয়ে তাহাকে বলিলাম—"তুমিই আমাকে এইখানে বসাইয়াছ, সে অপমান আমি সহ্য করিয়াছি। আমার স্থান ত ভিতরে বসিবার। কিন্তু তুমি ভিতরে বসিয়া আমাকে এইখানে বসাইয়াছ। এখন তোমার বাহিরে বসার ও চুরট খাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছে, সেইজন্য তোমার পায়ের কাছে আমাকে বসিতে বলিতেছ। আমি ভিতরে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমার পায়ের কাছে বসিতে প্রস্তুত নহি।" এই কথা কেবল বলিতেছিলাম, ইতিমধ্যেই লোকটা আসিয়া আমার উপর ঘুষি চালাইতে লাগিল ও আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া নীচে ফেলিবার চেষ্টা করিল। আমি সিটের পাশের পিতলের ডাণ্ডা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলাম। হাতের কব্জি ভাঙ্গিয়া যায় তবুও রেল ছাড়িব না সঙ্কল্প করিলাম। আমার উপর এই মার প্যাসেঞ্জারেরা দেখিতেছিল। সে আমাকে গাল দিতেছিল, টানিতেছিল ও মারিতেছিল আর আমি চুপ করিয়াছিলাম। সে বলবান্

আমি দুর্ব্বল। প্যাসেঞ্জারদের একজনের মনে দয়া হইল, সে বলিয়া উঠিল—"ওহে, বেচারাকে ঐখানেই বসিতে দাও। মিছামিছি উহাকে মারিও না। উহার কথা ত ঠিক। ওখানে না হয় ত আমাদের কাছে ভিতরে বসিতে দাও।" লোকটা বলিয়া উঠিল—"কখনো না।" কিন্তু কিছু দমিয়া গেল, সেই জন্য আমাকে মারাও বন্ধ করিল। আমার হাত ছাড়িয়া দিল। গালি ত অজস্র শুনাইয়া দিলই। এক 'হোটেণ্টট্' চাকর অপর সিটে ছিল তাহাকে পা-দানে বসাইয়া নিজে বাহিরে বসিল। যাত্রীরা ভিতরে বসিল। সিটি দেওয়া হইল, সিগরাম চলিল। আমার বুক দপ্‌দপ্ করিতেছিল এবং আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি জীবিত অবস্থায় পঁহুছিব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সে লোকটা আমার দিকে ক্রোধভরে তাকাইতেছিল, আঙ্গুল দেখাইয়া বলিতেছিল—"মনে রাখিও, একবার আমাকে ষ্টণ্ডারটনে পঁহুছিতে দাও তারপর টের পাইবে।" আমি মূক হইয়া রহিলাম এবং আমার প্রভুর নিকট—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

রাত্র হইল, ষ্টণ্ডারটন পঁহুছিলাম। কয়েকজন ভারতবাসীর মুখ দেখিতে পাইলাম। নীচে নামিতেই ভারতবাসীরা বলিল—"আমরা আপনাকে ইসা শেঠের দোকানে লওয়ার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আমাদের নিকট শেঠ আবদুল্লার তার আসিয়াছে।" আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। তাহাদের সহিত শেঠ ইসা হাজী সুমারের দোকানে গেলাম। আমার আশেপাশে শেঠ ও তাঁহার লোকেরা বসিলেন। আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছে বলিলাম। তাঁহাদের বড় দুঃখ হইল এবং নিজেদের দুঃখের বর্ণনা করিয়া আমাকে আশ্বাস দিলেন। আমার উপর যে কাণ্ড করা হইয়াছে তাহা সিগরাম-কোম্পানীকে জানানো দরকার। আমি

এজেণ্টের নিকট চিঠি লিখিলাম, সে লোক যে ধমক দেখাইয়াছে তাহাও লিখিলাম, আর কাল যখন যাইতে হইবে তখন অন্য যাত্রীর সহিত আমি যাহাতে ভিতরে বসিতে পারি সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিবার জন্যও তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। এজেণ্ট জবাব দিলেন—"ষ্টাণ্ডারটন হইতে বড় গাড়ী যায় এবং ড্রাইভার ইত্যাদি বদল হয়। যে লোকের নামে অভি-যোগ করিয়াছেন সে কাল থাকিবে না, আপনি অন্য যাত্রীর সহিত সিট্ পাইবেন।" জবাব পাইয়া কতকটা স্বস্তি বোধ হইল। যে লোকটা মারিয়াছিল তাহার উপর নালিশ করার আমার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। সুতরাং এই মার খাওয়ার অধ্যায় এইখানেই শেষ হইল। সকালে ইসা শেঠের লোকেরা আমাকে সিগরামে লইয়া গেল। যায়গা ঠিক মত পাইলাম। বিনা হাঙ্গামায় সেইরাত্রে জোহানেসবর্গে পঁহুছিলাম।

ষ্টাণ্ডারটন ছোট গ্রাম। জোহানেসবর্গ বিশাল সহর। সেখানেও আবদুল্লা শেঠ তার করিয়াছিলেন। আমাকে মহম্মদ কাসেম কমরুদ্দীনের দোকানের নাম ঠিকানাও তিনি দিয়াছিলেন। সিগরাম দাঁড়াইতেই তাঁহাদের লোক আসিয়াছিল। কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে দেখিলাম না, তাঁহারাও আমাকে দেখিতে পান নাই। আমি হোটেলে যাওয়া স্থির করিলাম। দুই চারিটা হোটেলের নাম জানিয়া লইয়াছিলাম। গাড়ী করিলাম। তাহাকে গ্রাণ্ড-ন্যাশনাল হোটেলে লইয়া যাইতে বলিলাম। সেখানে পঁহুছাইয়া ম্যানেজারের নিকট গেলাম। জায়গা চাহিলাম। তিনি আমাকে ক্ষণেকের জন্য চাহিয়া দেখিলেন। ভদ্রতার ভাষা ব্যবহার করিলেন। "আমি দুঃখিত সমস্ত কামরা ভর্ত্তি আছে" এই বলিয়া বিদায় করিলেন। তখন গাড়ীওয়ালাকে মহম্মদ কাসেম কমরুদ্দীনের দোকানে হাঁকাইয়া যাইতে বলিলাম। সেখানে আবদুল গনি শেঠ

আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। হোটেলের ঘটনা আমি তাঁহাকে বলিলাম। তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"হোটেলে আপনাকে কে উঠিতে দেয় ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন দিবে না ?"

"আপনি দিন কতক এখানে থাকিলেই বুঝিতে পারিবেন—কেন। এদেশে আমরা থাকি, কেননা আমরা রোজগার করিতে চাই। সেই-জন্যই অনেক অপমান সহ্য করিয়াও পড়িয়া আছি।"—এই বলিয়া তিনি ট্রান্সভালের দুঃখের ইতিহাস শুনাইলেন।

এই আব্দুল গণি শেঠের পরিচয় পরে আমরা অনেক পাইব।

"তিনি আবার বলিলেন—এদেশ আপনাদের মত লোকের যোগ্য নয়। কালই ত আপনাকে প্রিটোরিয়ায় যাইতে হইবে। দেখিবেন—আপনি তৃতীয় শ্রেণীতেই যায়গা পাইবেন। ট্রান্সভালে নাতাল অপেক্ষাও দুঃখ বেশী। এখানে আমাদিগকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটই দেয় না।"

আমি বলিলাম—"আপনারা ইহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন না কেন ?"

আব্দুল গণি শেঠ বলিলেন—"আমরা চিঠি-পত্র লেখালেখি করিতেছি। কিন্তু আমাদের লোকেরাই কি প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে চাহেন ?

আমি রেলের আইন আনাইলাম। উহা দেখিলাম। তাহাতে ফাঁক ছিল। ট্রান্সভালের সাধারণ আইনই কম ছিদ্রগ্রস্ত নয়। রেলওয়ে আইনের আর কথা কি ?

আমি শেঠকে বলিলাম—"আমি ফার্ষ্ট ক্লাশেই যাইব। আর যদি তাহা না হয় তবে যাইব ঘোড়ার গাড়ীতে। মাত্র সাঁয়ত্রিশ মাইল বইত নয়।

আব্দুল গণি শেঠ উহার খরচ ও সময়ের কথা আমাকে ভাবিতে বলিলেন। কিন্তু আমার প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করিলেন। ইহার পর আমরা ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট চিঠি পাঠাইয়া দিলাম। চিঠিতে আমি যে ব্যারিষ্টার তাহা জানাইলাম। প্রিটোরিয়া শীঘ্র পঁহুছানো দরকার তাহাও জানাইলাম। তাঁহাকে আরও লিখিলাম যে, ইহার উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সময় আমার নাই বলিয়া আমি ষ্টেশনে যাইব ও আশা করি প্রথম শ্রেণীর টিকিট পাইব। আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, ষ্টেশনমাষ্টার লিখিত-জবাব 'না'-ই দিবেন। ভাবিয়াছিলাম—কুলি ব্যারিষ্টারের সম্বন্ধে ষ্টেশনমাষ্টারের হয়ত একটা ধারণা আছে। সুতরাং তিনি প্রথম শ্রেণীর টিকিট আমাকে না-ও দিতে পারেন। তাই আমি স্থির করিলাম—আমি নিখুঁৎ ইংরাজী পোষাকে তাঁহার সাম্‌নে যাইয়া দাঁড়াইব এবং তাঁহার সহিত কথা বলিব। মনে হইল—এরূপ করিলে হয়ত তাঁহার নিকট হইতে টিকিট আদায় করা যাইবে। সেই হেতু আমি ফ্রক্‌কোট, নেকটাই ইত্যাদি চড়াইয়া ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। ষ্টেশন মাষ্টারের সাম্‌নে একটি গিণি ফেলিয়া দিয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট চাহিলাম।

তিনি বলিলেন—"আপনিই আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন কি ?"

আমি বলিলাম—"হাঁ, আমাকে টিকিট দিলে কৃতজ্ঞ হইব। আমাকে আজই প্রিটোরিয়ায় যাইতে হইবে।"

ষ্টেশনমাষ্টার হাসিলেন। আমার প্রতি দয়াও হইল। তিনি বলিলেন—"আমি 'ট্রান্সভালার' নহি, আমি 'হল্যাণ্ডার'। আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি। আপনার প্রতি আমার সমবেদনা আছে। আমি আপনাকে টিকিটও দিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু একটা

সর্ত্তে—যদি আপনাকে রাস্তায় গার্ড নামাইয়া দেয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে দেয় তবে আপনি আমাকে জড়াইবেন না ; অর্থাৎ রেলওয়ের উপর দাবী করিবেন না। আমি আশা করি, আপনার যাওয়া নির্ব্বিঘ্নেই ঘটিবে।” এই কথা বলিয়া তিনি টিকিট দিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম ও তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিলাম। আব্দুল গণি শেঠ উঠাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া তিনি খুসী হইলেন, আশ্চর্য্য হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সাবধানও করিলেন। বলিলেন—“আপনি নির্ব্বিঘ্নে প্রিটোরিয়ায় পঁহুছিলে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিব। আমার আশঙ্কা হয় যে, ট্রেণে গার্ড আপনাকে প্রথম শ্রেণীতে থাকিতে দিবে না, আর যদি গার্ড দেয়ও তবে যাত্রীরা দিবে না।

আমি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিলাম। ট্রেণ চলিল। জার্মিষ্টনে পঁহুছিলে গার্ড টিকিট দেখিতে বাহির হইল। আমাকে প্রথম শ্রেণীতে দেখিয়াই সে চটিয়া উঠিল। আঙ্গুল দিয়া ইসারা করিয়া বলিল—“তৃতীয় শ্রেণীতে যাও।” আমার প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেখাইলাম। সে বলিল—“তাহাতে কিছু হইবে না—যাও তৃতীয় শ্রেণীতে।”

এই কামরায় একজন ইংরাজ ছিলেন। তিনি সেই গার্ডকে ধমকাইলেন—“তুমি এই ভদ্রলোককে কেন বিরক্ত করিতেছ? তুমি দেখিতেছ না উহাঁর নিকট ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট আছে? উনি থাকায় আমার কোনও অসুবিধা হইতেছে না।” এই বলিয়া তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—“আপনি যেমন আছেন আরাম করিয়া থাকুন।”

গার্ড গজ্‌রাইয়া বলিল—“আপনি যদি কুলীর সহিত বসিতে চাহেন, তবে আমার কি?” এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় প্রিটোরিয়ায় পঁহুছিলাম।

১০

প্রিটোরিয়ায় প্রথম দিন

প্রিটোরিয়া ষ্টেশনে দাদা আব্দুল্লার উকীলের নিকট হইতে কেহ আসিবে আশা করিয়াছিলাম। কোনও ভারতবাসী আমাকে লইতে আসিবে না জানিতাম, কেননা কোনও ভারতবাসীর বাড়ীতে উঠিব না বলিয়াছিলাম। উকীল কাহাকেও ষ্টেশনে পাঠান নাই। পরে তাঁহার লোক না পাঠানোর কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি রবিবারের দিন পঁহুছিয়াছিলাম। সেদিন কোন অসুবিধা না করিয়া লোক পাঠানো যায় না। আমি শঙ্কিত হইলাম। কোথায় যাইব ভাবিতে লাগিলাম। কোনও হোটেলেই যে স্থান পাইব না—এ সন্দেহ আমার ছিল।

১৮৯৩ সালের প্রিটোরিয়া ষ্টেশন ১৯১৪ সালের প্রিটোরিয়া ষ্টেশন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা আলো জ্বলিতেছিল। যাত্রীও বেশী ছিল না। আমি সকল যাত্রীকে যাইতে দিলাম। ভাবিলাম—একটু ফাঁকা হইলে কলেক্টরকে টিকিট দিয়া জিজ্ঞাসা করিব যে, কোনও ছোট হোটেল, অথবা এমন কোনও বাড়ীর কথা তিনি বলিতে পারেন কিনা যেখানে যাইতে পারি। ইহা জিজ্ঞাসা করিতেও মন সরিতেছিল না, কেননা অপমান হওয়ার ভয় ছিল। ষ্টেশন খালি হইল। আমি টিকিট কলেক্টরকে টিকিট দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম। তিনি বিনয়ের সহিত জবাব দিলেন। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, তিনি বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার কাছেই এক

আমেরিকান নিগ্রো ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন—

"আমি দেখিতেছি আপনি সম্পূর্ণই অপরিচিত এবং আপনার কোন বন্ধুও এখানে নাই। আমার সহিত আসেন ত এক ছোট হোটেল আছে, সেখানে আমি আপনাকে লইয়া যাইতে পারি। তাহার মালিক আমেরিকান এবং তাঁহাকে আমি ভালরকম জানি। মনে হয় যে তিনি আপনাকে স্থান দিবেন।"

আমার কিছু সন্দেহ যদিও হইল তবুও আমি এই ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলাম। তিনি আমাকে জনষ্টনের ফ্যামিলি হোটেলে লইয়া গেলেন। প্রথমে তিনি মিঃ জনষ্টনকে এক কোণে লইয়া গিয়া কিছু কথা বলিলেন। মিঃ জনষ্টন আমাকে এক রাত্রি রাখিতে স্বীকার করিলেন। তাঁহার সর্ত্ত এই যে —আমার খাদ্য আমার ঘরে পঁহুছিয়া দিবেন।

তিনি বলিলেন—"আমি আপনাকে কথা দিতেছি যে, আমার কাছে কালা-ধলার তফাৎ নাই। কিন্তু আমার গ্রাহক সকলেই গোরা। যদি আমি আপনাকে খানাঘরে খাইতে দিই তবে হয়ত তাঁহারা বিরক্ত হইবেন—হয়ত বা চলিয়া যাইবেন।"

আমি জবাব দিলাম—"আপনি আমাকে এক রাত্রের জন্য স্থান দিয়াছেন ইহাতেই আমি উপকৃত হইয়াছি। এদেশের অবস্থা আমি কিছু কিছু বুঝিয়াছি। আপনার মুস্কিল কোথায় তাহাও আমি জানি। আপনি স্বচ্ছন্দে আমার কামরায় আমার খাদ্য পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি আগামী কাল আমি অন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিব।"

আমাকে কামরা দেখাইয়া দেওয়া হইল। আমি তাহাতে প্রবেশ করিলাম। একাকী বসিয়া খানা কখন আসিবে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এই হোটেলে বেশী লোক থাকে না। প্লেট হাতে ওয়েটারকে দেখার বদলে মিঃ জনষ্টন আসিতেছেন দেখিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন- "আপনাকে এই ঘরেই খাওয়াইব বলিয়াছিলাম, তাহাতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছিল। এখানে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদিগকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আপনার ভোজন-গৃহে বসিয়া খাওয়াতে তাঁহাদের কোনও আপত্তি নাই। আপনি এখানে যতদিন ইচ্ছা থাকুন তাহাতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। এখন আপনার যদি ইচ্ছা হয় তবে ভোজন-গৃহে চলুন, আর না হয়ত এখানেও খাইতে পারেন।"

আমি তাঁহাকে পুনরায় ধন্যবাদ দিলাম। ভোজন-গৃহে গেলাম। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম।

পরদিন সকালে উকীলের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহার নাম এ ডবলি বেকার। আবদুল্লা শেঠ তাঁহার বিষয় কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রথম দেখা হওয়া সত্বেও তাঁহাকে আমার কিছু নূতন ঠেকিল না। তিনি হৃদ্যতার সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন এবং কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিলাম। তিনি বলিলেন ব্যারিষ্টার হিসাবে আপনার এখানে যে কোন কাজ আছে, তাহা নহে। আমরা বড় বড় ব্যারিষ্টার মণ্ডলকেই এই কেসে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি কেস্ দীর্ঘ ও জটিল। আপনার নিকট হইতে আমি সংবাদাদিই পাইতে চাই। ইহা ভিন্ন আপনার দ্বারা আমার মক্কেলের সহিত পত্র-ব্যবহার করাও সহজ হইয়া পড়িবে। যে বিষয় তাঁহার নিকট হইতে জানার আবশ্যক তাহা আপনার হাত দিয়াই আনাইয়া লইব। ইহাতে যে কাজের সুবিধা

হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার জন্য থাকার স্থান আমি এ পর্য্যন্ত খোঁজ করি নাই। আপনার সহিত দেখা হওয়ার পর খোঁজ করিব এই প্রকার ভাবিয়াছিলাম। এখানে বর্ণ-বিদ্বেষ খুব বেশী। সেই জন্য থাকার স্থান ঠিক করা সহজ নয়। কিন্তু একটি মহিলাকে আমি জানি, তিনি গরীব। তিনি এক রুটিওয়ালার স্ত্রী। আমার মনে হয় তিনি আপনাকে স্থান দিবেন। ইহাতে তাঁহারও কিছু সাহায্য হইবে। চলুন আমরা সেইখানেই যাই।

এই কথা বলিয়া আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটীকে একপাশে লইয়া মিঃ বেকার কিছুক্ষণ কথা বলিলেন এবং তিনি আমাকে রাখিতে স্বীকার করিলেন। সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ শিলিং হিসাবে তিনি খরচা লইবেন।

মিঃ বেকার উকীল হইলেও গৃহী-ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। তিনি বাঁচিয়া আছেন এবং এখন কেবল পাদরীরই কাজ করিতেছেন। ওকালতী ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল। তিনি এখনো আমার সহিত পত্র ব্যবহার বজায় রাখিয়াছেন। পত্রের বিষয় একই। তাঁহার পত্রে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে খৃষ্ট ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমার সহিত আলোচনা করেন এবং যিশুকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলিয়া স্বীকার না করিলে, এবং তাঁহাকেই ত্রাণ-কর্ত্তা বলিয়া না মানিলে পরম শান্তি পাওয়া যায় না—ইহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

প্রথম সাক্ষাৎকালেই মিঃ বেকার আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মনোভাব জানিয়া লইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"আমি হিন্দু হইয়া জন্মিয়াছি। এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান নাই। অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও খুব কমই জানি, আমি কোথায় আছি, আমি কে, আমি

কি মানি, আমার কি মানা উচিত—এ সকল আমি কিছুই জানি না। আমার নিজের ধর্ম্মে গভীরভাবে প্রবেশ করার ইচ্ছা আছে। অন্য ধর্ম্মের সম্বন্ধেও যথা সম্ভব জানিতে ইচ্ছা আছে।” এই সকল শুনিয়া মিঃ বেকার সন্তুষ্ট হইলেন ও আমাকে বলিলেন—“আমি নিজে সাউথ আফ্রিকার জেনারেল মিশনের এক ডিরেক্টর। আমার নিজের খরচায় আমি এক গির্জ্জা তৈরী করিয়া দিয়াছি। সেখানে সময় সময় আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিয়া থাকি। আমি বর্ণভেদ মানি না। আমার সঙ্গে কয়েকজন সহকর্ম্মীও আছেন। আমরা রোজ একটার সময় মিলিত হই এবং আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করি। আপনি সেখানে আসিলে আমি সুখী হইব এবং আমার সঙ্গীদের সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিব। তাঁহারাও আপনার সহিত মিশিয়া সুখী হইবেন। আমার বিশ্বাস, আপনারও তাঁহাদের সঙ্গ ভাল লাগিবে। আমি কিছু ধর্ম্ম পুস্তকও আপনাকে পড়িতে দিব। তবে আসল পুস্তক ত বাইবেল। উহা পাঠ করিবার জন্য আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

মিঃ বেকারকে ধন্যবাদ দিলাম। একটার সময় তাঁহাদের প্রার্থনায় যতদিন পারি যোগ দিতে স্বীকার করিলাম।

“তবে আগামী কাল একটায় এইখানে আসিবেন, আমরা প্রার্থনা মন্দিরে যাইব।”

আমি বিদায় লইলাম। বিশেষ বিচার করার সময় তখন ছিল না। মিঃ জনষ্টনের নিকট গেলাম। বিল চুকাইয়া দিলাম। নূতন ঘরে গেলাম। সেইখানেই আহার করিলাম। গৃহিণী ভাল মানুষ লোক। আমার জন্য তাঁহাকে নিরামিষ রান্না করিতে হইত। এই পরিবারের

মধ্যে শীঘ্রই আত্মীয়ের ন্যায় বাস করিতে আমার বাধা হইল না। খাওয়া দাওয়ার পর যে আত্মীয়ের নামে দাদা আবদুল্লা পত্র দিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। আলাপ পরিচয় হইল। তাঁহার নিকট হইতে ভারতীয়দের দুর্দশার আরও বিশেষ সংবাদ জানিলাম। তাঁহার ওখানে আমাকে রাখার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—আমার থাকার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন—যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তাঁহাকে জানাইতে যেন দ্বিধা না করি।

সন্ধ্যা হইল। বাড়ী ফিরিলাম। আমি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। হাতে কোন জরুরী কাজ ছিল না। আবদুল্লা শেঠকে সংবাদ দিলাম। মিঃ বেকারের মিত্রাচারের মানে কি? এই প্রকার ধর্ম্ম-বন্ধুর নিকট হইতে আমি কি পাইতে পারি? আমি খৃষ্টধর্ম্ম পাঠাভ্যাস কতদূর পর্যান্ত করিব? হিন্দু ধর্ম্মের সাহিত্য কোথায় পাইব? তাহা না জানিলে খৃষ্টধর্ম্মের স্বরূপই বা আমি কেমন করিয়া বুঝিব? আমি একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলাম। যাহা পড়িতে হয় তাহা পক্ষপাত শূন্য হইয়া পড়িব। মিঃ বেকার ও তাঁহার মিত্রগণের সহিত ব্যবহারে ঈশ্বর আমাকে যেমন ভাবে পরিচালিত করিবেন—তেমনি ভাবে চলিব। আমার নিজের ধর্ম্ম যতদিন না সম্পূর্ণ ভাবে জানিতেছি, ততদিন অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করার কথা ভাবিব না। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১১

খৃষ্টানদিগের সহিত সম্বন্ধ

পরের দিন মিঃ বেকারের সহিত একটার সময় প্রার্থনা-সমাজে গেলাম। সেখানে মিস্ হ্যারিস, মিস্ গেব্, মিঃ কোটস্ ইত্যাদির সহিত পরিচয় হইল। সকলে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিলেন। আমিও তাঁহাদের অনুকরণ করিলাম। প্রার্থনায় যাঁহার যাহা ইচ্ছা ঈশ্বরের নিকট চাহিলেন। 'দিবস যেন শান্তিতে কাটে' 'আমার হৃদয়ের দ্বার খোল' ইত্যাদি সাধারণ প্রার্থনাও হইল। আমার জন্য প্রার্থনা হইল—"আমাদের মধ্যে যে নূতন ভাই আসিয়াছেন তাঁহাকে তুমি পথ দেখাও। যে শান্তি তুমি আমাদিগকে দিয়াছ সেই শান্তি তুমি তাঁহাকেও দাও। যে যিশু আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন তিনি তাঁহাকেও মুক্তি দিন।" এই প্রার্থনায় ভজন কীর্ত্তন নাই। ঈশ্বরের নিকট নিজের যাহা চাওয়ার তাহা চাওয়া হয় ও তাহার পর সকলে পৃথক হইয়া যায়। এই সময় দুপুরের খানা খাওয়ার সময়। সেই জন্য এই প্রার্থনা সারিয়া সকলে নিজ নিজ খানার জন্য গিয়া থাকেন। প্রার্থনায় পাঁচ মিনিটের বেশী যায় না।

মিস্ হ্যারিস ও মিস্ গেব প্রৌঢ়া কুমারী ছিলেন। মিঃ কোটস্ কোয়েকার ছিলেন। এই দুই মহিলা একত্র বাস করিতেন। তাঁহারা প্রতি রবিবারে তাঁহাদের ওখানে চারিটার সময় চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রতি রবিবারে যখন আমরা মিলিত হইতাম মিঃ কোট্সের কাছে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত আমার সাপ্তাহিক রোজ-নামচা (ডায়েরী) পড়িতে

হইত। কি কি পুস্তক পড়িয়াছি, আমার মনের ওপর তাহাদের কি প্রভাব হইয়াছে—এই সব আলোচনা করিতাম। এই মহিলাদ্বয় তাঁহাদের মধুর অনুভূতির বিষয় শুনাইতেন ও নিজেদের পরম শান্তির কথা বলিতেন।

মিঃ কোটস্ খোলা-প্রাণ উত্তমী যুবক কোয়েকার ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ গভীর হইল। আমরা অনেক সময় একত্র বেড়াইতে যাইতাম। তিনি আমাকে অন্য খৃষ্টানদিগের নিকটে লইয়া যাইতেন।

কোটস্ আমার উপর পুস্তকের বোঝা চাপাইতেন। যেগুলি তাঁহার কাছে ভাল লাগিত সেগুলি আমাকে পড়িতে দিয়া যাইতেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-বশতঃই ঐ সব পুস্তক পড়িব বলিয়া আমি স্বীকার করিতাম। পড়া হইয়া গেলে তাহা লইয়া আমরা আলোচনাও করিতাম।

এই ধরণের পুস্তক ১৮৯৩ সালে আমি অনেক পড়িয়াছি। তাহার অনেকগুলির নাম আমার স্মরণ নাই। তাহার মধ্যে ডাক্তার পার্কারের "সিটি টেম্পলের" টীকা, পিয়ার্সনের "মেনি ইনফলিবল্ প্রুফস্" অর্থাৎ 'অনেক অভ্রান্ত প্রমাণ' প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে বাইবেলের ধর্ম্ম সমর্থনের জন্য নানা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। আমার উপর এই গ্রন্থ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। পার্কারের টীকা নীতি-বর্দ্ধক গ্রন্থ। কিন্তু যাহার খৃষ্টধর্ম্মের প্রচলিত মত সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ইহা হইতে তাহার সাহায্য লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। বাটলারের 'এনালজি' খুব গুরুত্বপূর্ণ কঠিন পুস্তক। উহা বুঝিতে হইলে চার পাঁচবার পড়া দরকার। উহা নাস্তিককে আস্তিক করার জন্য লিখিত বলা যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সব যুক্তি

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে আমার কোনও আবশ্যক ছিল না। কেননা এ সময় আমার নাস্তিকতা ছিল না। যিশুর অদ্বিতীয় অবতারত্বের সম্পর্কে এবং তাঁহার ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ হওয়ার সম্পর্কে যে সব যুক্তি উহাতে ছিল, তাহা আমার মনে কোনও ছাপ রাখিতে পারে নাই।

কিন্তু কোটস্ হারিবার লোক নহেন। তাঁহার প্রেমের শেষ ছিল না। তিনি আমার গলায় বৈষ্ণবী কণ্ঠী দেখিলেন। তাঁহার কাছে ইহা কুসংস্কার বলিয়া মনে হইল ও তাঁহার ইহা দেখিয়া দুঃখ হইল। "এই কুসংস্কার আপনার শোভা পায় না। দিন ত, ছিঁড়িয়া ফেলি।"

"এই কণ্ঠী ছেঁড়া যায় না, মায়ের প্রসাদী যে।"

"কিন্তু আপনি কি উহা মানেন?"

"ইহার গূঢ় অর্থ আমি জানি না। ইহা না পরিলে আমার অনিষ্ট হইবে ইহা আমি মানি না। কিন্তু যে মালা আমাকে মা আদর করিয়া পরাইয়াছেন, তাহা পরাই আমি শ্রেয় বলিয়া মানি। বিনা কারণে উহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না। কালক্রমে যখন জীর্ণ হইয়া ছিঁড়িয়া যাইবে, তখন পুনরায় পরার আমার লোভ নাই। কিন্তু এ কণ্ঠী ছিঁড়িয়া ফেলা যায় না।"

কোটস্ আমার যুক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। কেননা আমার ধর্ম্মে তাঁহার কোনই আস্থা ছিল না। তিনি ত আমাকে অজ্ঞানতার গহ্বর হইতে টানিয়া তুলিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছিলেন। অন্য ধর্ম্মে কিছু কিছু সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ সত্যস্বরূপ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে আমার মোক্ষ নাই, যিশুর মধ্যস্থতা ছাড়া পাপ দূর হইতেই পারে না ও পুণ্য কর্ম্ম সমস্তই নিরর্থক—ইহাই তিনি আমাকে বুঝাইতেন।

কোটস্ যেমন পুস্তকের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিতেন, তেমনি যাঁহারা গোঁড়া খৃষ্টান বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের সহিতও পরিচয় করাইয়া দিতেন। এই পরিচিতদের ভিতর "প্লাইমাউথ ব্রিদারন্" সম্প্রদায়ভুক্ত একটি খৃষ্টান পরিবারও ছিল।

কোটসের দ্বারা যে সমস্ত লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম তাঁহাদের ভিতর অনেকগুলি লোককে ঈশ্বর-ভীরু—এই প্রকার মনে হইত। এই পরিবারটির সংস্পর্শে আসার পর তাঁহাদের একজন আমার সাম্‌নে যে যুক্তি তুলিয়া ধরিলেন তাহা এইরূপ—"আমাদের ধর্ম্মের মহত্ব আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। আপনার কথাতেই বুঝিতেছি, আপনাকে প্রতিদিন ক্ষণে ক্ষণে নিজের ভুলের সম্বন্ধে ভাবিতে হয়। অনুক্ষণ তাহার সংস্কার করিতে হয়, যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে আপনার অনুশোচনা করিতে হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া আপনি কি করিয়া মুক্তি পাইবেন? আপনি শান্তি ত পাইবেন না। ইহা ত স্বীকার করেন যে, আমরা সকলেই পাপী। এইবার আমাদের মতের পরিপূর্ণতা দেখুন। আমাদের উন্নতি বা প্রায়শ্চিত্তের প্রযত্ন মিথ্যা। তবুও মুক্তি ত চাই। পাপের বোঝা কি করিয়া ঠেলিয়া ফেলিব? আমরা তাহা যিশুর উপর ফেলিয়া দিই। তিনি ঈশ্বরের একমাত্র নিষ্পাপ পুত্র। তিনিই বলিয়াছেন যে, যাহারা তাঁহাকে মানে তিনি তাহাদের পাপ ধুইয়া ফেলেন। তাহারা অবিনশ্বর জীবন লাভ করে। এইখানেই ত ঈশ্বরের অপার করুণা। যিশু দ্বারা এই মুক্তির ব্যবস্থাই আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। সেইজন্য আমাদের পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপ ত হইবেই। এ জগতে নিষ্পাপ কে থাকিতে পারে? সেইজন্য যিশু সারা জগতের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। যাহারা

তাঁহার মহাবলিদান স্বীকার করিয়া লয়, তাহারাই অনন্ত শান্তির অধিকারী হইতে পারে। আপনার কত অশান্তি, আর আমাদের কি শান্তি।"

এই যুক্তি আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল। আমি নম্রতার সহিত জবাব দিলাম—"সমগ্র খৃষ্টান সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত খৃষ্টধর্ম্ম যদি ইহাই হয় তবে আমার তাহাতে চলিবে না। আমি পাপের পরিণাম হইতে মুক্তি চাই না, আমি পাপ-বৃত্তি হইতে, পাপ-কর্ম্ম হইতেই মুক্তি চাই। তাহা যতদিন না পাই, ততদিন আমার অশান্তিই আমার ভাল।"

প্লাইমাউথ ব্রাদার উত্তর দিলেন—"আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আপনার প্রযত্ন নিষ্ফল, আমার কথা পুনরায় বিচার করিয়া দেখিবেন।"

এই ভাই যেমন বলিয়াছিলেন কাজেও তাহাই করিয়া দেখাইলেন। ইচ্ছা করিয়া নীতি-বিগর্হিত কার্য্য করিয়া তিনি আমাকে দেখাইলেন যে, তাঁহার মন তাহার দ্বারা বিচলিত হয় নাই।

কিন্তু সকল খৃষ্টান যে এই প্রকার বিশ্বাস করেন না তাহা আমি পূর্ব্বেও জানিতাম। কোটস্ নিজে পাপকে ভয় করিয়া চলিতেন। তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল ছিল, তিনি হৃদয়-শুদ্ধির আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন। সেই বহিনেরাও এই প্রকারেরই ছিলেন। আমার হাতে যে সব পুস্তক আসিয়া ছল তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল অনুরাগের ভাবেই পরিপূর্ণ। তাই সম্প্রতি আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম তাহাতে কোটস্ আমার জন্য ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম—প্লাইমাউথ ব্রাদারের অনুচিত মত হইতে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার ভ্রমাত্মক ধারণা হইবে না।

আমার মুস্কিল সত্য সত্যই ছিল। কিন্তু তাহা এ ব্যাপার লইয়া নহে—তাহা বাইবেল ও তাহার প্রচলিত অর্থ লইয়া।

১২

ভারতীয়দিগের সহিত পরিচয়

খৃষ্টানদিগের সহিত সম্বন্ধের কথা আর বেশী কিছু বলিবার পূর্ব্বে সেই সময়কার অন্য অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

দাদা আবদুল্লার যে স্থান ছিল নাতালে, শেঠ তৈয়ব হাজি খান মহম্মদের সেই স্থান ছিল প্রিটোরিয়াতে। তাঁহাকে বাদ দিয়া জনসাধারণের কোনও কাজ হইতে পারিত না। তাঁহার সঙ্গে পরিচয় আমি প্রথম সপ্তাহেই করিয়া লইয়াছিলাম। আমি যে প্রিটোরিয়ায় প্রত্যেক ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসিতে চাই সে কথাও তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। ভারতীয়দিগের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমার সকল কার্য্যে তাঁহার সাহায্য যাচ্ঞা করি। তিনি খুশী হইয়া সাহায্য দিতে প্রস্তুত হইলেন।

আমার প্রথম কাজ হইয়াছিল—সমস্ত ভারতীয়কে এক সভায় সমবেত করিয়া তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থার চিত্র তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করা। শেঠ হাজী মহম্মদ হাজী জুসব, যাঁহার নামে আমার পরিচয় পত্র ছিল, তাঁহার বাড়ীতে এই সভা আহ্বান করা হইল। তাহাতে প্রধানতঃ মেমন-ব্যাপারীরাই উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিছু হিন্দুও ছিলেন। প্রিটোরিয়াতে অল্প সংখ্যক হিন্দুই বাস করিতেন।

ইহাই আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা বলা যায়। আমি সত্য সম্বন্ধেই কিছু বলিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। ব্যবসার মধ্যে সত্যের স্থান নাই—এই কথাই আমি ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে শুনিয়া আসিতেছি।

একথা আমি তখনও মানি নাই—আজও মানি না। ব্যবসা ও সত্য মিস্ খায় না—এইরূপ যাঁহারা বলেন এমন মিত্র আজও আমার আছেন; তাঁহারা ব্যবসাকে ব্যবহার বলেন, আর সত্যকে বলেন ধর্ম্ম। তাঁহাদের যুক্তিতে ব্যবহার এক বস্তু, আর ধর্ম্ম অন্য বস্তু। ব্যবহারে শুদ্ধ সত্য চলে না। সেইজন্য যথাশক্তি সত্য বলা বা করা তাঁহাদের মত। আমি আমার বক্তৃতায় দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। বেপারীদের দুইটী কর্ত্তব্যের কথা আমি বলি। যাঁহারা বিদেশে আসিয়াছেন তাঁহাদের দায়িত্ব যাঁহারা দেশে থাকেন তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী। কেননা এখানে অল্প সংখ্যক ভারতবাসীর চাল-চলন দ্বারাই কোটি কোটি ভারতবাসীর মাপ করা হইবে।

ইংরাজের চাল-চলনের তুলনায় ভারতীয়দের যে সকল গ্লানি আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম সে দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। বিশেষ জোরের সঙ্গে বলিলাম যে—হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, অথবা গুজরাটী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, কচ্ছী, সুরতী ইত্যাদির ভিতর ভেদের কথটা ভুলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

অবশেষে এক মণ্ডল স্থাপনা করিয়া ভারতীয়দিগের দুর্দ্দশা-সংশ্লিষ্ট আমলার নিকট আবেদন করিয়া প্রতিকার করা আবশ্যক—এই প্রকার এক প্রস্তাব করিলাম এবং তাহাতে যত সময় পারি বিনা বেতনে দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত আছি, একথাও জানাইলাম।

দেখিলাম—সভার প্রভাব বেশ ভাল হইয়াছে।

আমার বক্তৃতার পর আলোচনা হইল। কেহ কেহ আমাকে অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া সাহায্য করিতে চাহিলেন। আমার সাহস হইল। আমি দেখিলাম যে, এই সভাতে কম লোকই

ইংরাজী জানেন। এই বিদেশে যদি ইংরাজী জানা যায় তবে ভাল হয় বলিয়া আমার মনে হইল। সেইজন্ত যাঁহাদের সময় আছে তাঁহাদিগকে ইংরাজী শিখিতে বলিলাম। বয়স বেশী হইলেও যে ভাষা শিক্ষা করা যায় তাহা বলিলাম এবং যাঁহারা ঐ প্রকার শিখিয়াছিলেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দিলাম। একটা ক্লাশ যদি হয় তাহাতে, অথবা ব্যক্তিগত ভাবে যদি কেহ পড়িতে চাহেন তবে তাঁহাকেও পড়াইতে রাজি আছি বলিলাম। ক্লাশ করা হইল না। তবে তিন জন তাহাদের সুবিধামত সময়ে যদি তাহাদের বাড়ীতে যাই, তবে ইংরাজী শিখিতে স্বীকৃত হইল। ইহাদের মধ্যে দুইজন মুসলমানের একজন ছিল নাপিত ও একজন কেরাণী। তৃতীয় জন ছিল একজন হিন্দু ছোট দোকানদার। আমি সকলকেই অনুকূল সময়ে পড়াইতে স্বীকার করিলাম। শিক্ষা দেওয়ার শক্তি সম্বন্ধে আমার আদৌ অবিশ্বাস ছিল না। আমার শিষ্য ক্লান্ত হয় ও হইতে পারে, কিন্তু আমার ক্লান্তি ছিল না। এমনও হইয়াছে যে তাহাদের ওখানে গিয়াছি অথচ তাহাদের সময় হয় নাই। কিন্তু আমি ধৈর্য্য হারাই নাই। তাহাদের ইংরাজী কিছু গভীর ভাবে শিক্ষা করার আবশ্যক ছিল না। দুইজনে মাস আষ্টেকের মধ্যে ভালই উন্নতি করিয়াছিল। উভয়েরই হিসাব রাখার ও সাধারণ চিঠিপত্র লেখার জ্ঞান হইয়াছিল। নাপিতটির কেবল তাহার গ্রাহকদের সহিত কথা বলার মত জ্ঞান পাওয়ারই প্রয়োজন ছিল। এই ইংরাজী জানার ফলে দুই জন বেশী রোজগার করার শক্তি পাইয়াছিল।

ঐ সভার ফলে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। এই প্রকার 'সভা প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে করা ঠিক হইল। মোটামুটি নিয়মিত ভাবেই এই সভা বসিতে লাগিল। পরিণামে প্রিটোরিয়ায়

কোনও ভারতীয়ই রহিল না, যে আমাকে জানে না অথবা যাহার অবস্থার সহিত আমি পরিচিত নহি। ভারতীয়দের অবস্থার এই পরিচয় পাওয়ার ফলে প্রিটোরিয়াস্থ ব্রিটিশ এজেণ্টের সহিত আমার পরিচয় করার ইচ্ছা হইল। মিঃ জ্যাকোবাস ডি ওয়েটের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার ভাব ভারতীয়দিগের প্রতি অনুকূল ছিল। কিন্তু তাঁহার খাতির বিশেষ ছিল না। তিনি যথাসম্ভব করিবেন বলিলেন ও আবশ্যক হইলেই আমাকে দেখা করিতে বলিলেন। রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এক্ষণে পত্র-ব্যবহার করিতে লাগিলাম। তাঁহাদিগকে জানাইলাম—তাঁহাদের নিজেদের নিয়ম অনুসারেই যাতায়াতে ভারতবাসীদের উপর যে সব বিধি-নিষেধ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা সমর্থিত হইতে পারে না। ফলে ভাল কাপড়-পরা ভারতবাসীকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট দেওয়া হইবে—এইরূপ পত্র পাইলাম। ইহাতে পুরা সুবিধা হইল না। কারণ ভাল কাপড় কি তাহা ঠিক করিবার ভার রহিল ষ্টেশন মাষ্টারের উপরে।

ব্রিটিশ এজেণ্ট তাঁহার হাতের কতকগুলি কাগজপত্র আমাকে পড়িতে দিলেন। তৈয়ব শেঠও ঐ রকম কতকগুলি কাগজপত্র আমাকে দিয়াছিলেন। ইহা পড়িয়া অরেঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেট হইতে ভারতীয়দিগকে কেমন নিষ্ঠুরতার সহিত সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে তাহা জানিতে পারিলাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেটের ভারতীয়দিগের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় আমি প্রিটোরিয়ায় বসিয়াই লাভ করিয়াছিলাম। তখন আদৌ জানি নাই যে, এই

পরিচয় ভবিষ্যতে কত কাজের হইবে। কারণ তখন আমার ধারণা ছিল যে, একবৎসর অন্তে অথবা কেস্ তাহার পূর্ব্বে শেষ হইলে, এক বৎসরের পূর্ব্বেই আমাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু ঈশ্বর অন্য প্রকার স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৩

কুলীবৃত্তির অভিজ্ঞতা

ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেটের ভারতবাসীদের অবস্থার সম্পূর্ণ চিত্র দেওয়ার এ স্থান নয়। তাহার পুরা খবর পাইতে যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি যেন "দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস" পড়েন। তবে তাহার সামান্য কিছু পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা এখানেও আছে। ১৮৮৮ সালে বা তাহার পূর্ব্বে একটা আইন পাশ করিয়া অরেঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেটের ভারতীয়দিগের সমস্ত স্বত্ব ছিনাইয়া লওয়া হয়। যাহারা হোটেলের ওয়েটার হইয়া, অথবা ঐ রকম কোনও মজুরী করিয়া থাকিতে চায়, সেই রকম ভারতীয়ই সেখানে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল। ব্যবসায়ীদিগকে নামমাত্র খেসারৎ দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আবেদন-নিবেদন অবশ্যই করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ক্ষীণ স্বর কে শোনে?

ট্রান্সভালে ১৮৮৫ সালে কড়া আইন পাশ হয়। ১৮৮৬ সালে এই আইনের কতকটা সংস্কার হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, ভারতবাসী মাত্রকেই তিন পাউণ্ড হিসাবে প্রবেশ-ফি দিতে হইবে। আরও স্থির হয় যে, কেবল নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই তাহারা জমি পাইতে পারিবে এবং তাহাও আবার মালিকী-স্বত্বে পাইবে না। ভোটের অধিকার তাহাদের অবশ্যই নাই। ইহা কেবল এশিয়াবাসীদের জন্যই বিশেষ নিয়ম। কিন্তু কালো লোকদিগের জন্য যে সকল নিয়ম তাহাও তাহাদিগের উপর প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে ভারতীয়দিগের

সাধারণ 'ফুটপাথে'ও চলার অধিকার ছিল না। রাত্রি নয়টার পর লাইসেন্স ব্যতীত তাহারা বাহিরেও যাইতে পারিত না। এই শেষোক্ত আইন ভারতীয়দের উপর কম-বেশী প্রযুক্ত হইত। যাহারা আরব বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিত তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া ইহার ভিতর ফেলা হইত না। ছাড় দেওয়া পুলিশের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত।

এই উভয় নিয়মের প্রভাব আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেই অর্জ্জন করা হইয়াছিল। মিঃ কোটসের সহিত অনেক সময় আমি রাত্রে বেড়াইতে বাহির হইতাম। বাড়ী ফিরিতে রাত দশটাও বাজিত। যদি পুলিশ আমাকে ধরে তবে? এই সংশয় আমার যত না হইত, কোটসের হইত তদপেক্ষা অধিক। নিজের হাবসীদিগকে তিনি লাইসেন্স দিতেন। কিন্তু আমাকে কেমন করিয়া লাইসেন্স দিবেন? নিজের চাকরদের জন্যই মালিক লাইসেন্স দিতে পারেন। আমি যদি লইতে চাই, আর কোটস্ দিতেও চান তবুও দেওয়া যায় না। কেননা তাহাতে ঠকানো হয়; আমাদের সম্বন্ধ ত প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ নহে।

সেইজন্য কোটস্ অথবা তাঁহার কোনও মিত্র আমাকে সরকারী উকীল ডাঃ ক্রাউজের নিকট লইয়া গেলেন। আমরা উভয়েই একই 'ইন' হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছি। রাত নয়টার পর বাহিরে থাকার জন্য আমার লাইসেন্স চাই একথা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। তিনি আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে লাইসেন্স না দিয়া এক পত্র দিলেন। তাহার অর্থ এই যে, আমি যখন খুশী বেড়াইতে পারিব, পুলিশ আমার উপর হাত দিতে পারিবে না। এই পত্রখানা আমি বাহিরে যাইবার সময় সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে রাখিতাম। উহা কখনো ব্যবহার করিতে হয় নাই। ইহাও কেবল দৈবাধীন বলিতে হইবে।

মিঃ ক্রাউজ আমাকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল—একথাও বলা চলে। কখন কখন তাঁহার ওখানে যাইতাম। তাঁহার বিখ্যাত ভাইয়ের সহিত তিনিই পরিচয় করাইয়া দেন। ইনি জোহানেসবর্গে পাবলিক-প্রসিকিউটর ছিলেন। বুয়র-যুদ্ধের সময় ইংরাজ আমলাকে খুন করার জন্য তাঁহার কোর্ট মার্শালের বিচারে সাত বৎসরের জন্য জেলের আদেশ হয়। তাঁহার সনদ বেঞ্চারেরা কাড়িয়া লন। যুদ্ধের পর তিনি জেল হইতে মুক্তি পান, সম্মানের সহিত ট্রান্সভালের কোর্টে প্রবেশ করেন ও নিজ ব্যবসা আরম্ভ করেন।

ফুটপাথে চলার প্রশ্ন আমার পক্ষে কিছু গুরুতর ব্যাপারে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি রোজই প্রেসিডেণ্ট ষ্ট্রীটের এক খোলা ময়দানে বেড়াইতে যাইতাম। এই মহল্লায় প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের বাড়ী ছিল। তাঁহার বাড়ীর চেহারাতে কোনও রকমের আড়ম্বর ছিল না। বাড়ীতে বেড়াইবার কম্পাউণ্ড পর্য্যন্ত ছিল না। অন্য প্রতিবেশীর বাড়ীর সহিত এই বাড়ীর কোনও তফাৎই দেখা যাইত না। এ বাড়ী অপেক্ষা অনেক বড়, ও সাজানো-গোছানো বাগান-ওয়ালা বাড়ী এই প্রিটোরিয়াতেই লক্ষপতিদের ছিল। প্রেসিডেণ্ট সাদাসিধা চালের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বাড়ীর সাম্‌নে এক সিপাই ঘুরিত বলিয়া এই বাড়ীটি যে কোনও সরকারী আমলার তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। সিপাহীর গা ঘেঁষিয়া আমি প্রত্যহই এই রাস্তা দিয়া যাইতাম। সিপাই আমাকে কিছু বলিত না। সিপাই মধ্যে মধ্যে বদলায়। একদিন এক সিপাই সাবধান না করিয়াই, ফুটপাথ হইতে নামিয়া যাইতে না বলিয়াই আমাকে

ধাক্কা মারিল, লাথি দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। কোটস্ তখন ঘোড়সওয়ার হইয়া ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। লাথি মারার কারণ আমি জিজ্ঞাসা করিতে যাইব, তাহার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"গান্ধী, আমি সমস্তই দেখিয়াছি। আপনি নালিশ করিলে আমি সাক্ষ্য দিব। আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে যে, আপনার উপর এই জুলুম হইল।"

আমি বলিলাম—"ইহাতে দুঃখের কারণ নাই, সিপাই বেচারা কি জানে! তাহার কাছে কালা ত কালাই! সে নিগ্রোদিগকে এই ব্যবহারই দিয়া থাকে, সেইজন্য আমাকেও ধাক্কা মারিয়াছে। আমি নিয়ম করিয়াছি যে, ব্যক্তিগত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আদালতে যাইব না। সেইজন্য আমি মামলা করিব না।"

"আপনার স্বভাবের উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, তবুও পুনরায় বিচার করিয়া দেখিবেন। এই সব লোককে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার।" অতঃপর সেই সিপাহীর সহিত কথা বলিয়া তিনি তাহাকে ধম্‌কাইলেন। আমি সকল কথা বুঝিতে পারিলাম না। সিপাহীটি ছিল ডচ্। সুতরাং তাহার সহিত ডচ্ ভাষাতেই কথা হইয়াছিল। সিপাই আমার নিকট মাফ্ চাহিল। মাফ্ চাহিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে মাফ্ করিয়াছিলাম।

সেই হইতে আমি সে রাস্তা ত্যাগ করিলাম। অন্য সিপাই এই ঘটনার খবর কি জানিবে? আবার ইচ্ছা করিয়া লাথি কেন খাইব? সেইজন্য আমি বেড়াইতে যাওয়ার অন্য রাস্তা বাছিয়া লইলাম।

এই ঘটনায় ভারতীয়দের জন্য আমার অনুভূতিকে আরও তীব্র করিল। এই ধারা সম্বন্ধে ব্রিটিশ এজেন্টের সহিত আলোচনা করিয়া, প্রয়োজন

হয় ত এক 'টেষ্ট-কেস্' করার কথা ভারতীয়দের সহিত আলোচনা করিলাম।

এই প্রকারে ভারতীয়দের দুর্গতির কথা কেবল পড়িয়া-শুনিয়া নহে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারাও ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি দেখিলাম—যেসব ভারতবাসী আত্মসম্মান রাখিয়া চলাফেরা করিতে ইচ্ছুক তাহার পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা থাকার উপযুক্ত স্থান নহে। এই অবস্থার কি করিয়া পরিবর্ত্তন হয়, সেজন্য আমার মন খুব বেশী করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য দাদা আবদুল্লার কেসের দিকে মনযোগ দেওয়া।

১৪
মামলা তৈরী

প্রিটোরিয়ায় যে এক বৎসর কাটাইলাম উহা আমার নিকট অমূল্য। আমার জন-সাধারণের জন্য কাজ করার শক্তির পরিমাপ এইখানে কতকটা পাইলাম। ঐ কার্য্যের জন্য শিক্ষাও এইখানেই পাইয়াছিলাম। এই স্থানেই ধর্ম্ম-ভাবনা আমার তীব্র হইতে থাকে। সত্যকার ওকালতী আমি এইখানেই শিক্ষা করিলাম—একথাও বলা যায়। নূতন ব্যারিষ্টার পুরাতন ব্যারিষ্টারের আফিসে থাকিয়া যাহা শিক্ষা করে, আমি তাহাও এইখানেই শিখিলাম। ওকালতী করিতে আমি একেবারে অপটু নহি এই বিশ্বাস আমার এইখানেই আসিল। ভাল উকীল হওয়ার ভিতর যে রহস্য আছে তাহার সন্ধানও আমি এইখানেই পাইলাম।

দাদা আবহুল্লার কেস্ ছোট ছিল না। দাবী ছিল ৪০,০০০ পাউণ্ড অথবা ছয় লক্ষ টাকার। যে ব্যবসা-সম্পর্কে এই মোকদ্দমা তাহার হিসাব জটিল। দাবীর কতকটা অংশ নির্ভর করিতেছিল প্রমিসরী নোট দেওয়ার উপর, আর কতকটা অংশ নির্ভর করিতেছিল প্রমিসরী নোট দেওয়ার অঙ্গীকার পালন করার উপর। প্রতিপক্ষের জবাব এই ছিল যে, প্রমিসরী নোট ফাঁকি দিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং তাহার পুরা মূল্য পাওয়া যায় নাই। এই অবস্থায় আইনের জটিলতা অনেক ছিল, হিসাবের জটিলতাও খুব ছিল।

উভয় পক্ষই বড় বড় ব্যারিষ্টার ও সলিসিটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য এই উভয় কাজেরই অভিজ্ঞতা লাভ করার সুন্দর অবকাশ

পাইলাম। বাদীর পক্ষ হইতে সলিসিটরের জন্য কেস্ তৈরী করার ও অবস্থা বুঝার সম্পূর্ণ ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। ইহা হইতেই সলিসিটর কেস্ তৈয়ারীতে কি অংশ গ্রহণ করে, আবার ব্যারিষ্টার তাহার কতটা ব্যবহার করে তাহা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই কেস্ তৈরী করা হইতেই, আমার বুঝিবার শক্তি ও সাজানোর শক্তি কতটা আছে তাহার পরিচয়ও আমি ভাল রকমই পাইব।

কেসের দিকে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। আমি উহাতে তন্ময় হইয়া গেলাম। পূর্ব্বাপর সমস্ত কাগজপত্র পড়িয়া লইলাম। মক্কেলের বিশ্বাস ও কুশলতার শেষ ছিল না। সেইজন্য আমার কার্য্য খুব সহজ হইয়াছিল। আমি অল্প-সল্প হিসাব রক্ষা শিখিয়া লইয়াছিলাম। অনেক গুজরাটী কাগজপত্র ছিল, তাহার অনুবাদ আমাকেই করিতে হইত; সেই জন্য অনুবাদ করার শক্তিও বাড়ে।

পরিশ্রম খুব হইত। পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম-আলোচনা ও জন-সাধারণের কাজের কথা বলিয়াছি উহাতেও আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহা হইলেও ঐ সকল আমার নিকট গৌণ ছিল। কেস্ তৈরী করাকেই আমি প্রধান স্থান দিয়াছিলাম। সেজন্য আইন পুস্তক বা অন্য যাহা কিছু পড়া দরকার তাহা পূর্ব্বেই পড়িয়া শেষ করিয়া রাখিতাম। অবশেষে মামলার ঘটনার উপর আমার এমন অধিকার জন্মিল যে, তেমন জ্ঞান বাদী প্রতিবাদীরও ছিল না। কেন না আমার কাছে উভয় পক্ষেরই কাগজপত্র ছিল।

পরলোকগত মিঃ পিঙ্কাটের কথা আমার মনে হইল। পরে দক্ষিণ আফ্রিকার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার পরলোকগত মিঃ লিওনার্ডও প্রসঙ্গ-ক্রমে সেই কথারই সমর্থন করিয়াছিলেন। পিঙ্কাট বলিতেন—"আইনের

তিন চতুর্থাংশ হইতেছে ঘটনা"। একবার একটি কেসে আমি দেখিতে পাই যে, ন্যায় আমার মক্কেলের দিকে আছে, কিন্তু আইন তাহার বিরুদ্ধে যাইতেছে। আমি নিরাশ হইয়া মিঃ লিওনার্ডের সাহায্য গ্রহণ করি। ঘটনার দিক দিয়া ঐ মামলা তাঁহার নিকট ভাল মনে হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"গান্ধী, আমি একটা জিনিষ শিখিয়াছি; যদি ঘটনাগুলির উপর ঠিকমত দখল থাকে তবে আইন উহার সহিত আপনিই আসিয়া পড়ে। কেসের ঘটনাগুলির ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে আবার কেসের ঘটনাগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া পরে আসিতে বলিলেন। নূতন করিয়া আবার ঘটনার ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায় আমি উহাতে নূতন আলোকের রেখা দেখিতে পাইলাম। উহার অনুরূপ এক মামলা দক্ষিণ আফ্রিকার পুরানো মামলার মধ্যেও খুঁজিয়া পাইলাম। আমি উৎফুল্ল হইয়া মিঃ লিওনার্ডের নিকট গেলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"দেখুন আমাদের এই কেস্ জিতিতে হইবে, কোন্ জজ বেঞ্চে বসেন তাহার দিকে খেয়াল রাখিতে হইবে।"

দাদা আবদুল্লার মামলা তৈরী করার সময় ঘটনাবলীর এই মহিমা এমনভাবে আমার কাছে ধরা পড়ে নাই। ঘটনা অর্থাৎ সত্য। যদি সত্যকে ধরিয়া থাকি, তবে আইন নিজেই আসিয়া সাহায্যের জন্য সাজিয়া যায়।

আমি এই মামলার শেষ পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলাম যে, আমার মক্কেলের পক্ষে কেস্ খুব জোরালো। আইন তাঁহারই দিকে সাহায্য করিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিলাম যে, মামলায় যাঁহারা লড়িতেছেন তাঁহারা উভয়েই আত্মীয় এবং একই সহরের বাসিন্দা এবং ইহাতে

তাঁহাদের উভয়েরই দুঃখ হইবে। মামলা যে কবে শেষ হইবে বলা যায় না। কোর্টে যদি মামলা থাকে তবে যত দীর্ঘদিন ইচ্ছা ইহা চালানো যায়। মামলা দীর্ঘ হইলে দুইয়ের এক জনেরও লাভ নাই। উভয়েরই সেই জন্য ইচ্ছা ছিল—মামলা যাহাতে শীঘ্র শেষ হয় তাহার চেষ্টা করা।

তৈয়ব শেঠকে আমি অনুরোধ করিলাম, আপোষে মিটাইয়া ফেলার জন্য পরামর্শ দিলাম। উভয়েই বিশ্বাস করিতে পারেন এমন সালিসের হাতে যদি মামলা ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে চটু করিয়া মিটিয়া যায়। উকীলের খরচ এত বেশী হইতেছিল যে, তাহাতে বড় ব্যবসায়ীও ডুবিয়া যায়। দুই জনেই এই মামলার জন্য এত চিন্তিত ছিলেন যে, স্থির হইয়া অন্য কোনও কাজ করিতে পারিতেছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে দুই পক্ষে বৈর ভাবও বাড়িয়া যাইতেছিল। ওকালতী ব্যবসার উপরেও আমার ঘৃণা আসিতেছিল। উভয় পক্ষের উকীলেরাই নিজ নিজ পথে জয়লাভের জন্য আইন খুঁজিয়া বাহির করিতেছিলেন এবং মক্কেলকে তদনুসারে পরামর্শ দিতেছিলেন। যে জয়লাভ করে সেও যে কখনও মামলার সমস্ত খরচ উঠাইয়া লইতে পারে না, ইহা আমি এই মামলাতেই প্রথম দেখিলাম। পক্ষের নিকট হইতে কোর্টে যে ফী লওয়া হয়, সে এক রকমভাবে কোর্ট দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু মক্কেল ও উকীলের মধ্যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ফীর ব্যবস্থা আছে। এ সকল আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমার মনে হইল যে, উভয়ের ভিতর মিত্রতা ফিরাইয়া আনা—দুই আত্মীয়কে মিলাইয়া দেওয়া আমার ধর্ম্ম। আমি মিটাইয়া ফেলিবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। তৈয়ব শেঠ রাজী হইলেন। অবশেষে সালীস নিযুক্ত হইল। সালিসের নিকট দাদা আবদুল্লা জিতিলেন।

কিন্তু ইহাতেও আমার তৃপ্তি হইল না। যদি সালিসের নির্দ্ধারণ তখনই কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে তৈয়ব হাজী খান মহম্মদের এত পয়সা নাই যে, তিনি সব দিতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী পোরবন্দর-মেমনদের এক অলিখিত নিয়ম ছিল যে, প্রাণ দিবে সে-ও ভাল, তথাপি দেউলিয়া হইবে না। তৈয়ব শেঠ ৩৭,০০০ পাউণ্ড একবারে বাহির করিয়া দিতে পারিবেন না। রাস্তা মাত্র একটিই ছিল— দাদা আবছুল্লা যদি অর্থ ধীরে ধীরে পরিশোধ করার সময় দেন। সালিস নিযুক্ত করিতে আমার যত না শ্রম করিতে হইয়াছিল, এই আদায়ের মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য রাজি করিতে আমার তদপেক্ষা অধিক বেগ পাইতে হইল। উভয় পক্ষই রাজি হইলেন। উভয়েরই প্রতিষ্ঠা বাড়িল। আমার আনন্দের অবধি রহিল না। আমি সত্যকার ওকালতী শিখিলাম। আমি মানুষের ভাল দিক দেখিতে শিখিলাম, মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে শিখিলাম। আমি দেখিলাম যে, উকীলের কার্য্য উভয় পক্ষের ভিতর বিচ্ছেদ দূর করা। এই শিক্ষা আমার মনে এমন বদ্ধমূল হইল যে, আমার বিশ বৎসরের ওকালতীর ভিতর অধিকাংশ সময়ই, আফিসে বসিয়া শত শত মামলার বাদী প্রতিবাদীর ভিতর মিটমাট করিতেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাহাতে আমি কিছুই খোয়াই নাই। আত্মা ত খোয়াই নাই-ই—টাকা খোয়াইয়াছি একথাও বলা যায় না।

১৩

ধর্ম্ম-উচ্ছ্বাস

এখন খৃষ্টান মিত্রদের সহিত সম্বন্ধ বিচার করার সময় আসিয়াছে।

আমার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে মিঃ বেকারের চিন্তা বাড়িয়া যাইতেছিল। তিনি আমাকে ওয়েলিংটন কন্‌ভেনশনে লইয়া গেলেন। কয়েক বৎসর পর পর প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানেরা ধর্ম্ম-জাগৃতি বা আত্ম-শুদ্ধির জন্য মিলনের ব্যবস্থা করিতেন। ইহাকে ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার—এই নামে অভিহিত করা যায়। ওয়েলিংটন সম্মেলন এই ধরণেরই একটি সম্মেলন ছিল। মিঃ বেকার আশা করিয়াছিলেন যে, এই সম্মেলনের ধর্ম্ম-জাগৃতির আবেষ্টন, ইহাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের ধর্ম্মোৎসাহ, তাঁহাদের সরল হৃদয় আমার উপর এমন গভীর ছাপ ফেলিবে যে, আমি আর খৃষ্টান না হইয়া থাকিতে পারিব না।

কিন্তু মিঃ বেকারের শেষ ভরসা ছিল প্রার্থনার শক্তির উপর। প্রার্থনার উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত প্রার্থনা ঈশ্বর শ্রবণ করেন। মূলার (একজন খ্যাতনামা ভক্ত খৃষ্টান) যিনি নিজের বৈষয়িক কর্ম্মেও প্রার্থনা দ্বারা পরিচালিত হইতেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত তিনি আমাকে দিতেন। আমি খুব নির্ব্বিকার থাকিয়া প্রার্থনা সম্বন্ধে তাঁহার কথা শুনিতাম। আমি তাঁহাকে এ আশ্বাসও দিতাম

যে, যদি খৃষ্টান হওয়ার জন্য হৃদয় হইতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে অন্য কোনও বাধা আমাকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে বিরত করিতে পারিবে না। অন্তরের আহ্বানের বশ হওয়ার শিক্ষা আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই লাভ করিয়াছি। উহার বশীভূত হইতে আমার মনে আনন্দ আসিত। উহার বিরুদ্ধে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল ও দুঃখদায়ক বোধ হইত।

আমরা ওয়েলিংটনে গেলাম। আমার ন্যায় 'কালো সাথী'কে সঙ্গে লওয়ার জন্য মিঃ বেকারকে মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ আমার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। মিঃ বেকার রবিবার পথ চলিতেন না। সেইজন্য যাওয়ার সময় পথে একটা রবিবার পড়ায়, রাস্তাতেই আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। ষ্টেশনের হোটেলে অনেক হাঙ্গামার পর আমাকে ঢুকানো হইল। কিন্তু সেখানকার ভোজন-গৃহে আমাকে ঢুকিতে দিতে হোটেল-ওয়ালা রাজি হইল না। মিঃ বেকারও সহজে ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি হোটেলের অতিথির অধিকার দাবী করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহার অসুবিধা আমার অজ্ঞাত রহিল না। ওয়েলিংটনেও তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন। সেখানেও তাঁহাকে এজন্য কতকগুলি ছোটখাট অসুবিধায় পড়িতে হয়। অসুবিধাগুলি তিনি গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেগুলি আমার কাছে ধরা পড়িয়াছিল। সম্মেলনটি ছিল ভক্ত খৃষ্টানদিগের একটি মিলন ক্ষেত্র। তাঁহাদের শ্রদ্ধা দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। রেভারেণ্ড মারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার জন্য অনেকে

প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কতকগুলি ভজন আমার কাছে ভারি মিষ্টি লাগিয়াছিল।

সম্মেলন তিন দিন ছিল। সম্মেলনে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ধর্ম্মভাব আমি বুঝিতেছিলাম ও অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করার কারণ পাইলাম না। আমি নিজেকে খৃষ্টান না বলিলে স্বর্গে যাইতে পারিব না, মোক্ষ পাইব না—এমন কথা আমার মন আমাকে বলিল না। কথাটা আমি আমার কয়েকজন সাধু খৃষ্টান বন্ধুকেও বলিয়াছিলাম এবং তাঁহারা তাহাতে আঘাতও পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি নাচার।

আমার মুস্কিলের মূল ছিল ঢের নীচে। 'যীশুখৃষ্টই একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র, তাঁহাকে যে মানে সেই উদ্ধার পায়'—এ কথা আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। ঈশ্বরের যদি পুত্র হয় তবে আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র। যিশু যদি ঈশ্বর-সম হ'ন,—ঈশ্বর হ'ন, তবে মনুষ্য মাত্রই ঈশ্বর-সম,—ঈশ্বরই হইতে পারে। যিশু মৃত্যু দ্বারা ও তাঁহার রক্ত দ্বারা জগতের পাপ ধৌত করিয়া গিয়াছেন, অক্ষরে অক্ষরে একথা মানিতে আমার বুদ্ধি প্রস্তুত নহে। রূপক হিসাবেই উহা সত্য। আবার খৃষ্টানেরা মানেন যে—কেবল মনুষ্যেরই আত্মা আছে, অন্য জীবের নাই, এবং দেহের নাশের সঙ্গেই তাহাদের সম্পূর্ণ নাশ হয়। একথার সঙ্গেও আমার মত মিলে না। যিশুকে একজন ত্যাগ-পূত মহানুভব ধর্ম্মগুরু বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারি। একথা স্বীকার করি যে, যিশুর মৃত্যুতে জগৎ একটা বড় মহৎ দৃষ্টান্ত পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কোনও অভূত-পূর্ব্ব বা রহস্যময় প্রভাব আছে ইহা আমার হৃদয় স্বীকার করিতে

পারে নাই। খৃষ্টানদিগের পবিত্র জীবন হইতে আমি এমন কিছু পাই নাই, যাহা অন্য ধর্ম্মীদিগের পবিত্র জীবন হইতে পাওয়া যায় না। তাহাদের জীবনে যে পরিবর্ত্তন দেখা যায় সেরূপ পরিবর্ত্তন অপরের জীবনেও আমি দেখিয়াছি। তত্ত্বের দিক দিয়াও খৃষ্টানী তত্ত্বের ভিতর কোনও অসাধারণত্ব নাই। ত্যাগের দৃষ্টিতে দেখিলে হিন্দুধর্ম্মই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে হয়। আমি খৃষ্টধর্ম্মকে পূর্ণ ধর্ম্ম অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

কথা উপস্থিত হইলে এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের কথা আমি খৃষ্টান বন্ধুদের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকি। কিন্তু ইহার সন্তোষজনক জবাব তাঁহাদের নিকট হইতে পাই না।

তথাপি আমি খৃষ্টধর্ম্মের পূর্ণতা যেমন স্বীকার করিতে পারি নাই, তেমনি হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণত্বের বিষয় অথবা তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ও আমি তখন স্থির করিতে পারি নাই। হিন্দুধর্ম্মের ত্রুটি আমার দৃষ্টির সম্মুখে পীড়াদায়ক ভাবে দেখা দিত। যদি অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ হয় তবে উহা গলিত অঙ্গ, অথবা ত্যাজ্য অঙ্গ। অতগুলি বর্ণ এবং জাতির অস্তিত্বের অর্থ আমি. বুঝিতে পারিতাম না। বেদ ঈশ্বর প্রণীত ইহার মানে কি? বেদ যদি ঈশ্বর প্রণীত হয় তবে বাইবেল-কোরাণও নহে কি?

যেমন খৃষ্টান মিত্রেরা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টিত ছিলেন, মুসলমান ভাইয়েরাও তেমনি প্রযত্ন করিতেছিলেন। আবদুল্লা শেঠ আমাকে ইসলাম ধর্ম্ম পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে প্ররোচিত করিতেন। উহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাঁহারও অনেক কিছু বলার ছিল।

আমি আমার কঠিন অবস্থার কথা রায়চাঁদ ভাইকে জানাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতদের সঙ্গেও পত্র ব্যবহার করি। তাঁহাদের জবাবও পাই। রায়চাঁদ ভাইএর পত্রে কতকটা শান্তি পাই। তিনি আমাকে ধৈর্য্য রাখিতে ও হিন্দু ধর্ম্ম গভীর ভাবে অনুশীলন করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার একটা কথার ভাবার্থ এই প্রকার ছিল—

"হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে যে গূঢ় বিচার সমূহ আছে, আত্মার প্রতি যে দৃষ্টি রহিয়াছে, যে দয়া রহিয়াছে, তাহা অন্যে ধর্ম্মে নাই, অপক্ষপাতের সহিত বিচার করিয়া আমার ইহাই বিশ্বাস হইয়াছে।" আমি সেলের কোরাণের অনুবাদ ক্রয় করিয়া তাহা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অন্য পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বিলাতের খৃষ্টান মিত্রদিগের সহিত পত্র ব্যবহার চালাইলাম। তাঁহাদের মধ্যে একজন এডওয়ার্ড মেইটল্যাণ্ডর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার চলিল। তিনি এনা কিংগস্‌ফোর্ডের সহিত যুক্ত হইয়া 'পারফেক্ট ওয়ে' বা 'উত্তমমার্গ' নামক যে বই লিখিয়াছিলেন, তাহা আমাকে পড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের তাহাতে খণ্ডন আছে। "বাইবেলের নূতন অর্থ" নামক পুস্তকখানাও তাঁহারা আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। এই পুস্তকগুলি আমার ভাল লাগিল। উহা হইতে হিন্দু ধর্ম্মেরই সমর্থন পাইলাম। টলষ্টয়ের "বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়ে" পুস্তকখানা আমাক অভিভূত করিয়া ফেলিল। উহার ছাপ আমার হৃদয়ে গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল। এই পুস্তকের স্বাধীন চিন্তাধারা, ইহার গভীর নীতি, ইহার সত্যের তুলনায় মিঃ কোটস্‌ প্রদত্ত সমস্ত বহি শুষ্ক লাগিল।

এই ধরণের পাঠাভ্যাস আমাকে খৃষ্টান বন্ধুদিগের অনভীপ্সিত পথেই

লইয়া গেল। এডওয়ার্ড মেইটল্যাণ্ডের সাথে আমার পত্র ব্যবহার দীর্ঘ দিন চলিয়াছিল, কবি রায়চাঁদ ভাইয়ের সাথেও তাঁহার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত পত্র ব্যবহার চলে। তিনি কতকগুলি পুস্তক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি পড়িয়াছিলাম। এই গ্রন্থগুলির ভিতর, পঞ্চীকরণ, মণিরত্নমালা, যোগবাসিষ্ঠের 'মুমুক্ষু প্রকরণ', হরিভদ্র স্থরীর 'ষড়্দর্শন সমুচ্চয়' ইত্যাদি ছিল।

যদিও আমি খৃষ্টান মিত্রদিগের অপ্রত্যাশিত পথে চলিয়া গেলাম, তাহা হইলেও তাঁহাদের সহিত মিশিবার ফলে আমার ভিতরে যে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরঋণী থাকিব। তাহাদের সংস্পর্শের স্মৃতি সর্ব্বদাই আমার মনের ভিতর জাগরূক আছে। পরবর্ত্তীকালে এই মধুর সম্পর্ক বাড়িয়াই উঠিয়াছিল—কমে নাই।

১৬

কে জানে কাল কি হবে ?

পলের ঠিকানা নাই এই ভবে
বুঝ মন, কে জানে কাল কি হবে ?

মামলা শেষ হইয়া গেল, প্রিটোরিয়ায় থাকার আর প্রয়োজন রহিল না। আমি ডারবানে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে আসিয়া ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আবদুল্লা শেঠ আমাকে অভিনন্দিত না করিয়া ছাড়িয়া দিবেন না। তিনি সিডেনহামে আমার জন্য এক বিদায় পার্টি দিলেন।

আমার কাছে কতকগুলি সংবাদপত্র পড়িয়াছিল। সেগুলি আমি দেখিতেছিলাম। তাহার এক কোণে আমি ছোট একটা বিজ্ঞপ্তি দেখিলাম। শিরোনামা ছিল "ইণ্ডিয়ান ফ্রেঞ্চাইজ"—উহার অর্থ "ভারতীয়দের ভোটের অধিকার।" বিজ্ঞপ্তির মর্ম্ম এই যে, ভারতীয়দের নাতালের ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য মনোনয়ন করার যে অধিকার ছিল তাহা রদ করা। এই বিষয়ে বিল ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতেছিল। আমি এই বিলের কথা জানিতাম না। মজলিসে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহও এই অধিকার প্রত্যাহারের বিষয় কোনই খবর রাখিতেন না।

আমি আবদুল্লা শেঠকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলে—"এ সব খবর আমরা কি জানি ? যখন আমাদের ব্যবসার উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে, তখন আমরা জানিতে পারি। দেখুন না, অরেঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেটে

আমাদের ব্যবসার মূলেই কুঠারাঘাত করা হইল। উহার জন্য আমরা আন্দোলন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। খবরের কাগজ যাহা পড়ি সে কেবল বাজার দর দেখিবার জন্য। আইন-কানুনের কথা আমরা কি জানি ? আমাদের চোখ কান—আমাদের গোরা উকীল।

"কিন্তু এখানে জন্মিয়াছে ও ইংরাজী জানে এমন সকল যুবকেরা যদি ভারতবাসীদিগকে আপনার করিয়া লয় তবে কেমন হয় ?"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আরে ভাই", আবদুল্লা শেঠ কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, "তাহাদের কাছে কি পাত্তা পাওয়া যাইবে ? সে বেচারারা আমাদের কি বুঝিবে ? তাহারা আমাদের কাছ দিয়াও আসে না। সত্য বলিতে কি, আমরাও তাহাদের পরিচয় রাখি না। তাহারা খৃষ্টান বলিয়া গোরা পাদ্রীদের হাতের মুঠার মধ্যে। গোরা পাদরীরা আবার সরকারের তাঁবে আছে !"

আমার চোখ খুলিল। এই শ্রেণীকে আমাদের আপনার জন করিয়া লইতে হইবে। খৃষ্ট ধর্ম্মের কি এই অর্থ ? তাহারা খৃষ্টান বলিয়াই কি দেশ হইতে পৃথক ? তাহারা কি বিদেশী হইয়া গিয়াছে ?

কিন্তু আমি দেশে ফিরিতেছি, তাই উপরের চিন্তাধারা ব্যক্ত করিলাম না। আবদুল্লা শেঠকে বলিলাম :—

"কিন্তু এই আইন যদি কোন দিন পাস হয়, তাহা হইলে আপনাদের পক্ষে বড়ই কঠিন হইবে। ইহা ভারতীয়দের অস্তিত্ব নাশ করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ। ইহাতে আমাদের আত্মসম্মানেরও হানি আছে।"

"তাহা হইতে পারে। কিন্তু আপনাকে আমি এই ফ্রেঞ্চাইজের ইতিহাস বলি। আমরা ইহার কিছুই বুঝি না। আমাদের বড় উকীল

এস্‌কম্বকে আপনি জানেন। তিনি জবর লড়াইয়ে। তাঁহার এবং এখানকার ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে খুব লড়াই চলিতেছিল। মিঃ এস্‌কম্ব-এর ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ ব্যাপারও এই লড়াইএর মধ্যে আসিয়া পড়ে। এস্‌কম্ব আমাদিগকে আমাদের স্থিতির কথা বলেন। তাঁহার কথা মত আমাদের নাম আমরা ভোটের তালিকায় লিখিয়া দেওয়াই ও সমস্ত ভোট তাঁহার দিকেই দিই। আপনি ত দেখিতেই পাইতেছেন যে, এই অধিকারের মূল্য আপনি আজ যাহা দিতেছেন আমরা তাহা দিই নাই। কিন্তু আপনি এখন বলিতেছেন বলিয়া আমরা বুঝিতেছি। ভাল, আপনি এ বিষয় কি পরামর্শ দেন?”

অন্য আগন্তুকেরা এই কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—“আমি আপনাকে সত্য কথা বলিব? যদি আপনি এই ষ্টীমারে যাওয়া বন্ধ করেন ও মাসখানেক থাকেন তবে আপনি যেমন বলিবেন আমরা তেমনি ভাবেই লড়িতে পারি।”

অপর একজন বলিয়া উঠিলেন,—“ইহা সত্য কথা, আবদুল্লা শেঠ, আপনি গান্ধী ভাইকে আটকাইয়া রাখুন।”

আবদুল্লা শেঠ ওস্তাদ লোক। তিনি বলিলেন—“এখন উঁহাকে আটকাইবার আমার অধিকার নাই; অথবা আমারও যেমন আপনাদেরও তেমনি অধিকার আছে। কিন্তু আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক। আপনারা সকলে মিলিয়া উঁহাকে ঠেকাইয়া রাখুন। উনি ত ব্যারিষ্টার, উঁহার ফীর কি হইবে?”

ফীর কথায় আমি ব্যথিত হইলাম; আমি মাঝখানে বলিলাম—

“আবদুল্লা শেঠ, ইহাতে ফীর কথাই থাকিতে পারে না। জনসেবাতে ফী আবার কি? আমি যদি থাকিয়া যাই তবে এক সেবক

হিসাবেই থাকিয়া যাইতে পারি। এই ভাইদের সকলকে আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আপনারা যদি সকলে খাটিতে স্বীকার করেন, তবে আমি একমাস থাকিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। ইহাও ঠিক যে, যদিও আপনাদের আমাকে কিছু দিতে হইবে না, তথাপি এই কাজ কেবল বিনা পয়সায় হইবে না। আমাদের তার করিতে হইবে, অনেক কিছু ছাপাইতে হইবে। যাতায়াতের গাড়ীভাড়া লাগিবে। কখনো আমাদের স্থানীয় উকীলের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। আমি এখানকার আইন জানি না, অনুসন্ধানের জন্য আইন পুস্তক কিনিতে হইবে। আর একাজ এক হাতে হয় না। অনেকের আমাকে আসিয়া সাহায্য করিতে হইবে।"

এক সাথে অনেকে বলিয়া উঠিলেন—"ঈশ্বরের কৃপা আছে, পয়সা আসিয়া পড়িবে, লোকও আছে। আপনি থাকা স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইল।"

মজলিস উঠিয়া গিয়া কার্য্যকরী সমিতিতে পরিণত হইল। আমি খাওয়া দাওয়া শীঘ্র শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতে বলিলাম। লড়াইএর রূপ আমি মনে মনে আঁকিতেছিলাম। ভোট দিবার অধিকার কাহাদের আছে জানিয়া লইলাম। আমি একমাস থাকিয়া যাওয়া স্থির করিলাম।

এইভাবে ঈশ্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার স্থায়ীবাসের ভিত্তি স্থাপন করিলেন ও আত্মসম্মানের জন্য লড়াই করায় বীজ বপন করিলেন।

১৭
স্থিতি

১৮৯৩ সালে নাতালে শেঠ হাজি মহম্মদ হাজি দাদা ভারতবাসী-সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য নেতা ছিলেন। ধনাঢ্য হিসাবে শেঠ আবদুল্লা হাজি আদম প্রধান ছিলেন কিন্তু তিনি ও অন্যান্য সকলে জন-সেবার কাজে শেঠ হাজি মহম্মদকেই প্রথম স্থান দিতেন। সেই জন্য তাঁহার সভাপতিত্বে আবদুল্লা শেঠের বাড়ীতে এক সভা আহুত হইল। উহাতে ফ্রেঞ্চাইজ বিলের বিরুদ্ধতা করা স্থির হইল। স্বেচ্ছাসেবক ভর্ত্তি করা হইল। নাতালে যে ভারতীয়দের জন্ম হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতীয় খৃষ্টান যুবকদিগকে এই সভায় আহ্বান করা হইয়াছিল। মিঃ পল ডারবানে আদালতের দোভাষী এবং মিঃ সুভন গড্‌ফ্রে মিশন স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রভাব বশতঃ ঐ সম্প্রদায়ের অনেক যুবক সভায় আসিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইলেন। ব্যবসায়ীদেরও অনেকেই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন—শেঠ দাউদ মহম্মদ, মহম্মদ কাসম কমরুদ্দীন, শেঠ আদমজী মিঞা খাঁ, এ, কোলেন্দভেলু পিলে, সি, লক্ষীরাম, রঙ্গস্বামী পড়িয়াচি, এবং আমদ-জীভা। পার্শী রুস্তমজী ত ছিলেনই। কেরাণীদের মধ্য হইতে পার্শী মানেকজী, যোশী, নরসিংরাম প্রভৃতি দাদা আবদুল্লা ইত্যাদি বড় ব্যবসায়ীদের 'গদির লোক ছিলেন। জন-সাধারণের কাজে নিজে-দিগকে নিয়োজিত দেখিয়া ইঁহারা নিজেরাই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

কারণ এই প্রকার জন-সাধারণের কাজে নিমন্ত্রিত হওয়া ও অংশ গ্রহণ করা তাঁহাদের এই প্রথম। এই প্রথম দুঃখের সম্মুখে তাঁহারা উচ্চ-নীচ, ছোটবড়, মনিব চাকর, হিন্দু-মুসলমান পাশা খৃষ্টান গুজরাটী মাদ্রাজী সিন্ধী ইত্যাদি ভেদ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সকলেই ভারত সন্তান এবং সেবক এই ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিলের দ্বিতীয় শুনানী হইয়া গিয়াছিল, অথবা হওয়ার কথা। সেই সময়কার ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতায় এ প্রকার মন্তব্যও হইয়াছিল যে, এই প্রস্তাবিত আইন এত কঠিন হইলেও ভারতীয়দের পক্ষ হইতে কোনও বিরোধ হয় নাই এবং সেই জন্য তাহারা ভোটের অধিকার লাভের যে যোগ্য নয় তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

আমি অবস্থাটা সভায় বুঝাইয়া দিলাম। প্রথম কার্য্য ছিল ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিকে তার দিয়া জানানো যে, এই বিলের আলোচনা এখন যেন সভায় মুলতুবী রাখা হয়। এই রকম তার প্রধান মন্ত্রী সার জন রবিনসনকেও পাঠানো হইল। অন্য একখানা পাঠানো হইল—দাদা আবদুল্লার মিত্র হিসাবে মিঃ এসকম্বকে। এই তারের জবাব পাওয়া গেল যে, বিলের আলোচনা দুই দিন মুলতবী থাকিবে। সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

আবেদন লেখা হইল। তিনখানা লেখা দরকার ছিল। আর একখানা তৈরী করা হইল সংবাদ পত্রে দেওয়ার জন্য। যত পারা যায় স্বাক্ষর লওয়া আবশ্যক। এ সমস্ত কার্য্যই এক রাত্রে মধ্যে করিয়া ফেলা দরকার। শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকগণ ও আরও অনেকে সারা রাত জাগিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মিঃ আর্থার বলিয়া এক বুড়া ছিলেন, তাঁহার হস্তাক্ষর ভাল ছিল। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে আরজীর নকল

করিলেন। অপরে উহার অন্য নকল করিল। একজন বলেন, আর পাঁচজন লেখেন। এই ভাবে পাঁচখানা নকল এক সঙ্গেই হইল ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজ নিজ গাড়ী লইয়া অথবা গাড়ীভাড়া করিয়া স্বাক্ষর লইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

আরজী পাঠানো হইল। সংবাদপত্রে ছাপানো হইল। উহার সম্বন্ধে অনুকূল সমালোচনাও হইল। ইহার প্রভাব ব্যবস্থাপক সভায় বেশ ভাল হইল। সেখানেও আলোচনা যথেষ্ট হইল। বিপক্ষের লোকেরা আরজীতে দেওয়া হেতুগুলি অকাজের বলিয়া বর্ণনা করিলেন কিন্তু সে বলার মধ্যে জোর ছিল না। তবুও বিল পাস হইয়াই গেল।

বিল যে পাস হইবে ইহা সকলেই জানিত। কিন্তু এই আন্দোলন সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন জীবন আনিয়া দিল। সকলেই বুঝিলেন যে, ভারতীয় সম্প্রদায় মাত্র একটি এবং অবিভক্ত; যেমন বাণিজ্য অধিকারের জন্য লড়িতে হইবে তেমনি রাজনৈতিক অধিকারের জন্যও সকলকেই লড়িতে হইবে, উহাই সকলের ধর্ম্ম।

এই সময় লর্ড রিপন ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার নিকট একখানি বিরাট দরখাস্ত পাঠানো স্থির হইল। কাজটা সহজ ছিল না এবং একদিনেরও কাজ নহে। স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত হইল। কার্য্যসম্পন্ন করার জন্য সকলেই লাগিয়া গেলেন।

দরখাস্ত লিখিতে আমি খুব খাটিলাম। এই সম্বন্ধে যেখানে যে সাহিত্য আমি পাইয়াছিলাম তাহা পড়িয়া ফেলিলাম। আমরা ভারতবর্ষেও ভোটের একপ্রকার অধিকার পাইয়া থাকি এই সিদ্ধান্ত ও এখানে ভোটের অধিকারী ভারতীয় সংখ্যায় অধিক নহে এই ব্যবহারিক যুক্তি —এই দুই যুক্তিকে দরখাস্তের কেন্দ্রস্থানীয় করিয়া লওয়া হইল।

দরখাস্তে দশ হাজার স্বাক্ষর লওয়া হইয়াছিল। একপক্ষের মধ্যেই সমস্ত স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে নাতাল হইতে দশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করা পাঠকেরা একটা ছোটখাট কাজ মনে করিবেন না। সারা নাতাল হইতেই স্বাক্ষর লওয়া দরকার ছিল। এ কাজ করিতে লোকে অভ্যস্ত ছিল না। না বুঝিয়া যে সহি করিবে তাহার সহি লওয়া হইবে না—একথা পর্য্যন্ত স্থির করা হইয়াছিল। সেইজন্য উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক দ্বারাই সহি লওয়া চলিত। গ্রাম সকল দূরে দূরে ছিল। কেবল সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়া কাজ করিলেই এই প্রকার কাজ শীঘ্র নিষ্পন্ন হইতে পারে। তাহাই হইয়াছিল। ইহারা সকলেই উৎসাহপূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে শেঠ দাউদ মহম্মদ, পার্শী রুস্তমজী, আদমজী মিঞা খাঁ ও আমদ জীভানীর মূর্ত্তি এখনো আমার চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। দাউদ শেঠ সারা-দিন নিজের গাড়ী লইয়া ঘুরিতেন। কেহ হাতখরচাও ল'ন নাই।

দাদা আবদুল্লার বাড়ী ধর্ম্মশালা অথবা সরকারী আফিসের মত হইয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষিত ভাইয়েরা আমার কাছেই থাকিতেন। তাঁহাদের এবং অন্য কর্ম্মীদের খাওয়া দাদা আবদুল্লার ওখানেই হইত। সকলেরই খুব খরচ করিতে হইয়াছিল।

দরখাস্ত পাঠানো হইল। এক হাজার নকল ছাপানো হইয়াছিল। এই দরখাস্ত দ্বারা ভারতবর্ষের লোকেরা নাতালের প্রথম পরিচয় পাইলেন। যত সংবাদপত্রের ও জন-নায়কের নাম আমি জানিতাম, তাঁহাদের সকলের কাছেই দরখাস্তের নকল পাঠানো হইয়াছিল।

'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া' ইহার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছিল। সম্পাদক ভারতীয়দের দাবীর সমর্থন খুব জোরের সঙ্গেই করিয়াছিলেন।

বিলাতে এই দরখাস্তের নকল উভয় পক্ষের নেতাদের নিকটেই পাঠানো হইয়াছিল। উহাতে লণ্ডন টাইম্‌সের সমর্থন পাওয়া গেল। আশা হইল—বিলের মঞ্জুরী না-ও হইতে পারে।

এখন আমার নাতাল ছাড়ার উপায় ছিল না। লোকে আমাকে চারিদিক হইতে ধরিয়া ফেলিল ও নাতালে আমাকে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য অতিশয় আগ্রহ করিতে লাগিল। আমার অসুবিধার কথাগুলি জানাইলাম। আমি মনে মনে স্থির করিরাছিলাম যে, জন-সাধারণের খরচায় আমার থাকা হইবে না। ভিন্ন বাড়ী করার আবশ্যকতা দেখিলাম। কিন্তু ভাল পাড়ায় ভাল বাড়ী চাই।

আমি ইহাও ভাবিলাম যে, অন্য ব্যারিষ্টারেরা যেমন থাকে তেমন ভাবে থাকিলে সম্প্রদায়ের মান বাড়িবে। এই রকম বাড়ী রাখিয়া চলিতে বৎসরে ৩০০ পাউণ্ডের কমে চলে না। যদি সম্প্রদায় এই পরিমাণ অর্থ ওকালতী হইতে পাওয়াইয়া দেওয়ার কথা দিতে পারেন, তবে থাকা স্থির করিলাম ও সম্প্রদায়কেও তাহা জানাইলাম।

তাঁহারা বলিলেন—"ঐ প্রকার অর্থ যদি আপনি জন-সেবার কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য চা'ন, তবে তাহা আমরা দিতে পারিব, উহা উঠাইয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। ওকালতীতে যাহা পাইবেন তাহা আপনার থাকিবে।"

আমি বলিলাম—"সাধারণ সেবার কাজের মূল্য স্বরূপ আপনাদের নিকট হইতে টাকা ত আমি লইতে পারিব না। ও কার্য্যে আমার ওকালতী বুদ্ধি কিছু লাগিবে না। সুতরাং সেজন্য টাকাই বা লইব কেন? তাহা ছাড়া আপনাদের নিকট হইতে জন-সেবার কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে। যদি নিজের খরচ লই, তবে আপনাদের নিকট

হইতে বেশী টাকা লইতে আমার সঙ্কোচ হইবে, অবশেষে আটকাইয়া যাইব। সম্প্রদায়কে বৎসরে ৩০০ পাউণ্ডের বেশীই সাধারণ সেবায় খরচ করিতে হইবে।"

"আমরা ত আপনার পরিচয় পাইয়াছি। আপনি কি আপনার নিজের জন্য টাকা লইবেন? আপনাকে যদি আমরা এখানে রাখিতে চাই, তবে আপনার খরচের ভারও ত আমাদের লওয়া দরকার।"

"ইহা ত আপনাদের স্নেহ ও সাময়িক উৎসাহের কথা। এই স্নেহ ও এই উৎসাহ চিরকাল স্থায়ী থাকিবে একথা কেন মনে করেন? আমাকে হয়ত কোনও দিন আপনাদিগকেও শক্ত কথা শুনাইতে হইতে পারে। তখন আমি আপনাদের স্নেহ রাখিতে পারিব কিনা ঈশ্বর জানেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে, জন-সেবার জন্য আমার পয়সা লওয়া চলিবে না। আপনারা সকলে যদি আপনাদের ওকালতীর কাজ আমাকে দেওয়া স্থির করেন তবে তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ইহাও আপনাদের পক্ষে কঠিন হইতে পারে। আমি গোরা ব্যারিষ্টার নহি। কোর্ট আমাকে গ্রাহ্য করে কিনা কে জানে? আর আমি ওকালতীতে কেমন কাজের হইব তাহা ত আমি নিজেই জানি না। সুতরাং প্রথম হইতে আমাকে ওকালতীর ফী দেওয়াতেও আপনাদেরই বিপদ। তাহা সত্ত্বেও যদি আপনারা আমাকে ওকালতীর ফী দেন তবে তাহা কেবল আমার জন-সেবার পুরস্কার রূপে পাইতেছি বলিয়াই আমি গণ্য করিব।

আলোচনায় অবশেষে ইহাই ঠিক হইল যে, প্রায় কুড়ি জন ব্যবসায়ী আমাকে এক বৎসরের জন্য তাঁহাদের ওকালতী কার্য্যের

জন্য বাঁধা রাখিলেন। ইহা ছাড়া দাদা আবদুল্লা আমাকে বিদায় কালে যে উপহার দিতেছিলেন তাহার পরিবর্তে তিনি আমার গৃহসজ্জা দিলেন এবং আমি নাতালে রহিয়া গেলাম।

১৮
কালোর বাধা

আদালতের চিহ্ন—একটা নিক্তি একজন নিরপেক্ষপাতী অন্ধ জ্ঞানী বৃদ্ধা ধরিয়া রহিয়াছেন। বিধাতা তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়াই অন্ধ করিয়া দিয়াছেন, যেন তিনি বাহিরের চেহারা দেখিয়া বিচার না করেন, গুণ দেখিয়াই বিচার করেন। নাতালের উকীল সভা আমার বাহ্যিক চেহারা দেখিয়াই আমাকে ওকালতীতে প্রবেশাধিকার দিতে আপত্তি করিলেন। আদালত এই ব্যাপারে ন্যায়ের চিহ্ন অম্লান রাখিয়াছিলেন।

আমার ওকালতী সনদ লওয়া দরকার। আমার কাছে বোম্বাই হাইকোর্টের সার্টিফিকেট ছিল। বিলাতের সার্টিফিকেট বোম্বাই হাইকোর্টের দপ্তরে ছিল। প্রবেশ করার দরখাস্তে চরিত্র সম্বন্ধে দুইখানা সার্টিফিকেটও নিয়মমত আবশ্যক। এই সার্টিফিকেট গোরাদের নিকট হইতে লইলে ভাল হইবে বলিয়া আমি আবদুল্লা শেঠের পরিচয়ে আমার সম্বন্ধে দুই জন প্রসিদ্ধ গোরা ব্যবসায়ীর প্রমাণ-পত্র লইয়াছিলাম। দরখাস্ত কোনও উকীলের হাত দিয়া দিতে হয় এবং সাধারণতঃ এই ধরণের দরখাস্ত এটর্ণি জেনারেল বিনা ফীতেই লইতেন। মিঃ এসকম্ব এটর্ণি জেনারেল ছিলেন। তিনি যে আবদুল্লা শেঠের উকীল তাহা পাঠকেরা জানেন। তাঁহার সহিত আমি দেখা করিলাম এবং তিনি সানন্দে আমার দরখাস্ত দাখিল করিতে স্বীকার করিলেন।

ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে উকীল সভা হইতে আমি একখানা নোটিস পাইলাম। নোটিসে আমার ব্যারিষ্টার-দলভুক্ত হওয়ার বিরোধিতার কথা জানানো হইয়াছে। উহার এক কারণ দেখানো হইয়াছে যে, আমি যে দরখাস্ত করিয়াছি তাহার সহিত আদত সার্টিফিকেট সংলগ্ন করি নাই। বস্তুতঃ বিরুদ্ধতার কারণ ভিন্ন। সে কারণ হইতেছে এই যে, ওকালতী করার সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন কালে কালো কি হল্‌দে রংএর মানুষ দরখাস্ত করিবে সে কথাটা ভাবিয়া দেখা হয় নাই। গোরাদের দুঃসাহসিকতার জন্যই নাতাল দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই জন্য সেখানে গোরাদের প্রধান্য থাকা চাই। আমি কালো হইয়া যদি উকীল হইতে পারি, তবে ধীরে ধীরে গোরাদের প্রাধান্য যাইতে পারে এবং ঐ প্রাধান্য রক্ষার বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে—এই ছিল সত্যকার আশঙ্কা।

এই বিরুদ্ধতা করার জন্য উকীল সমাজ হইতে এক খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারকে রাখা হইয়াছে। এই উকীলেরও দাদা আবদুল্লার সহিত সম্বন্ধ ছিল। আমাকে তিনি শেঠকে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আমার সহিত খোলাখুলি ভাবেই কথা বলিলেন। তিনি আমার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম। পরে তিনি বলিলেন :—

"আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নাই। আমার ভয়, যে সকল ধূর্ত্ত এখানে জন্মিয়াছে আপনি যদি তাহাদের একজন হন! তাহার উপর আপনি আবার আপনার আসল সার্টিফিকেট দেন নাই। সেই জন্যই আমার সন্দেহ বাড়ে। এমন লোকও দেখা গিয়াছে যে, অপরের সার্টিফিকেট ব্যবহার করিয়াছে। আপনি গোরাদের নিকট হইতে যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন, আমার কাছে উহার কোনই মূল্য

নাই। তাহারা আপনার কথা কি জানে। আপনার সহিত তাহাদের কতটুকু পরিচয়?"

"এখানে ত আমার সকলেই অপরিচিত। আবদুল্লা শেঠও আমাকে এইখানেই দেখিয়াছেন।"—মাঝখানে আমি এই কথাগুলি বলিলাম।

"হাঁ, কিন্তু আপনিই ত বলিতেছেন তিনি আপনার দেশের লোক। আপনার পিতা দেওয়ান ছিলেন, একথা যদি সত্য হয় তবে আপনার পরিবারকে শেঠ আবদুল্লা নিশ্চয়ই জানেন। সেই রকম এফিডেভিট্ যদি আপনি জোগাড় করিতে পারেন তবে আমার কোনও আপত্তি থাকিবে না। আমি উকীল সভাকে লিখিয়া দিব যে, আমার পক্ষে তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয় লইয়া বিরোধ করা চলিবে না।"

আমার ক্রোধ হইল—কিন্তু আমি তাহা ব্যক্ত করিলাম না। যদি আমি আবদুল্লা শেঠের সার্টিফিকেট দিতাম তবে তাহা অগ্রাহ্য হইত, এবং তখন তাঁহারা গোরার সার্টিফিকেট চাহিতেন। আমার জন্মের সহিত আমার ওকালতীর যোগ্যতার কি সম্বন্ধ? আমি অসৎ অথবা কাঙাল মা-বাপের সন্তানই যদি হইয়া থাকি তাহা হইলেও আমার যোগ্যতার প্রশ্নে উহার স্থান কোথায়? কিন্তু ঐ সকল লইয়া তাঁহার সহিত কোনও বিচার না করিয়া জবাব দিলাম:—

"যদিও এ সকল অবস্থা জানার কোনও অধিকার উকীল সভার আছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না, তবুও আপনি চাহিতেছেন বলিয়া আমি ঐ প্রকার সার্টিফিকেটও পাঠাইতে প্রস্তুত আছি।"

আবদুল্লা শেঠের পরিচয় পত্র লইলাম ও তাহা সেই উকীলকে দিলাম। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু উকীল সভার

তাহাতে সন্তোষ হইল না। তাঁহারা আমার প্রবেশ লাভের বিরোধিতা আদালতের নিকট উপস্থিত করিলেন। আদালত মিঃ এসকম্বের উত্তর না শুনিয়াই বিরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। প্রধান জজ বলিলেন :—

"দরখাস্তকারী আদত সার্টিফিকেট দেন নাই—এই যুক্তি গ্রাহ্য নহে। যদি তিনি মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়া থাকেন তবে তাঁহার উপর মিথ্যা-ব্যবহারের জন্য ফৌজদারী করা যায়, তাঁহার ওকালতীতে প্রবেশ বাতিল করা যায়। আদালতের ধারায় সাদা-কালোর ভেদ নাই। মিঃ গান্ধীর ওকালতী করা আটকাইবার অধিকার আমাদের নাই। দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। মিঃ গান্ধী আপনি এক্ষণে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারেন।"

আমি দাঁড়াইলাম। রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা লইলাম। লওয়ার পর প্রধান জজ বলিলেন—"এখন আপনাকে আপনার পাগ্‌ড়ী খুলিতে হইবে। উকীল হিসাবে ওকালতীর উপযুক্ত পোষাক বিষয়ে আদালতের নিয়ম আপনাকে পালন করিতে হইবে।"

আমার সীমা আমি বুঝিলাম। ডারবানের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে যে পাগ্‌ড়ী পরায় আগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা এখানে বজায় রাখা চলিল না। অবশ্য এ আদেশের বিরুদ্ধেও যুক্তি ছিল। কিন্তু আমাকে ত বড় লড়াই লড়িতে হইবে। পাগ্‌ড়ী পরিয়া থাকার জেদ রাখিয়া আমার যুদ্ধ বিদ্যা আমি সমাপ্ত করিতে চাই না। উহা অপেক্ষাও বড় কাজ আছে।

আবদুল্লা শেঠ, ও অন্যান্য বন্ধুরা আমার নম্রতা (অথবা দুর্ব্বলতা) পছন্দ করিলেন না। তাঁহাদের মনে হইল যে, আমার উকীল হিসাবেও

পাগ্‌ড়ী পরার জেদ করাই উচিত ছিল। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। 'দেশ অনুযায়ী বেশ' এই প্রবচনের রহস্য বুঝাইলাম। ভারতবর্ষে যদি পাগ্‌ড়ী খুলিবার প্রথা গোরারা অথবা জজ করে, তবে তাহার বিরোধিতা করা যায়। নাতালের ন্যায় দেশে আদালতের এক কর্ম্মচারী হিসাবে আমার এই প্রকার বিরোধ করা শোভা পায় না। এই প্রকারের যুক্তি দিয়া আমি বন্ধুদিগকে কতক শান্ত করিলেও, আমার মনে হয় না আমি একথা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিয়াছিলাম যে, একই বস্তুকে বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা আবশ্যক। কিন্তু আমার জীবনে আগ্রহ ও অনাগ্রহ সাথে সাথেই চলিয়া আসিতেছে। সত্যাগ্রহতে ইহা অনিবার্য্য, এ সত্য আমি পরে অনেকবার অনুভব করিয়াছি। এই মিটমাটের প্রবৃত্তির জন্য আমি অনেকবার জীবনে ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছি ও মিত্রদিগের অসন্তোষের ভাজন হইয়াছি। কিন্তু সত্য বজ্র অপেক্ষাও কঠিন এবং কমল অপেক্ষাও কোমল।

উকীল সভার এই বিরোধ দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার বিজ্ঞাপনের কাজ করিয়াছিল। অনেক কাগজ আমার বিরুদ্ধে এ বিরোধ, উকীল-সভা ঈর্ষা-বশতঃ করিয়াছে বলিয়া আলোচনা করিয়াছিল। সুতরাং এই বিজ্ঞপ্তি হইতে আমার কাজ কতক অংশে সহজ হইয়া উঠে।

১৯

নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস

উকীলের কাজ করিব ইহা আমার পক্ষে গৌণ বস্তু হইয়াছিল এবং বরাবর গৌণই রহিয়া গিয়াছিল। আমার নাতালে স্থিতি সার্থক করার জন্য জন-সেবার কাজে আমার তন্ময় হওয়া আবশ্যক। ভারতীয়দিগের ভোটের অধিকার-বিরোধী আইনের সম্বন্ধে দরখাস্ত করিয়াই ত বসিয়া থাকা যায় না। ঐ বিষয়ে যদি চেষ্টা চলিতে থাকে, তবেই সংস্থা-সমূহের উপর উহার প্রভাব হইতে পারে। এইজন্য এক নূতন সংস্থার প্রতিষ্ঠা করার আবশ্যকতা দেখা গেল। আবদুল্লা শেঠের সহিত আলোচনা করিলাম এবং অন্য সঙ্গীদের সহিত একত্র হইয়া এক সাধারণ সংস্থা গঠন করা স্থির করিলাম। এই নূতন সংস্থার নামকরণ লইয়াও এক মহাসঙ্কট উপস্থিত হইল। এই সংস্থা কাহারও পক্ষপাতী হইবে না। কংগ্রেস নামটি বিলাতের কনজারভেটিভ দলের অর্থাৎ রক্ষণশীলদলের অপ্রীতিকর—ইহা আমি জানিতাম। কিন্তু কংগ্রেসই ভারতবর্ষের প্রাণ। তাহার শক্তি বাড়ানো চাই। ঐ নাম লুকানোতে অথবা ঐ নাম রাখিতে সঙ্কোচ করায় কাপুরুষতার গন্ধ আসে। এই বিষয়ে আমার যুক্তি দিয়া সংস্থাকে কংগ্রেস নাম দেওয়ার প্রস্তাব করিলাম ও ১৮৯৪ সালের মে মাসের ২২শে তারিখ 'নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের' জন্ম হইল।

দাদা আবদুল্লার গৃহ লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। সকলেই এই সংস্থাকে খুব উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন। নিয়মাবলী সাদাসিধা করা

হইয়াছিল। চাঁদা ভারি রকম ধরা হইয়াছিল। প্রতিমাসে কমপক্ষে পাঁচ শিলিং করিয়া না দিলে কেহ সভ্য হইতে পারিবে না। ধনী ব্যবসায়ী-দিগকে তাঁহারা যত বেশী দিতে পারেন তাহাই দিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। আবদুল্লা শেঠের নামে ধরা হইল প্রতিমাসে দুই পাউণ্ড। অন্য দুই জন বন্ধুও দুই পাউণ্ড হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইলেন। আমি নিজেও দেখিলাম যে, আমারও দিতে সঙ্কোচ করিলে চলিবে না। সেইজন্য প্রতিমাসে এক পাউণ্ড লিখাইলাম। ইহা ত আমার পক্ষে অনেকটা বীমা করার মত হইল। তবে আমি ভাবিলাম যে, যদি আমার খরচাই চালাইতে হয়, তবে আমার প্রতি মাসে এক পাউণ্ড দেওয়া বেশী নয়। ঈশ্বর আমার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার উপরে সভ্য না হইয়াও দান স্বরূপ যে যাহা দিতেন, লওয়া হইত।

কিন্তু কাজে নামিয়া দেখিলাম লোক না হইলে চাঁদা আদায় হয় না। যাঁহারা ডারবানের বাহিরে থাকেন তাঁহাদের নিকট বার বার যাওয়া সম্ভব ছিল না। প্রারম্ভিক উৎসাহের উপর নির্ভর করার দোষ শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। ডারবানে বারবার যাতায়াত করিলে টাকা আদায় হয়। আমি সেক্রেটারী ছিলাম। টাকা আদায় করার ভার আমার উপর ছিল। আমার ও আমার কেরাণীর প্রায় সমস্ত দিন চাঁদা সংগ্রহেই ব্যয় হইত। অবশেষে কেরাণীও আর পারিয়া উঠিল না। এই বার মনে হইল—চাঁদা মাসিক না হইয়া বার্ষিক হওয়া দরকার ও তাহা সকলেরই অগ্রিম দেওয়া চাই। সভা ডাকিলাম। সকলেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। কম করিয়া বার্ষিক তিন পাউণ্ড চাঁদা নির্দ্ধারিত হইল, ইহাতে আদায় করার কাজ সহজ হইল।

গোড়াতেই আমি শিখিয়া লইয়াছিলাম যে, জন-সেবার কার্য্য কর্জ্জ

করিয়া করা উচিত নয়। অন্য কার্য্যের বিষয়ে লোকের কড়ারে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু টাকা দেওয়ার কড়ারে বিশ্বাস করা যায় না। প্রতিশ্রুত টাকা দেওয়ার ধর্ম্ম লোক কোথাও পালন করে না। সুতরাং নাতালের ভারতবাসীদিগকেও এই সাধারণ নিয়ম হইতে অব্যাহতি দেওয়ার কারণ নাই। সেই হেতু "নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস" কখনও কর্জ্জ করিয়া কাজ চালায় নাই।

সভ্য সংগ্রহ করিতে আমার সহকর্ম্মীদের অসীম উৎসাহ ছিল। উহাতে তাঁহারা আনন্দ পাইতেন, তাঁহাদের অমূল্য অভিজ্ঞতাও লাভ হইত। অনেক লোক সন্তুষ্ট হইয়া নাম লিখাইতেন ও টাকা দিয়া দিতেন। মুস্কিল হইত কিছু দূর দূরান্তের গ্রামের কাজে। জন-সেবায় কাজ কি লোকে তাহা বুঝিত না। তথাপি অনেক দূরের জায়গার লোকও আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন ও স্থানীয় বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীরা অতিথিসৎকার করিতেন।

এই চাঁদা আদায়ে বাহির হইয়া একবার এক জায়গায় আমাদের মুস্কিল হইয়াছিল। সেখানে যাঁহার কাছে ছয় পাউণ্ড পাওয়ার কথা সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি তিন পাউণ্ডের বেশী দিতে চাহেন না। যদি তাহাই লওয়া যায় তবে অপরের নিকট হইতে বেশী পাওয়া যাইবে না। সেই বাড়ীতেই সকলে উঠিয়াছিলাম। আমরা সকলে অভুক্ত রহিলাম, বলিলাম—যদি চাঁদাই না পাওয়া যায় তবে খাই কেমন করিয়া ? তাঁহাকে অনেক মিনতি করিলাম। কিন্তু তাঁহার কথার নড়চড় নাই। গ্রামের অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও তাঁহাকে বুঝাইলেন। ধস্তাধস্তিতে সারারাত কাটিল। সকল সাথীরই ক্রোধ হইয়া গেল কিন্তু কেহই বিনয় ত্যাগ করিলেন না। অবশেষে প্রাতে এই ভাই-এর হৃদয় গলিল তিনি

ছ' পাউণ্ড দিলেন এবং আমাদিগকে ভোজ দিলেন। এই ঘটনা টোঙ্গাটে হয়। কিন্তু ইহার ধাক্কা উত্তর সীমায় ষ্টেঙ্গর ও ভিতরে চার্লস্-টাউন পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। আমাদের টাকা আদায়ের কাজ সহজ হইয়া গেল।

কিন্তু টাকা সংগ্রহ করাই একমাত্র কাজ ছিল না। বস্তুতঃ দরকার অপেক্ষা অধিক টাকা না রাখার তত্ত্ব আমি বুঝিয়া গিয়াছিলাম। প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতিমাসে দরকার অনুযায়ী সভা আহ্বান করা হইত। পূর্ব্বের অধিবেশনের বিবরণ পাঠ করা হইত ও নানাপ্রকার আলোচনা হইত। আলোচনা করিতে ও সংক্ষেপে সারাংশ বলিতে লোক তখনও অভ্যস্ত হয় নাই। তাহারা দাঁড়াইয়া বলিতে সঙ্কুচিত হইত। সভার নিয়ম সকলকে বুঝাইয়া দিলাম, তাঁহারা তাহা মানিয়া লইলেন। উহার সুবিধাও তাঁহারা দেখিতে পাইলেন এবং যাঁহাদের কখনো প্রকাশ্যে বলার অভ্যাস ছিল না তাঁহারাও সাধারণের বিষয়ে বলিতে ও বিচার করিতে শিখিলেন।

জনসাধারণের কাজে সামান্য সামান্য খরচায় অনেক টাকা লাগিয়া যায়, ইহা আমি জানিতাম। সেইজন্য আরম্ভ কালে আমি রসিদ-বহি পর্য্যন্ত না ছাপানোই স্থির করি। আমার আফিসে সাইক্লোষ্টাইল ছিল, তাহাতেই রসিদ ছাপাই। রিপোর্টও ঐ রকম করিয়াই ছাপাই। যখন ক্যাশে অনেক টাকা হইল, সভ্য সংখ্যা বাড়িল, কার্য্য বাড়িল, তখনই রসিদ ইত্যাদি ছাপানো হয়। ব্যয় সম্বন্ধে এইরূপ সতর্কতা প্রত্যেক সংস্থাতেই দরকার। তথাপি এই নিয়ম সাধারণতঃ পালন করা হয় না বলিয়াই আমি জানি। আর সেই জন্যই ছোট হইতে বর্দ্ধনশীল সংস্থার এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমি দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। লোকের রসিদের দরকার না থাকিলেও আগ্রহপূর্ব্বক

রসিদ দেওয়া হইত। এই জন্য হিসাব প্রথম হইতে কড়া-ক্রান্তিতে ঠিক থাকিত। আমার বিশ্বাস আজও নাতাল-কংগ্রেসের দপ্তরে ১৮৯৪ সালের সম্পূর্ণ খরচার খাতা পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক সংস্থার সূক্ষ্মভাবে রক্ষিত হিসাবই তাহার প্রাণ। উহা না থাকিলে সেই সংস্থা পরিণামে দুষিত ও প্রতিষ্ঠা-রহিত হইয়া যায়। শুদ্ধহিসাব ব্যতীত শুদ্ধ সত্যের রক্ষা করা সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের অন্যতম কার্য্য ছিল—আফ্রিকার যে সকল ভারতীয়ের জন্ম তাঁহাদের সেবা। সেই জন্য কংগ্রেস হইতে "কলোনিয়াল বর্ণ ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল এসোসিয়েশনের" স্থাপনা করা হয়। এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকেরাই প্রধানতঃ উহার সভ্য ছিলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে যে চাঁদা দিতে হইত তাহার পরিমাণ খুব সামান্যই ছিল। ইহাতে তাঁহাদের অসুবিধার কথা আলোচিত হইত, তাঁহাদের বিচার-শক্তি বাড়িত, ব্যবসায়ীদের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ বাড়িত, এবং তাঁহাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের সেবার সুযোগও মিলিত। এই সংস্থা আলোচনা-সভার মত ছিল। উহা হইতে নিয়মমত সভা হইত, বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা হইত, প্রবন্ধ পাঠ করা হইত। উহার সহিত সংশ্লিষ্ট একটী ছোট পাঠাগারও স্থাপন করা হইয়াছিল।

কংগ্রেসের তৃতীয় কার্য্য ছিল প্রচার। ইহাতে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরাজদের মধ্যে, এবং বাহিরে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে এখানকার সত্য অবস্থা জানাইবার চেষ্টা হইত। এইজন্য আমি দুই খানা পুস্তিকা লিখিয়াছিলাম। প্রথমখানা ছিল—"দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী প্রত্যেক ইংরাজের প্রতি নিবেদন"। উহাতে নাতালের ভারতীয়দিগের সাধারণ অবস্থার বৃত্তান্ত প্রমাণ সহিত দেওয়া হইয়াছিল। অন্যখানা ছিল—

"ভারতীয়দিগের ভোটের অধিকার সম্পর্কে একটি নিবেদন।" ইহাতে ভারতীয়দিগের ভোটের অধিকারের ইতিহাস, প্রমাণাদি সহ দেওয়া হইয়াছিল। এই দুই পুস্তিকা লেখার জন্য খুব খাটিতে হইয়াছিল ও খুব পড়িতে হইয়াছিল। তাহার ফল তখনই পাওয়া গিয়াছিল। উহার বহুল প্রচার হইয়াছিল। এই সকল প্রচেষ্টা দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা অনেক মিত্রলাভ করেন। ইলংণ্ডে ও ভারতবর্ষে সকল দল হইতেই সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের কাছে ইহা দ্বারা কার্য্য করার একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথও খুলিয়া গিয়াছিল।

২০

বালাসুন্দরম্

যাহার যেমন ভাবনা তাহার তেমন সিদ্ধি হয়—এই নিয়ম আমার প্রতি অনেকবার খাটিতে দেখিয়াছি। আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল যে দরিদ্রের সেবা করি এবং এই ইচ্ছাই আমাকে অনায়াসে সেবার জন্য দরিদ্র লোক জোটাইয়া দিয়াছে।

উপনিবেশ-জাত ভারতীয়েরা, এবং কেরাণীরা "নাতাল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের" সভ্য হইতে পারিলেও, মজুর ও গিরমিটিয়া শ্রেণীর লোক কংগ্রেসে ছিল না। কংগ্রেস তখনো তেমন হয় নাই। গরীবেরা কংগ্রেসের চাঁদা দিয়া কংগ্রেসের সভ্য হইয়া কংগ্রেসকে নিজের করিতে পারিত না। সুতরাং কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের মনকে আকৃষ্ট করিবার একটিমাত্র পথ ছিল—তাহাদের সেবার দায়িত্ব কংগ্রেসের গ্রহণ করা। এই রকম একটা ঘটনা, একটা সেবার ডাক, এমন সময় আসিল যখন কংগ্রেস অথবা আমি কেহই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তখন আমার দুই চার মাসের বেশী ওকালতী হয় নাই। কংগ্রেসেরও বাল্যাবস্থা ছিল। এই সময় একদিন এক মাদ্রাজী আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কাপড় ছেঁড়া, তাহার দেহ কাঁপিতেছে, মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে, সামনের দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে এই অবস্থায় পাগড়ী হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তার মালিক তাহাকে নিদারুণ মার মারিয়াছে। আমার তামিল-ভাষী কেরাণীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার অবস্থা জানিয়া লইলাম। বালাসুন্দরম্ এক

প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গোরার নিকট কাজ করিত। কোনও কারণে রাগ হওয়ায় মালিক জ্ঞানশূন্য হইয়া বালাসুন্দরম্‌কে গুরুতর প্রহার করিয়াছে। উহাতে বালাসুন্দরমের দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আমি তাহাকে ডাক্তারের নিকট পাঠাইলাম। তখন কেবল গোরা ডাক্তারই পাওয়া যাইত। বালাসুন্দরমের আঘাতের বিবরণের এক সার্টিফিকেটের আমার আবশ্যক ছিল। উহা লইয়া আমি বালাসুন্দরমকে সঙ্গে করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গেলাম। বালাসুন্দরমের এফিডেভিট দিলাম। উহা পড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মালিকের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিলেন ও মালিকের নামে সমন দেওয়ার হুকুম দিলেন।

মালিককে সাজা দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার দরকার ছিল—বালাসুন্দরমকে তাহার নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইয়া আসা। আমি গিরমিটিয়াদের সম্বন্ধে আইন খুঁজিয়া দেখিলাম। যদি কেহ চাকুরী ছাড়িয়া দেয়, তবে মনিব তাহার উপর দেওয়ানী দাবী করিতে পারে অথবা তাহাকে ফৌজদারীতে দিতে পারে। গিরমিট ও সাধারণ চাকুরীতে অনেক তফাৎ ছিল। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে এই যে, যদি গিরমিটিয়ারা চাকুরী ছাড়ে, তবে তাহা ফৌজদারী অপরাধ হয় এবং সেজন্য তাহাকে জেল খাটিতে হয়। এইজন্য সার উইলিয়াম উইলসন হাণ্টার ইহাকে একপ্রকার দাসত্বই বলিয়াছেন। দাসের মত গিরমিটিয়ারা মালিকের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য। বালাসুন্দরমকে ছাড়াইয়া আনার দুইটি পথ ছিল। এক হইতেছে—গিরমিটিয়াদের সম্পর্কিত আমলা অর্থাৎ আইনতঃ যে তাহাদের রক্ষক, সে যদি গিরমিট রদ করে অথবা অন্য কাহাকেও দান করে, দ্বিতীয় পথ হইতেছে—মালিক নিজে যদি ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক হয়। আমি মালিকের সহিত দেখা করিলাম।

মালিককে বলিলাম—আপনাকে আমার দণ্ড দেওয়াইবার ইচ্ছা নাই। ঐ লোকটীর আঘাত গুরুতর হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন। এক্ষণে আপনি যদি গিরমিট, অন্যের নামে দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। মালিক তৎক্ষণাৎ রাজি হইলেন। তাহার পরে আমি সেই রক্ষকের সহিত দেখা করিলাম। তিনিও সম্মত হইলেন। কিন্তু সর্ত্ত এই যে, বালাসুন্দরমের জন্য নূতন মালিক আমাকে খুঁজিয়া দিতে হইবে।

নূতন কোনও ইংরাজ মালিক এইবার আমার খোঁজ করার দরকার হইল। ভারতীয়েরা গিরমিটিয়া রাখিতে পারেন না। আর আমারও অল্পসংখ্যক ইংরাজের সঙ্গেই পরিচয় ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমার উপর কৃপা করিয়া বালাসুন্দরম্‌কে রাখিতে প্রস্তুত হইলেন। আমি তাঁহার এই উপকার কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট মালিকের দোষ সাব্যস্ত করিয়া গিরমিট অপরের নামে বদলাইয়া দেওয়ার স্বীকৃতি লিখিয়া লইলেন।

বালাসুন্দরমের মামলার পর আমাকে গিরমিটিয়ারা চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। আমাকে তাহাদের বন্ধু বলিয়া ধরিয়া লইল।। আমার ইহা ভালই লাগিল। আমার আফিস গিরমিটিয়াদের ভিড়ে ভরিয়া উঠিল, আর আমার পক্ষেও তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা জানার সুবিধা হইল।

বালাসুন্দরমের কেসের কথা মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত পঁহুছিল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যাহারা নাতালে গিরমিটিয়া হইয়া যাইত তাহারাও অন্য গিরমিটিয়াদের নিকট হইতে এই ঘটনা জানিয়া লইয়াছিল।

এই মামলায় বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। কিন্তু লোকের নিকট

ইহা নূতন লাগিল এইজন্য যে, তাহাদের জন্য প্রকাশ্যভাবে কাজ করিতে প্রস্তুত একজন লোকের দেখা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই তাহাদের মনে আনন্দ এবং আশা হইয়াছিল।

আমি উপরে জানাইয়াছি যে, বালাসুন্দরম্ নিজের পাগ্ড়ী হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার ভিতরে বড়ই করুণ কাহিনী রহিয়াছে। উহা আমাদের লজ্জার পরিচয়ে পূর্ণ। আমার পাগ্ড়ী খোলার কথা ত পাঠকেরা জানেন। গিরমিটিয়া অথবা কোন অজানা ভারতীয় যদি গোরার সম্মুখীন হয়, তবে তাহার সম্মানার্থে তাহাকে পাগ্ড়ী খুলিতে হইবে, কেবল পাগ্ড়ী নয়, টুপি হোক্, ফেটা হোক্ বা অন্য যাহাই হোক্ তাহাই খুলিতে হইবে। দুই হাতে সেলাম করাও যথেষ্ট নয়। বালাসুন্দরম্ ভাবিয়াছিল আমার সম্মুখেও তেমনি করিয়া আসিতে হইবে। এইরূপ দৃশ্য আমার চোখে এই প্রথম পড়িল। আমার লজ্জা হইল। আমি বালাসুন্দরম্‌কে ফেটা বাঁধিতে বলিলাম। সে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াই ফেটা বাঁধিল। তবে ফেটা বাঁধিতে যে তাহার আনন্দ হইয়াছিল তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। অপরকে অপমান করিয়া লোকে কেমন করিয়া নিজে মান পাইতেছে এইরূপ মনে করে, এ রহস্য আমি আজ পর্য্যন্তও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

২১

তিন পাউণ্ড কর

বালাসুন্দরমের ঘটনা দ্বারাই আমি গিরমিটিয়া ভারতীয়দের সহিত যোগযুক্ত হই। কিন্তু গিরমিটিয়াদের উপর স্থাপিত কর রদ করার জন্য যে আন্দোলন করি তাহাতেই তাহাদের অবস্থার সহিত আমার নিকটতম পরিচয় ঘটে।

১৮৯৪ সালে গিরমিটিয়া ভারতীয়দিগের উপর প্রতি বৎসর ২৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৭৫৲ টাকা কর ধার্য্য করার জন্য নাতাল গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাব পড়িয়া আমি স্তম্ভিত হই। আমি স্থানীয় কংগ্রেসের নিকট এই বিষয় উত্থাপন করি। কংগ্রেস ইহা লইয়া আন্দোলন করা স্থির করেন।

এই কর-স্থাপনার গোড়ার কথা বুঝা দরকার।

১৮৬০ সালে যখন নাতালে আঁখের চাষ ভাল হইতেছিল তখন সেখানকার বাসিন্দা গোরারা দেখিল যে তাহাদের মজুরের দরকার। মজুর না পাওয়া গেলে আঁখের চাষ হয় না, চিনি তৈরী করা চলে না। সেইজন্য নাতালবাসী গোরারা ভারত সরকারের সহিত চিঠিপত্র লিখিয়া ভারতীয় মজুর নাতালে লইয়া যাওয়ার জন্য অনুমতি লয়। স্থির হয়—তাহারা পাঁচ বৎসর মজুরী করার জন্য বাধ্য থাকিবে, ও পাঁচ বৎসর পরে স্বাধীনভাবে নাতালে বসবাস করিতে পারিবে। তাহারা জমির উপর সম্পূর্ণ মালিকী স্বত্ব কিনিয়া লইতে পারিবে। এই সকল লোভ দেখানো হইয়াছিল। সে সময় গোরারা

ভাবিয়াছিল যে, মজুরেরা যদি নিজেদের পাঁচ বৎসরের চুক্তি পূর্ণ করার পর সেখানে থাকিয়া চাষ করে তাহা হইলে তাহাতে নাতালের লাভই হইবে।

হিন্দু ভারতীয় মজুরেরা নাতালে আশাতিরিক্তভাবে লাভ করিতে লাগিল। তাহারা প্রচুর পরিমাণে শাক-সব্জী উৎপন্ন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষ হইতে কতক নূতন জাতের শাক-সব্জী তাহারা প্রবর্ত্তন করিল ও যে সব সব্জী সেখানে হইত তাহাও সস্তায় উৎপন্ন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষ হইতে আম লইয়া সেখানে প্রবর্ত্তন করিল। আবার ইহার সঙ্গেই তাহারা ব্যবসাও করিতে আরম্ভ করিল। বাড়ী করার জন্য জমি খরিদ করিয়া গিরমিট অন্তে তাহারা জমির মালিক হইয়া, গৃহস্থ হইয়া বসিয়া যাইতে লাগিল। মজুর হইয়া যে সকল লোক গিয়াছিল তাহাদের পশ্চাতে ব্যবসাদারেরাও যাইতে লাগিল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরলোকগত শেঠ আবুবকর আমদই সর্ব্বপ্রথম যান। তিনি নিজের ব্যবসা খুব জমাইয়া লইয়াছিলেন।

গোরা ব্যবসায়ীরা চমকিয়া উঠিল। যখন তাহারা ভারতীয় মজুরদিগকে আদর করিয়া লইয়াছিল, তখন ভারতীয়দের ব্যবসা-বুদ্ধির শক্তির খেয়াল তাহাদের ছিল না। গিরমিটিয়ারা কৃষক হিসাবে স্বাধীনভাবে যদি থাকে তাহাতে তখনও তাহাদের ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ভারতীয়েরা তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবেশ করিবে ইহা অসহ্য হইল।

ইহাই ভারতীয়দের সহিত বিরোধের মূল। তাহার পর আরও অন্য ঘটনার সংযোগ হয়। আমাদের ভিন্ন ধরণের জীবনযাত্রা,

আমাদের সাদাসিধা চলন, আমাদের অল্প লাভে সন্তোষ, স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের অবহেলা, ঘর-বাড়ী সাফ রাখিতে আমাদের আলস্য, বাড়ী-ঘর সংস্কার করিতে কৃপণতা, আমাদের ভিন্ন ধর্ম্ম—এ সমস্তই বিরোধ বাড়াইয়া দেওয়ার সাহায্য করে।

ভোট দিবার অধিকার উঠাইয়া দেওয়া ও গিরমিটিয়ার উপর মাথা হিসাবে কর ধার্য্য করার আইনের ভিতর দিয়া এই বিরোধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আইনের কথা ছাড়া বাহিরে নানা রকমে খোঁচা দেওয়াও আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

প্রথমতঃ প্রস্তাব হয় যে, গিরমিটিয়াদিগকে জবরদস্তি করিয়াই ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে যাহাতে গিরমিটের শেষকালটা তাহাদের ভারতবর্ষেই পূর্ণ হয়। এই প্রস্তাব ভারত সরকারের স্বীকার করার সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য অন্য একটি প্রস্তাব হয়। সে প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ—

১। মজুরীর চুক্তি পূর্ণ করিয়াই গিরমিটিয়ারা ভারতে ফিরিয়া যাইবে। অথবা

২। দুই দুই বৎসরের জন্য নূতন গিরমিট করিতে হইবে। প্রতি গিরমিটের সময় কেবল বেতন কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। এবং

৩। যদি ফিরিয়া না যায় ও যদি পুনরায় গিরমিটও না করে তবে প্রতি বৎসর মাথা প্রতি ২৫ পাউণ্ড কর দিতে হইবে।

ভারত সরকারকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইবার জন্য সার হেনরী বিনস্, ও মিঃ মেসনের ডিপুটেশন ভারতবর্ষে পাঠানো হয়। লর্ড এলগিন্ তখন ভাইসরয়। তিনি ২৫ পাউণ্ডের কর নামঞ্জুর করিলেও প্রত্যেক ভারতীয়ের নিকট হইতে ৩ পাউণ্ড কর লওয়ায় স্বীকৃত

হইলেন। আমার তখনও মনে হইয়াছিল, এখনও মনে হয় যে, ভাইসরয় এই সম্মতি দিয়া প্রকাণ্ড একটি ভুল করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের হিতের কথা ভাবেন নাই। নাতালের গোরাদের সুবিধার দিকে দেখিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহেন। তিন চার বৎসর পরেই এই কর সেখানকার ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে এবং তাহাদের প্রত্যেক ১৬ বৎসর বয়সের পুত্রের ও ১৩ বৎসর বয়স্কা কন্যার নিকট হইতে আদায় করা স্থির হয়। এই ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রী ও দুই ছেলে মেয়ে সহ চারিজনের একটি পরিবারের উপর বৎসরে ১২ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৯০৲ টাকা করের বোঝা চাপানো হয়। অথচ এই সময় স্বামীর উপার্জ্জন মাসিক গড়ে ১৪ শিলিং বেশী ছিল না। করের নামে এত বড় জুলুম দুনিয়ায় আর কোথাও গরীবের উপর অনুষ্ঠিত হয় না।

এই করের বিরুদ্ধে আমরা অত্যন্ত জোরের সহিত লড়াই আরম্ভ করিয়া দিলাম। যদি নাতাল-ইণ্ডিয়ান-কংগ্রেসের তরফ হইতে চেঁচামেচি না করা হইত, তবে ভাইসরয় হয়ত ২৫ পাউণ্ড করই মঞ্জুর করিতেন। ২৫ পাউণ্ড হইতে যে ৩ পাউণ্ড হয়, তাহার মূলে ছিল হয়ত কংগ্রেসেরই আন্দোলন। তবে আমার অনুমান ভুলও হইতে পারে। ভারত সরকার প্রথম হইতেই ২৫ পাউণ্ড অস্বীকার করিয়াছিলেন ও কংগ্রেস আন্দোলন না হইলেও হয়ত ৩ পাউণ্ডেই স্বীকৃত হইতেন। তাহা হইলেও ভারতবর্ষের যে ইহাতে অহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের হিতের রক্ষক হইলে এই অমানুষিক কর দেওয়ার ব্যবস্থায় ভাইসরয় কদাচ সম্মতি দিতে পারিতেন না।

২৫ পাউণ্ড হইতে ৩ পাউণ্ড (৩৭৫ টাকা হইতে ৪৫ টাকা) কর হওয়ায় কংগ্রেসের যে বিশেষ গৌরব বাড়িয়াছিল তাহা মনে হয় না।

কংগ্রেস যে ভারতীয়দের হিত-সাধন করিতে পারিল না, ইহা তাহার পরিতাপের বিষয় হইয়া রহিল। তিন পাউণ্ড কর উঠাইয়া যে দিতেই হইবে, কংগ্রেস এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কখনো ত্যাগ করে নাই। এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে ২০ বৎসর লাগিয়াছিল। তাহাতে কেবল নাতালের নয় সারা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দেরও যোগ দিতে হয়। গোখলে এই ব্যাপারের নিমিত্ত হইয়া পড়েন। ইহাতে গিরমিটিয়া ভারতীয়েরা পুরাপুরি যোগ দিয়াছিল। ইহার জন্য কত লোককে গুলি খাইয়া মরিতে হইয়াছে। দশহাজারের উপর লোককে জেল ভোগ করিতে হইয়াছে।

অবশেষে সত্যের জয় হয়। ভারতীয়দিগের তপশ্চর্য্যায় সত্য মূর্তিমন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার জন্য অখণ্ড শ্রদ্ধা, ধৈর্য্য ও সৎ-প্রবৃত্তির আবশ্যক হইয়াছিল। যদি সম্প্রদায় হার মানিয়া লড়াই করিতে বিরত হইত, যদি কংগ্রেস লড়াই পরিহার করিত ও এই কর অনিবার্য্য ধরিয়া লইত, তাহা হইলে এই কর আজ পর্য্যন্তও গিরমিটিয়া ভারতীয়দের নিকট হইতে লওয়া হইতে থাকিত এবং ইহা ভারতীয়-দিগের এবং সমস্ত ভারতবর্ষের অপমানের বিষয় হইয়া থাকিত।

২২
ধর্ম্ম নিরীক্ষণ

এই ভাবে আমি যে সম্প্রদায়ের সেবায় ওতঃপ্রোত হইয়া গিয়াছিলাম তাহার হেতু ছিল আমার আত্ম-দর্শনের অভিলাষ। ঈশ্বরের দর্শন সেবা দ্বারাই হইতে পারে, এই ধারণা করিয়া সেবা ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। ভারতীয়দিগের সেবা করিতাম, কেননা সেই সেবাই অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার নিকট সহজে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং ঐ ধরণের সেবা আমি করিতেও জানিতাম। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিলাম বেড়াইতে, কাথিয়াওয়াড়ের চক্রান্ত হইতে মুক্তি পাইতে, এবং জীবিকা উপার্জ্জন করিতে। কিন্তু এখানে আসিয়া ঈশ্বরের অনুসন্ধানে অথবা আত্মদর্শন করার প্রযত্নে আমি ডুবিয়া গেলাম। খৃষ্টান ভাইয়েরা ধর্ম্ম কি তাহা জানার ইচ্ছা আমার ভিতর তীব্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই জিজ্ঞাসা কি করিয়া মিটে তাহা জানিতাম না, আর যদিই বা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে চাহিতাম তথাপি যে খৃষ্টান ভাই-ভগ্নীরা ছিলেন তাঁহারা শান্ত হইতে দিতেন না। ডারবানে মিঃ স্পেনসর ওয়াল্‌টন ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার মিশনের প্রধান, তিনি আমাকে খুঁজিয়া লইলেন। আমি তাঁহার একপ্রকার পরিবারভুক্তই হইয়া গেলাম। এই সকলের মূলে ছিল প্রিটোরিয়ার মেলামেশা। মিঃ ওয়াল্‌টনের একটি নিজস্ব ধরণ ছিল। তিনি আমাকে খৃষ্টান হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি নিজের জীবন আমার সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া-

ছিলেন, নিজের কর্ম্মপ্রচেষ্টা আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী অতিশয় নম্র ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন।

এই দম্পতির ভাব আমার ভাল লাগিত। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদ আছে তাহা আমরা উভয়েই জানিতাম। এই ভেদ আলোচনা করিয়া দূর করার মত নহে। যেখানে উদারতা সহিষ্ণুতা ও সত্য রহিয়াছে, সেখানে ভেদ লাভ-দায়কই হইয়া পড়ে। এই দম্পতির নম্রতা, কর্ম্মোত্তম, কার্য্যে আত্মসমর্পণ আমার ভাল লাগিত।

ইঁহাদের সংস্পর্শ আমাকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিল। ধর্ম্মগ্রন্থাদি পড়ার যে অবকাশ আমার প্রিটোরিয়াতে ছিল, তাহা এখন পাওয়ার সম্ভব ছিল না। কিন্তু যেটুকু সময় পাইতাম তাহা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ার জন্য দিতাম। আমার পত্র-ব্যবহার চলিতেছিল। রায়চাঁদভাই আমাকে পরিচালনা করিতেছিলেন। কোনও বন্ধু আমাকে নর্ম্মদাশঙ্করের 'ধর্ম্ম-বিচার' পুস্তক পাঠান। তাহার প্রস্তাবনা হইতে আমি খুব সাহায্য পাই। নর্ম্মদাশঙ্করের বিলাসময় জীবনের কথা আমি শুনিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তনের কথা প্রস্তাবনায় পড়িয়া আকৃষ্ট হই এবং সেই হইতে এই পুস্তকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়। আমি উহা মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িয়া গেলাম। ম্যাক্সমুলারের 'হিন্দুস্থান কি শিখাইতে পারে" নামক পুস্তকখানি পড়িয়া খুব আনন্দ পাইয়াছিলাম। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রকাশিত উপনিষদের ভাষান্তর সমূহও পড়িয়াছিলাম। আম্যর হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব বাড়িয়া গেল। উহার সৌন্দর্য্য আমি বুঝিতে লাগিলাম। কিন্তু অন্য ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হইল না। ওয়াশিংটন আরভিং কৃত মহম্মদ চরিত্র ও কার্লাইলের মহম্মদ

স্তুতি পড়িলাম। পয়গম্বরের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িল। 'জরথুস্ত্রর বচন' নামক পুস্তকও পড়িলাম।

এই ভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার অল্প-বিস্তর জ্ঞান হইল, আত্ম-নিরীক্ষণ বাড়িল। পড়িয়া যাহা পছন্দ হয় তাহা কার্য্যে পরিণত করার অভ্যাস বাড়িল। এইজন্যই হিন্দু-ধর্ম্ম পুস্তক হইতে প্রাণায়াম বিষয়ে কতকগুলি ক্রিয়া যতটা বহি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহা করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিলাম না। ভারতবর্ষে ফিরিয়া কোন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে উহা করিব বলিয়া তখন স্থির করিয়াছিলাম। সে আশা এখনো পূর্ণ হয় নাই।

টলষ্টয়ের পুস্তকগুলি সব পড়িয়া ফেলিলাম। তাঁহার 'গস্পেল ইন ব্রীফ্', 'হোয়াট্ টু ডু' ইত্যাদি পুস্তক আমার হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলিয়াছিল। বিশ্বপ্রেম কতদূর পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে তাহা আমি ক্রমশঃই বেশী করিয়া বুঝিতে লাগিলাম।

এই সময় অন্য একটি খৃষ্টান পরিবারের সংস্পর্শে আসি। তাঁহাদের ইচ্ছায় আমি প্রতি রবিবারে ওয়েস্লিয়ান্ গির্জ্জায় যাইতাম। প্রায় প্রতি রবিবারেই সন্ধ্যায় তাঁহাদের বাড়ীতে ভোজন করিতে হইত। ওয়েস্লিয়ান্ গির্জ্জায় আমার ভাল লাগে নাই। সেখানকার প্রবচন আমার নিকট শুষ্ক লাগিত। প্রেক্ষকদিগের ভিতরে আমি ভক্তিভাব দেখি নাই। দেউলে সমাগত জনমণ্ডল আমার নিকট ভক্ত-সঙ্ঘ বলিয়া মনে হইত না। কতকটা খেলাচ্ছলে, কতকটা নিয়ম পালনের জন্য, কতকগুলি সাংসারিক জীবের সমাগম বলিয়া মনে হইয়াছিল। কখন কখন এই সভায় আমার অনিচ্ছিতাতেই তন্দ্রা আসিত। আমার লজ্জা হইল। কিন্তু আমার আশেপাশের অন্য লোককেও ঝিমাইতে

দেখিয়া এই লজ্জা-বোধ আমার আবার তখনই কমিয়া যাইত। এ অবস্থা আমার ভাল লাগিত না। অবশেষে আমি গির্জ্জায় যাওয়া ছাড়িয়া দিলাম।

যে পরিবারে আমি প্রতি রবিবার যাইতাম, সেখানে যাইতে শেষে একরকম নিষেধ করাই হইয়াছিল বলা যায়। গৃহিণী সরল সাদাসিধা হইলেও খানিকটা সঙ্কীর্ণ-মনা ছিলেন। তাঁহার সহিত সব সময়েই কোন-না-কোনও ধর্ম্ম-চর্চ্চা হইতই। সেই সময় আমি "লাইট অফ এসিয়া" বইখানা পড়িতেছিলাম। আমরা যিশু ও বুদ্ধের জীবনের তুলনামূলক বিচার করিতে লাগিলাম।

"দেখুন না গৌতমের দয়া। সে দয়া মানুষ জাতিকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য সকল প্রাণী পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। তাঁহার কাঁধের উপর ছাগল ছানাটা তুলিয়া লইয়াছেন, আর সে খেলিতেছে এই দৃশ্যের কথা চিন্তা করিয়া আপনার হৃদয়ে কি প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না? প্রাণী-মাত্রের প্রতি এই প্রেম আমি যিশুর জীবনে দেখিতে পাই না।"

ভগ্নীর দুঃখ হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম। ঐ আলোচনা আর বাড়াইলাম না। আমরা খাওয়ার ঘরে গেলাম। তাঁহার বছর পাঁচেকের এক ছেলে আমার সঙ্গে ছিল। এই ছেলেটির মুখখানা হাসি হাসি ছিল। আমি যদি ছেলেপেলে পাই তবে আর কি চাই? উহার সহিত আমি বন্ধুত্ব করিয়া লইলাম। আমি তাহার প্লেটে দেওয়া মাংসের টুকরাকে তুচ্ছ করিয়া আমার প্লেটের আপেলের প্রশংসা করিতেছিলাম। অজ্ঞান বালক আমার কথায় মজিয়া গেল ও আপেলের প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিন্তু মা? সে বেচারীর ভয় হইল।

আমি সাবধান হইলাম, চুপ করিলাম। কথার বিষয় বদলাইলাম। পরের রবিবারে আমি সাবধান হইয়াই সেখানে গেলাম বটে, কিন্তু আমার পা চলিতেছিল না। তবু সেখানে যাওয়া বন্ধ করা দরকার বোধ করিলাম না, বরং না যাওয়াই অনুচিত হইবে বলিয়া মনে হইল। কিন্তু মহিলাটিই আমার অসুবিধা দূর করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"মিঃ গান্ধী, আপনি মনে কিছু করিবেন না। কিন্তু আমার বলা দরকার যে, আপনার সঙ্গ আমার ছেলের উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এখন রোজ সে মাংস খাইতে অস্বীকার করে ও আপনার আলোচনার কথা মনে করিয়া ফল খাইতে চায়। ইহা ত আমার চলে না। ছেলে যদি মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দেয়, তবে অসুখে না পড়িলেও দুর্ব্বল হইবেই তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিব। আপনার কথাবার্ত্তা আমাদের সঙ্গেই বলা ভাল। ছেলেদের উপর উহার প্রভাব খারাপ হয়।

"মিসেস্······আমি দুঃখিত হইতেছি। আপনার মায়ের বুকের ব্যথা আমি বুঝিতে পারি। আমারও ছেলে আছে। এই অসুবিধা সহজেই শেষ করা যায়। আমি কি বলি তাহার যে প্রভাব না হইবে, কি খাই, কি না খাই তাহার প্রভাব তাহা অপেক্ষা বেশী হইবে। সেই জন্য রবিবারে আপনার এখানে না আসাই সব চাইতে ভাল। আশা করি, আমাদের মিত্রতায় ইহাতে কোন বাধা পড়িবে না।"

মহিলাটি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আপনি বাধিত করিলেন।"

২৩

গৃহস্বামী

বিলাতে ও বোম্বাইতে যে বাড়ী করিয়া বসিয়াছিলাম নাতালের গৃহস্থপনা তাহা হইতে অন্য রকমের ছিল। নাতালে কতকগুলি ব্যয় কেবল লোক দেখানোর জন্যই করিতে হইত। নাতালে ভারতীয় ব্যারিষ্টার হিসাবে, ভারতবাসীদিগের প্রতিনিধি হিসাবে আমার রীতিমত খরচ করা দরকার বলিয়া মনে হইত। সেইজন্য ভাল পাড়ায় ভাল বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলাম। ঘরের আসবাব-পত্রও ভাল রকমই করা হইয়াছিল। খাওয়া দাওয়া সাদাসিধা ধরণের ছিল, কিন্তু ইংরাজ মিত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিতাম, ভারতীয় সাথীদিগকেও নিমন্ত্রণ করিতাম, সেইজন্য স্বভাবতঃই খরচা বেশী হইত। তখন চাকরের বড় অসুবিধা বোধ হয়, কিন্তু কাহাকেও চাকর করিয়া রাখার মত বুদ্ধি আমার ছিল না।

এক বন্ধুকে সঙ্গীরূপে রাখিয়াছিলাম আর একজন পাচক ছিল। আফিসে যাঁহারা মুহুরীর কাজ করিতেন তাঁহারাও কেহ কেহ আমার গৃহেই থাকিতেন।

এই পরীক্ষা ভালই উতরাইয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতে আমি সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতাও পাইয়াছিলাম।

আমার এই সঙ্গীটি খুব কার্য্যদক্ষ ও আমার মতে বিশ্বাসী লোক ছিল। কিন্তু আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই। আফিসের যে সব মুহুরীকে বাড়ীতে রাখিয়াছিলাম তাহাদের একজনের উপর তাহার হিংসা হয়। সে এ রকম কৌশল-জাল রচনা করিল, যাহাতে এই

মুহুরীটির উপর আমি সন্দিহান হইয়া পড়ি। এ মুহুরীটি বড়ই স্বাধীন স্বভাবের লোক ছিলেন, তিনি বাড়ী ও আফিস দুই-ই ত্যাগ করিলেন। আমার দুঃখ হইল। ভাবিতাম—"তাঁহার উপর অন্যায় করা হয় নাই ত?"

ইতিমধ্যে আমি যে পাচককে রাখিয়াছিলাম কোনও কারণে তাহাকে অন্যত্র যাইতে হয়। তাহার বদলে অন্য পাচক রাখা হইল। পরে দেখিলাম যে, এই পাচক উড়ুক্কু ধরণের লোক। কিন্তু তাহা হইলেও সে আমার উপকারই করিয়াছিল। এই পাচক আসার দুই তিন দিন পরেই সে দেখিতে পায় যে, আমার বাড়ীতে আমার অজ্ঞাতে কিছু কিছু কলুষিত ব্যাপার ঘটে। দেখিয়া সে আমাকে সাবধান করা স্থির করে। বিশ্বাসপরায়ণ কিন্তু খাঁটি লোক বলিয়া দশজন আমাকে জানিত। সেই জন্য আমার গৃহে যে পাপ চলিতেছিল তাহা তাহার নিকট ভয়ানক বলিয়া মনে হয়।

আমি দুপুরের খাওয়ার জন্য বেলা একটার সময় বাড়ী আসিতাম। এক দিন প্রায় বারোটার সময় এই পাচক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—"যদি বিস্ময়কর কিছু দেখিতে হয় তবে তাড়াতাড়ি বাড়ী আসুন।"

আমি বলিলাম,—"তার মানে? কি কাজ আছে আমাকে খুলিয়া বল। আমাকে এমন করিয়া বাড়ী লইয়া তুমি কি দেখাইতে চাও?"

পাচক বলিল—"যদি না আসেন তবে পস্তাইবেন, ইহার বেশী আমি আপনাকে আর কিছু বলিতে পারিব না।"

তাহার দৃঢ়তার আমি আকৃষ্ট হইলাম। আমার মুহুরীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিলাম। পাচক আগে আগে চলিল। সে দোতালার উপর গেল। যে কামরায় আমার সেই সঙ্গীটি থাকিত তাহা দেখাইয়া বলিল—"এই কামরা খুলিয়া দেখুন।"

কি এই পাচকের মত সাহস ছিল? সঙ্গীটির উপর আমার অহেতুক বিশ্বাসের কথা অপর সকলেই জানিত।

এই ভাবে আমার উপকার করিয়া সেই পাচক সেইদিনই, সেদিন কেন, তখনই বিদায় চাহিল। সে কহিল—"আমি আপনার বাড়ীতে থাকিতে পারিব না। আপনি ভোলা মানুষ। এখানে থাকা আমার কর্ম্ম নয়।"

আমিও আগ্রহ করিলাম না।

এখন আমি জানিলাম যে, এই লোকটাই মুহুরীর সম্পর্কেও আমার মনে অযথা সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিল। মুহুরীর প্রতি আমি যে অবিচার করিয়াছিলাম তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি কখনো তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই। উহা আমার নিকট বরাবরই একটা দুঃখের বিষয় রহিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গা বাসন যতই সারানো হোক্ না কেন তাহা মেরামতী বাসনই হয়, তাহা আস্ত বাসন কদাপি হয় না।

২৪

দেশাভিমুখে

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার তিন বৎসর কাটিয়া গেল। আমি সকল লোক চিনিয়াছি, লোকেরাও আমাকে চিনিয়াছে। ১৮৯৬ সালে ছয় মাসের জন্য দেশে আসার অনুমতি চাহিলাম। কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাকে দীর্ঘ দিন থাকিতে হইবে। আমার ওকালতী ভালই চলিতেছিল বলা যায়। জন-সেবার কার্য্যে আমার উপস্থিতির আবশ্যকতা লোকেও বুঝিতে পারিয়াছিল। এইবার দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি পরিবার সহিত থাকাই স্থির করিলাম। সুতরাং দেশ হইতে একবার ঘুরিয়া আসাও সঙ্গত বলিয়া মনে হইল। ইহাও দেখিলাম যে, যদি দেশে যাই তবে সেখানেও জন-সেবার কাজ করিতে পারিব। দেশে লোকমত শিক্ষিত করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নে তাহাদেরও চিত্ত আকর্ষণ করা যাইতে পারে। তিন পাউণ্ডের কর যেন গলিত ক্ষতের ন্যায় হইয়াছিল। যতদিন তাহা না উঠিতেছে ততদিন শান্তি নাই।

কিন্তু আমি যদি দেশে যাই তবে, কংগ্রেসের ও শিক্ষা-মণ্ডলের কাজ কে চালায়? দুই জন সঙ্গীর উপর দৃষ্টি পড়িল—আদমজী মিঞা খান এবং পার্শী রস্তমজী। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভিতরেও কতকগুলি কাজের লোক ছিল। কিন্তু যাহারা সম্পাদকের কার্য্য করিতে পারিবে, নিয়মিতভাবে কাজ করিয়া যাইতে পারিবে, ও

উপনিবেশ-জাত ভারতীয়দের মন হরণ করিতে পারিবে এমন লোকের মধ্যে উক্ত দুইজনই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া গণ্য করা যায়। সম্পাদকের ইংরাজী ভাষায় সামান্য জ্ঞান থাকাও দরকার। এই দুইজনের মধ্য হইতে পরলোকগত আদমজী মিঞা খানকে সম্পাদকের পদ দেওয়ার জন্য কংগ্রেসকে জানাইলাম এবং কংগ্রেসও তাহা অনুমোদন করিলেন। পরে দেখা গিয়াছিল যে, এই নির্ব্বাচন খুব ভাল হইয়াছিল। কর্ম্মনিষ্ঠা উদারতা মিষ্ট স্বভাব ও ভদ্রতা দ্বারা শেঠ আদমজী মিঞা খান সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন এবং সকলের এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের সেক্রেটারীর কার্য্য করার জন্য উকীল ব্যারিষ্টার কি খুব ইংরাজী জানা লোকের আবশ্যক নাই।

১৮৯৬ সালের মধ্যভাগে আমি দেশে যাওয়ার জন্য 'পঙ্গোলা' ষ্টীমারে উঠিলাম। এই ষ্টীমার কলিকাতাগামী ছিল।

ষ্টীমারে অনেক যাত্রী ছিল। দুইজন ইংরাজ সরকারী আমলা ছিলেন। একজনের সহিত প্রতিদিন এক ঘণ্টা সতরঞ্চ খেলা হইত। ষ্টীমারের ডাক্তার আমাকে একখানা "তামিল শিক্ষক" বই দেন। আমি উহা পাঠাভ্যাস আরম্ভ করি।

নাতালে দেখিয়াছিলাম যে, মুসলমানদের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইলে উর্দ্দু শিক্ষা করা দরকার। তেমনি মাদ্রাজীদের সহিত মিশিতে হইলেও তামিল জানা আবশ্যক।

উর্দ্দু শিক্ষার জন্য সেই ইংরাজ মিত্রের অনুরোধে ডেকের যাত্রীদের মধ্য হইতে বেশ এক মুন্সী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের উর্দ্দু শিক্ষা ভালই চলিতেছিল। ইংরাজ আমলাটি স্মরণ

শক্তিতে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। উর্দ্দু অক্ষর পড়িতে আমার কষ্ট হইত, কিন্তু তিনি একবার শব্দ দেখিলে আর ভুলিতেন না। আমি পরিশ্রম করা বাড়াইয়া দিলাম কিন্তু তাঁহার সমান হইতে পারিলাম না।

তামিল অভ্যাসও ভালই চলিতে লাগিল। উহাতে কাহারও সাহায্য পাই নাই। পুস্তকখানা এমন ভাবেই লেখা যে সাহায্যের বিশেষ আবশ্যক করে না।

আমার আশা ছিল যে, এই পাঠাভ্যাস যে আরম্ভ করা গেল দেশে পঁহুছিয়াও তাহা বজায় রাখিতে পারিব। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৯৩ সালের পর হইতে আমার পড়া ও আয়ত্ব করার কাজ প্রধানতঃ জেলেই হইয়াছে। এই উভয় ভাষায় জ্ঞান আমি কিঞ্চিৎ বাড়াইয়াছিলাম কিন্তু তাহা জেলে গিয়াই হইয়াছিল—দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে তামিল, আর উর্দ্দু যারভডা জেলে। তাহা হইলেও তামিল ভাষা কখনো বলিতে শিখি নাই। পড়িতে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহাও চর্চ্চার অভাবে ভুলিয়া যাইতেছি। এই ভাষাজ্ঞানের অভাব আমাকে পীড়া দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় মাদ্রাজীদের নিকট হইতে আমি অপর্য্যাপ্ত প্রেমামৃত পান করিয়াছি। সর্ব্বদাই তাহা আমার স্মরণে আছে। তাহাদের শ্রদ্ধা, তাহাদের কর্ম্মচেষ্টা, তাহাদের মধ্যে অনেকের নিঃস্বার্থ ত্যাগের কথা এখনও কোন তামিল বা তেলুগু বন্ধু দেখিল তখনই আমার মনে হয়। উহারা প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিল, এবং পুরুষ ও স্ত্রী সমানে আমার সহিত কর্ম্মে যোগ দিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার লড়াই নিরক্ষর-দিগের জন্য করা হইয়াছিল, আর যোদ্ধাও নিরক্ষরেরাই ছিল। সে যুদ্ধ যেমন গরীবদের জন্য, যুদ্ধও করিয়াছিল তেমনি গরীবেরাই।

এই সকল সরল ও সৎস্বভাব ভাই ভগ্নীদের চিত্ত চুরি করিতে আমার ভাষাজ্ঞানের অভাব কখনো অন্তরায় হয় নাই। তাহারা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী, ভাঙ্গা ইংরাজীতে কথা বলে, তাহাতেই আমাদের কাজ চলিয়া যায়। আমি এই প্রেমের প্রতিদানের জন্য তামিল ও তেলুগু শিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তামিল কতকটা শিখিয়াছিলাম; তেলুগু শিক্ষার চেষ্টাও ভারতবর্ষে করিয়াছিলাম। কিন্তু 'কখ'-র উপর আর উঠিতে পারি নাই।

আমি তামিল তেলুগু শিখিতে পারি নাই—পারার আশাও আর রাখি না; সেইজন্য আশা করি যে দ্রাবিড় ভাষা ভাষীরা হিন্দী শিক্ষা করিবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্রাবীড়-মাদ্রাজীরা অল্পবিস্তর হিন্দী বলিতে পারে। মুস্কিল হইতেছে—যাহারা ইংরাজী জানে তাহাদের লইয়া। কে জানে কেন ইংরাজীর জ্ঞান আমাদের নিজেদের ভাষা জ্ঞানের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া থাকে।

কিন্তু বিষয়ান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার ভ্রমণ কথা শেষ করিতে হইবে। পাঠকদের কাছে এখনও 'পঙ্গোলা' জাহাজের কাপ্তানের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। আমাদের ভিতর মিত্রতা হইয়াছিল। এই মহোদয় ব্যক্তিটি 'প্লাইমাউথ ব্রাদার' সম্প্রদায়ের। সেইজন্য নৌবিদ্যার আলোচনা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিদ্যার কথাই আমাদের মধ্যে অধিক হইত। তিনি নীতি ও ধর্ম্ম-শ্রদ্ধা—এই দুই ভিন্ন বলিয়া দেখিতেন। তাঁহার কাছে বাইবেল শিক্ষা ছেলেখেলার মত ছিল। তাঁহার সৌন্দর্য্য ছিল তাঁহার সরল বিশ্বাসে। তিনি বলিতেন—বালক, স্ত্রী, পুরুষ, সকলে যেন যিশুতে ও তাঁহার বলিদানে শ্রদ্ধা রাখে, তাহা হইলেই তাহাদের পাপ ধৌত হইয়া যাইবে। এই 'প্লাইমাউথ ব্রাদার' টি প্রিটোরিয়ার প্লাইমাউথ ব্রাদারটির

স্মৃতি আবার নূতন করিয়া ঝালাইয়া তুলিল। যে ধর্ম্মে নৈতিক বাধা-নিষেধ আছে তাহা তাঁহার কাছে নীরস লাগে। এই মিত্রতা ও অধ্যাত্মিক আলোচনার মূলে ছিল আমার নিরামিষ আহার। আমি কেন মাংস খাই না, গোমাংসে কি দোষ, ঈশ্বর যেমন বৃক্ষ ও শাক-সব্জী মানুষের আনন্দ ও আহারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, পশু পক্ষীও কি তেমনি সেই জন্যই সৃষ্টি করেন নাই? এই প্রশ্নমালা আধ্যাত্মিক আলোচনায় পরিণত না হইয়া যায় না।

আমরা একে অপরকে বুঝাইতে পারি নাই। আমি আমার এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় ছিলাম যে, ধর্ম্ম ও নীতি একই বস্তু। কাপ্তেনেরও তাঁহার নিজের মতের সত্যতার সম্বন্ধে অনুমাত্রও সন্দেহ ছিল না।

চব্বিশ দিন পরে এই আনন্দদায়ক ভ্রমণ শেষ করিয়া আমি হুগলীর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় নামিলাম। সেই দিনই বোম্বাই যাওয়ার টিকিট করিলাম।

২৫

ভারতবর্ষ

কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে প্রয়াগ রাস্তায় পড়ে। এখানে ট্রেণ ৪৫ মিনিট থামে। এই অবকাশে আমি সহরে একবার চক্কর দিয়া আসিব স্থির করিলাম। ডাক্তারখানা হইতে আমার ঔষধ কেনারও দরকার ছিল। কেমিষ্ট ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিল, তারপর ঔষধ তৈয়ারী করিতে অনেক সময় লইল। আমি ষ্টেশনে পঁহুছিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ষ্টেশন মাষ্টার আমার জন্য এক মিনিট গাড়ী অপেক্ষা করাইয়াও আমাকে না দেখিয়া আমার জিনিষগুলি নামাইয়া লইয়াছিলেন।

আমি কেলনারের হোটেলে একটা কামরা লইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। এই স্থানের 'পায়োনিয়ার' পত্রের খ্যাতি আমি শুনিয়াছিলাম। ঐ পত্রিকা যে প্রজার আকাঙ্ক্ষার বিরোধ করিত আমি তাহা জানিতাম। আমার মনে হয় সে সময় মিঃ চেজ্‌নী (জুনিয়ার) উহার সম্পাদক ছিলেন। আমার সঙ্কল্প ছিল যে, সকল পক্ষের সঙ্গেই দেখা করিয়া সকলেরই সাহায্য গ্রহণ করিব। আমি তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া দেখা করার অভিপ্রায় জানাইলাম, ট্রেণ ফেল করার কথা লিখিলাম ও পরদিন দুপুরেই চলিয়া যাইব জানাইলাম। জবাবে তিনি আমাকে শীঘ্রই দেখা করিতে বলিলেন। আমি সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। আমি এ বিষয়ে যাহা লিখিব তিনি তাঁহার কাগজে সে সম্বন্ধে

কিছু নোট্ করিবেন জানাইয়া বলিলেন—"কিন্তু আপনার সকল দাবী স্বীকার করিতে পারিব, একথা বলিতে পারি না। ঔপনিবেশিকদিগের দিকটাও ত আমাকে দেখিতে হইবে।"

আমি উত্তর দিলাম—"আপনি যদি এ প্রশ্নটা তলাইয়া দেখেন ও আলোচনা করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। আমি শুদ্ধ ন্যায় ছাড়া আর কিছুই চাই না।"

বাকী দিনটা ত্রিবেণীর রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া ও আমার হাতে যে কাজ আছে তাহার চিন্তায় কাটাইয়া দিলাম। এই আকস্মিক সাক্ষাৎ দ্বারা পরে নাতালে আমার উপর যে আক্রমণ হইয়াছিল তাহারই বীজ রোপণ করিলাম।

বোম্বাইয়ে না থামিয়া সরাসরি রাজকোট গেলাম ও সেখানে এক পুস্তিকা লিখিলাম। পুস্তিকা লিখিতে ও ছাপাইতে মাসখানেক গেল। ইহার সবুজ রংএর মলাট ছিল। সেই জন্য ইহা পরে 'সবুজ পুঁথি' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহাতে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুরবস্থার কথা ইচ্ছা করিয়াই কম করিয়া লিখিয়াছিলাম। নাতালে আমি যে পুস্তিকা প্রকাশ করার কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহার ভাষা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাপেক্ষা নরম রাখিয়াছিলাম। কেননা আমি জানিতাম, ছোট দুঃখও দূর হইতে দেখিতে বড় বলিয়া দেখায়। 'সবুজ পুঁথি' দশহাজার ছাপাইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সংবাদপত্রের নিকট ও বিভিন্ন দলের নেতাদিগের নিকট বিতরণ করিয়াছিলাম। পায়োনিয়ারেই ইহা সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক কর্তৃক আলোচিত হয়। উহার টেলিগ্রাম বিলাতে যায় এবং তাহার খবর আবার টেলিগ্রামে রয়টার কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হয়। এই তার মাত্র তিন লাইনের ছিল।

তাহাতে নাতালে ভারতীয়দের উপর যে ব্যবহার করা হয় সেই সম্বন্ধে আমার বর্ণনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল। আমি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলাম তারের খবর সে ভাষায় ছিল না। উহার যে ফল হইয়াছিল তাহা ভবিষ্যতে দেখিতে পাইব। আস্তে আস্তে সকল সংবাদপত্রেই এই প্রশ্নের আলোচনা হইয়াছিল।

এই পুস্তিকা ডাকে দেওয়ার মত করিয়া মুড়িয়া ফেলা, এক মুস্কিলের ব্যাপার হইল। কেননা সেজন্য যদি পয়সা খরচ করি তবে তাহাতে অনেক পয়সা খরচ হয়। সহজ করার এক যুক্তি বাহির করিলাম। পাড়ার ছেলেদিগকে ডাকিয়া বলিলাম যে, যেদিন স্কুল না থাকে সেইদিন সকালে দুই তিন ঘণ্টা করিয়া খাটিয়া এগুলি তাহাদের তৈরী করিয়া দিতে হইবে। ছেলেরা খুসী হইয়া এই সেবা করিতে স্বীকার করিল। আমার দিক হইতে আমি তাহাদিগকে আমার পুরানো টিকিটের সংগ্রহ যাহা ছিল তাহা দিব ও আশীর্ব্বাদ দিব বলিয়া স্বীকার করিলাম। ছেলেরা খেলাচ্ছলে আমার কাজ উঠাইয়া দিল। ছেলেদিগকে স্বেচ্ছা-সেবক তৈরী করার এই আমার প্রথম পরীক্ষা। এই ছেলেদের ভিতর দুইজন আজ আমার সহকর্ম্মী।

এই সময়ে বোম্বাইয়ে প্রথমবার মড়ক দেখা দিল। চারিদিকে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। রাজকোটেও মড়ক দেখা দেওয়ার ভয় ছিল। আমার মনে হইল যে, আমি স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করিতে পারি। আমি ষ্টেটকে আমার সেবা লওয়ার জন্য লিখিলাম। ষ্টেট-কমিটী গঠিত হইল, ও আমাকেও তাহার ভিতরে গ্রহণ করা হইল। পায়খানার পরিচ্ছন্নতা দেখার ভার আমি লইলাম ও কমিটীকে গলিতে গলিতে লইয়া পায়খানা পরীক্ষা করিব স্থির করিলাম। গরীব লোকেরা

নিজেদের পায়খানা দেখিতে দিতে কোনও আপত্তি করিল না। কেবল তাহাই নয়, যে সংস্কার সাধন করিতে বলা হইয়াছে তাহাও কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু যখন আমরা বড় লোকদের বাড়ীর পায়খানা দেখিতে বাহির হইলাম তখন কোন কোন যায়গায় পায়খানা দেখিতেই অনুমতি পাই নাই, সংস্কার ত দূরের কথা। আমার সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, ধনীদিগের পায়খানা বড়ই কদর্য্য। সেগুলি অন্ধকার, দুর্গন্ধ এবং অশেষ ক্লেদপূর্ণ—শিঁড়ির উপর কীট থিক্ থিক্ করিতে থাকে। ইহা ব্যবহার করা মানে, প্রতিদিন জীবন্ত নরকে প্রবেশ করা। আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কার খুব সাদাসিধা ছিল—মাটিতে মল পড়িতে না দিয়া বাল্‌তি ব্যবহার করা; জল মাটিতেই শুষিতে না দিয়া বাল্‌তি জমিতে দেওয়া; বসিবার স্থান ও মেথর আসার রাস্তার মধ্যে যে দেওয়াল আছে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা। যাহাতে মেথর উপর নীচ সমান সাফ্ করিতে পারে ও পায়খানা বড় হয় ও তাহাতে হাওয়া ও আলো প্রবেশ করিতে পারে। বড়লোকেরা এই সংস্কার করিতে নানা বাধা উপস্থিত করিলেন এবং অবশেষে উহা করাই হইল না।

কমিটিকে 'ঢেড়বাড়া' বা অস্পৃশ্যদের বস্তিতেও যাইতে হয়। সেখানে সভ্যেরা যাইবেন, তারপর আবার পায়খানাও পরিদর্শন করিবেন, ইহা তাঁহাদের কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইল, কমিটীর সভ্যদের মধ্যে মাত্র একজনই আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। আমি কিন্তু 'ঢেড়বাড়াতে' গিয়া আনন্দিত ও আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমি জীবনে প্রথম এই অঞ্চলে আসিলাম। ঢেড় ভাই বহিনেরা আমাদিগকে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমরা যখন পায়খানা দেখিতে চাহিলাম তখন তাহারা বলিল—

"আমাদের এখানে পায়খানা কোথায়? আমাদের পায়খানা জঙ্গলে। পায়খানা আপনাদের মত বড় মানুষদের জন্য।"

"তাহা হইলে তোমাদের ঘর ত আমাদিগকে দেখিতে দিবে?"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আসুন না ভাই সাহেব, আপনাদের যদি ইচ্ছা হয় তবে দেখুন, আমাদের আবার ঘর!"

আমি ভিতরে গেলাম। ঘর ও আঙ্গিনার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া খুসী হইলাম। ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার লেপা রহিয়াছে দেখিলাম। আঙ্গিনা, ঘরের ভিতর এবং যে কিছু বাসন ছিল সমস্ত সাফ্—ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

সেখানে মড়কের ভয় নাই বলিয়া মনে হইল।

একটা বাড়ীর পায়খানার সম্বন্ধে না লিখিয়া পারা যায় না। প্রত্যেক ঘরে নর্দ্দমা ত ছিলই, তাহা দিয়া জলও যায় প্রস্রাবও যায়। সেইজন্য ঘরে দুর্গন্ধ না হইয়া যায় না। এক বাড়ীতে শোয়ার ঘরে নর্দ্দমা ও পায়খানা দুই-ই দেখা গেল। এখানে মল নল দিয়া নীচে গড়াইয়া পড়ে। এই ঘরে তিষ্ঠিবার যো ছিল না। সেই গৃহস্বামী কি করিয়া যে শুইতেন তাহা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন।

কমিটি বৈষ্ণব হাবেলীতেও গিয়াছিল। হাবেলীর প্রধানের সহিত গান্ধী পরিবারের খুব ভাল সম্বন্ধ ছিল। হাবেলীর প্রধান মহাশয় আমাদিগকে দেখিতে দিতে, সম্ভব হইলে সংস্কার সাধন করিতেও স্বীকৃত হইলেন। হাবেলীতে একটা অংশ ছিল যাহা তিনি নিজে কখনো দেখেন নাই। এই জায়গায় হাবেলীর ভুক্তাবিশিষ্ট ও পাতা সকল দেওয়ালের উপর দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলা হয়। সেইজন্য স্থানটি কাক-চিলের ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছিল।

পায়খানা ত কদর্য্য ছিলই। প্রধান মহাশয় কতটা সংস্কার করিয়াছিলেন, তাহা আর আমার দেখা হয় নাই।

হাবেলীতে এই নোংরা দেখিয়া মনে দুঃখ হইল। যে হাবেলীকে আমরা পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য করি সেখানে স্বাস্থ্যের নিয়ম খুবই প্রতিপালিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্মৃতিকারেরা যে বাহ্যাভ্যন্তর শুচির উপর খুবই জোর দিয়াছেন, সে কথা তখনও আমি জানিতাম।

২৬
রাজভক্তি ও শুশ্রূষা

যে প্রকার শুদ্ধ রাজভক্তি আমি আমার ভিতরে অনুভব করিতেছিলাম, অন্য কাহাকেও সেরূপ করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সত্যের উপর আমার যে স্বাভাবিক নিষ্ঠা আছে, সেইখানেই আমার রাজভক্তিরও মূল—ইহা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। রাজভক্তি অথবা অন্য কোনও বস্তুর ভান করা আমার দ্বারা কখনো হয় নাই। নাতালে আমি যে কোনও সভায় যাইতাম সেখানে তখন 'গড্ সেভ্ দি কিং' গীত হইত দেখিতাম, আমার মনে হইত যে এ গানে আমারও যোগ দেওয়া দরকার। বৃটিশ রাজনীতির দোষ আমি তখনও জানিতাম, তাহা হইলেও মোটের উপর আমার ভালই লাগিত। তখন আমি মনে করিতাম যে, বৃটিশ আমলাতন্ত্র ও আমলারা মোটের উপর প্রজার পোষক।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি বিপরীত নীতি দেখিতাম, বর্ণ-বিদ্বেষ দেখিতাম, কিন্তু মনে করিতাম যে, উহা সাময়িক ও স্থানবিশেষে বদ্ধ। সেইজন্য রাজভক্তিতে আমি ইংরাজদের সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে ইচ্ছা করিতাম। সেই হেতু ইংরাজের রাষ্ট্র-গীতি "গড্ সেভ্ দি কিং" আমি শিখিয়া লইয়াছিলাম। উহা সভায় গীত হইলে আমার সুরও উহাতে মিলাইতাম, এবং যে যে স্থানে রাজভক্তি দেখানোর আবশ্যক বিনা আড়ম্বরে দেখাইতাম।

আমি কখনো আমার জীবনে এই রাজভক্তি স্বার্থের জন্য ব্যবহার

করি নাই। উহা হইতে কোন প্রকারে লাভবান হওয়ার ধারণা আমার কোনও দিন হয় নাই। রাজ-অনুরক্তিকে ঋণ মনে করিয়া আমি সর্ব্বদাই তাহা শোধ দিয়া আসিয়াছি।

যখন ভারতবর্ষে আসিলাম তখন রাণীর ডায়মণ্ড জুবিলীর জন্য প্রস্তুত হওয়া আরম্ভ হইয়াছে। রাজকোটেও এক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। তাহাতে আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। আমি নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলাম। কমিটির কার্য্যে দম্ভের স্পর্শ আছে বলিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল। আমি দেখিলাম যে, লোক দেখানোর জন্য সমস্ত আয়োজন হইতেছে। দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। সমিতিতে থাকিব কিনা এই প্রশ্ন আমার নিকট উপস্থিত হইল। অবশেষে আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে স্থির করিলাম।

'বৃক্ষরোপণ' করার এক প্রস্তাব ছিল। ইহার ভিতরেও আমি দম্ভ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম—বৃক্ষরোপণ কেবল সাহেবদিগের সন্তোষের জন্যই করা হইতেছে। আমি লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, বৃক্ষরোপণ করিতে কেহ বাধ্য নহেন, উহা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। যদি রোপণ করিতে হয় তবে হৃদয়ের সহিত করিবেন, নচেৎ আদৌ করা উচিত নয়। আমার স্মরণ আছে যে, এরূপ বলাতে লোকে আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। আমার বৃক্ষরোপণ কার্য্য আমি রীতিমতই করিয়াছিলাম এবং বৃক্ষটির যত্ন লইয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে।

পরিবারের বালকদিগকে 'গড্ সেভ্ দি কিং' শিখাইতাম। ট্রেইনিং কলেজের ছাত্রদিগকেও শিখাইয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। কিন্তু উহা সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময়, না জুবিলীর সময় তাহা মনে

নাই। পরে এই গান গাহিতে আমার খট্‌কা লাগিত। অহিংসা সম্বন্ধে আমার ধারণা যতই স্পষ্ট হইতে লাগিল, আমার বাক্য ও চিন্তা সম্বন্ধে আমি ততই সতর্ক হইতে লাগিলাম। এই গানে এই দুই লাইন আছে :—

"ছিন্ন কর গো শত্রুরে তার—কর তাহাদেরে নাশ,
ব্যর্থ করগো তাদের বুদ্ধি—শয়তানী অভিলাষ।"

ইহা গান করিতে আমার খট্‌কা লাগিল। আমার মিত্র ডাক্তার বুথকে আমার মুস্কিলের কথা বলিলাম। তিনি স্বীকার করিলেন যে, অহিংস মানুষের ইহা গান করা শোভা পায় না। শত্রু হইলেই যে শয়তান হইবে এ কথা কি করিয়া বলা যায়? শত্রু হইলেই যে খারাপ—ইহাই বা কি করিয়া স্বীকার করা যায়? ঈশ্বরের নিকট ত কেবলমাত্র ন্যায়ই যাচ্‌ঞা করা যায়। ডাঃ বুথও এই যুক্তি স্বীকার করিলেন। তাঁহার নিজের সমাজে গাওয়ার জন্য নূতন গীত রচনা করিলেন। এই ডাক্তার বুথের সহিত বিশেষ পরিচয় পরে হইবে।

অনুরক্তির ন্যায় শুশ্রূষাও আমার একটা স্বভাব-লব্ধ গুণ। রোগী নিজের লোকই হোক্, কি পরই হোক্, তাহাকে শুশ্রূষা করিতে ভাল লাগে, একথা বলিতে পারি। রাজকোটে থাকিয়া যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ করিতেছিলাম সেই সময় একবার বোম্বাই ঘুরিয়া আসিলাম। প্রধান প্রধান সহরগুলিতে সভা আহ্বান করিয়া লোক-মত গঠন করিতে ইচ্ছা ছিল। এইজন্যই গিয়াছিলাম। প্রথমতঃ জজ রাণাডের সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন ও আমাকে সার ফিরোজশা মেহ্‌তার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। তাহার পর আমি জষ্টিস্ বদরুদ্দীন

তৈয়বজীর সহিত দেখা করিলাম। তিনিও আমার কথা শুনিয়া সেই পরামর্শই দিলেন। তিনি বলিলেন—জষ্টিস্ রাণাডে অথবা আমার, আপনাকে এ বিষয়ে পরিচালিত করিবার শক্তি খুব বেশী নাই। আপনি ত আমাদের অবস্থা জানেন। প্রকাশ্যভাবে ইহাতে আমরা যোগ দিতে পারি না। কিন্তু আপনার কার্য্যের প্রতি আমার সহানুভূতি রহিয়াছে। সত্যকার পরিচালক হইতে পারেন সার ফিরোজশা।"

সার ফিরোজশার সহিত দেখা করিতামই। কিন্তু এই দুই গুরুজনের নিকট হইতেও তাহারই পরামর্শ অনুযায়ী চলার উপদেশ শুনিয়া ফিরোজশার লোক-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইল।

ফিরোজশার সহিত দেখা করিলাম। আমি তাঁহার দ্বারা অভিভূত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তাঁহাকে যে সকল আখ্যা দেওয়া হয় তাহা আমি শুনিয়াছিলাম। সুতরাং আমি জানিতাম —এইবার "বোম্বাইয়ের সিংহ", "বোম্বাইয়ের মুকুটহীন বাদসাহের" সহিত আমাকে দেখা করিতে হইবে। কিন্তু বাদশাহ আমাকে ভড়্কাইয়া দিলেন না। পিতা যুবক পুত্রকে যে প্রেমের সহিত গ্রহণ করেন, তিনিও সেইরূপ প্রেমের সঙ্গেই আমাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চেম্বারে তাঁহার সহিত আমাকে দেখা করিতে বলিলেন। তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তী বন্ধুগণ দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। সেখানে ওয়াচা ছিলেন, কামা ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ওয়াচার নাম আমি শুনিয়াছিলাম। তাঁহাকে ফিরোজশা'র দক্ষিণ হাত বলিয়া গণ্য করা হইত। বীরচন্দ গান্ধী তাঁহাকে অঙ্ক-শাস্ত্রী—'ষ্ট্যাটিস্‌টিসিয়ান্' বলিয়া আমার

নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন। ওয়াচা বলিলেন—"গান্ধী আমাদের আবার দেখা হইবে"।

এ সমস্তই দুই মিনিটের মধ্যে হইয়া গেল। সার ফিরোজশা আমার কথা শুনিয়া লইয়াছিলেন। জষ্টিস্ রাণাডে ও তৈয়বজীর সহিত যে আমি দেখা করিয়াছিলাম তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। "গান্ধী, তোমার জন্য আমাকে জন-সাধারণের সভা আহ্বান করিতে হইবে। তোমাকে সাহায্য করিতে হইবে।" তারপর মুন্সীর দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে সভার দিন স্থির করিতে বলিলেন। দিন ঠিক করিয়া আমাকে বিদায় সম্ভাষণ করিলেন এবং সভার পূর্ব্ব দিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। আমি নির্ভয় হইয়া ও মনের আনন্দে বাড়ী ফিরিলাম।

বোম্বাইএ, আমার যে ভগ্নীপতি ছিলেন এই সময় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার ব্যারাম হইয়াছিল এবং তাঁহার আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। ভগ্নী তাঁহাকে একা শুশ্রূষা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। পীড়া গুরুতর ছিল, আমি তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে আসিতে বলিলাম। তাঁহারা সম্মত হইলেন। ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে লইয়া রাজকোটে আসিলাম। আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম, ব্যারাম তদপেক্ষা গুরুতর ছিল। আমি তাঁহাকে আমার ঘরেই রাখিলাম। সারাদিন তাঁহার কাছে থাকিতাম। রাত্রেও জাগিতে হইত। তাঁহার সেবাকালেও আমি দক্ষিণ আফ্রিকার কার্য্যই করিতেছিলাম। ভগ্নীপতির স্বর্গলাভ হইল। কিন্তু তাঁহার সেবা করার অবকাশ যে আমি পাইয়াছিলাম, সেজন্য আমার মনে যথেষ্ট তৃপ্তি আসিয়াছিল।

রাজভক্তি ও শুশ্রূষা

শুশ্রূষা করার আমার এই আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃই বিশাল আকার ধারণ করে অবশেষে উহা এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, শুশ্রূষার জন্য অনেক সময় আমি কাজকেও উপেক্ষা করিয়াছি, স্ত্রীকে এমন কি সমস্ত পরিবারকেও উহাতে নিযুক্ত করিয়াছি।

এই সেবাবৃত্তির ভিতর যখন আনন্দ না থাকে তখন ইহার কোনই সার্থকতা নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে ইহার আকর্ষণ স্থায়ীও হইতে পারে না। খাতিরে পড়িয়া অথবা লোক দেখানোর জন্য অথবা লজ্জার ভয়ে যে সেবা তাহা লোককে নীচু করিয়া ফেলে, শুষ্ক করিয়া ফেলে। যে সেবায় আনন্দ নাই তাহাতে না আছে সেবকের লাভ, না আছে সেবিতের উপকার। যে সেবায় আনন্দ আছে সে সেবার তুলনায় আয়েস আরাম অথবা ধনোপার্জ্জন প্রবৃত্তি তুচ্ছ বোধ হয়।

২৭
বোম্বাই-এ সভা

ভগ্নীপতির মৃত্যুর পরদিনই সভার জন্য আমাকে বোম্বাই যাইতে হইয়াছিল। সাধারণ সভার জন্য বক্তৃতা তৈরী করিতে আমার সময় হয় নাই। রাত জাগিয়া ক্লান্তি আসিয়াছিল। গলার স্বর বসিয়া গিয়াছিল। ঈশ্বর যেমন করিয়া হোক্ আমাকে দিয়া কাজ চালাইয়া লইবেন, এই প্রকার ভাবিয়া আমি বোম্বাই গেলাম। বক্তৃতা লেখার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

সভার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যা পাঁচটার সময় নির্দ্দেশ মত সার ফিরোজশার আফিসে হাজির হইলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"গান্ধী, তোমার বক্তৃতা তৈরী আছে ত?"

"না জী, আমি ত বক্তৃতা মুখে মুখেই করিব স্থির করিয়াছি।"—ভয়ে ভয়ে আমি এই জবাব দিলাম।

"বোম্বাইএ উহা চলিবে না। এখানে বক্তৃতা ভারি খারাপ ভাবে রিপোর্ট করা হয়। যদি এই সভা হইতে কিছু সুবিধা করিয়া লইতে চাও, তবে তোমাকে বক্তৃতা লিখিতে হইবে ও রাতারাতি ছাপাইয়া ফেলিতে হইবে। বক্তৃতাটা রাত্রেই লিখিয়া ফেলিতে পারিবে না?"

আমি শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম, এবং লিখিতে চেষ্টা করিব বলিলাম।

"তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে বক্তৃতা আনিবার জন্য কখন লোক যাইবে?"—বোম্বাইয়ের সিংহ বলিয়া উঠিলেন।

'এগারটার সময়'—আমি উত্তর দিলাম।

সার ফিরোজশা মুন্সীকে ঐ সময় বক্তৃতা লইয়া আসিয়া রাত্রেই ছাপিয়া ফেলিতে আদেশ করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

পরদিন সভায় গেলাম। বক্তৃতা লিখিয়া ফেলার কথা বলার মধ্যে কতটা বিজ্ঞতা ছিল তাহা আমি দেখিতে পাইলাম। ফরমজী কাওয়াসজী ইনষ্টিটিউট্ হলে সভা হইয়াছিল। আমি শুনিয়াছিলাম যে, যদি সার ফিরোজশার বক্তৃতা থাকে তবে সভায় দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। প্রধানতঃ ছাত্রেরাই শ্রোতা থাকে।

এই প্রকার সভার আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। আমার বোধ হইল আমার স্বর কেহ শুনিতে পাইবে না। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। সার ফিরোজশা আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন —'আর একটু জোরে বল—আর একটু জোরে'—এই রকম বলিতে লাগিলেন। আমার ত মনে হয় আমার স্বর ক্রমে নীচু হইতে লাগিল।

আমার পুরাতন বন্ধু কেশবরাও দেশপাণ্ডে আমাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতে আমি বক্তৃতাখানা দিয়াছিলাম। তাঁহার কণ্ঠস্বর উপযুক্ত ছিল, কিন্তু শ্রোতৃবর্গ কি তাহা শোনে? 'ওয়াচা, ওয়াচা', শব্দ হইতে লাগিল। ওয়াচা উঠিলেন। তিনি দেশপাণ্ডের নিকট হইতে কাগজখানা লইলেন ও আমার কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন। সভা তখনই শান্ত হইল ও শেষ পর্য্যন্ত সকলে বক্তৃতা শুনিল। যেখানে নিন্দার সেখানে 'শেম' 'শেম' ও যেখানে হর্ষের সেখানে হাততালির ধ্বনি হইতে লাগিল। আমি সন্তুষ্ট হইলাম।"

সার ফিরোজশার নিকটও ঐ বক্তৃতা ভাল লাগিয়াছিল। আমি অতিমাত্রায় আনন্দিত হইলাম।

এই সভার ফলস্বরূপ দেশপাণ্ডে ও একজন পার্শী ভদ্রলোক এই কার্য্যে আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা উভয়েই আমার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। পার্শী ভদ্রলোকটি এক্ষণে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, সেইজন্য তাহার নাম প্রকাশ করিতে ডরাই। তাঁহাকে জজ খরশেদজী সঙ্কল্প চ্যুত করেন এবং ঐ বিচ্যুতির পশ্চাতে এক পার্শী ভগ্নী ছিলেন। সমস্যা দাঁড়াইল—তিনি বিবাহ করিবেন, কি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিবেন? তিনি বিবাহ করাই বাছিয়া লইয়াছিলেন। এই পার্শী মিত্রের চ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত পার্শী রুস্তমজী করেন এবং এই পার্শী ভগ্নীর চ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন অন্যান্য পার্শী ভগ্নীরা যাঁহারা খাদির কাজে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্য এই দম্পতিকে আমি মাফ করিয়াছি। দেশপাণ্ডের পরিণয়ের প্রলোভন ছিল না। কিন্তু তিনিও আসিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রায়শ্চত্ত তিনি নিজেই করিতেছেন। আবার ফিরিবার সময় জাঞ্জীবারে এক তৈয়বজীর সহিত দেখা হয়, তিনিও যাওয়ার আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় কে আসে? এই না আসার দোষ তাঁহার বদলে আব্বাস তৈয়বজী ভোগ করিতেছেন। আমার ব্যারিষ্টার মিত্রদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকায় লইয়া যাওয়ার প্রলোভন এই ভাবে নিষ্ফল হইয়াছে।

এই স্থানে আমার পেস্তনজী পাদশাহের কথা স্মরণ হইতেছে। তাঁহার সহিত বিলাতেই আমার মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। লণ্ডনের এক নিরামিষ ভোজন-গৃহে পেস্তনজীর সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তাঁহার ভাই বরজোরজীর 'পাগল' খ্যাতির কথা আমি জানিতাম। কিন্তু কখনো দেখি নাই। তিনি ঘোড়ার প্রতি দয়া বশতঃ ট্রামে চড়িতেন

না, শতাবধানীয় ন্যায় স্মরণ শক্তি থাকিলেও তিনি ডিগ্রি লন নাই, স্বভাব এমন স্বাধীন ছিল যে কোনও বন্ধন মানিতেন না, এবং পার্শী হইয়াও নিরামিষাহারী! পেস্তনজী ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যও প্রখর ছিল। বিলাতেও তিনি এই খ্যাতি পাইয়াছিলেন। তবে আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধের মূল ছিল নিরামিষাহার, তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট পঁহুছানো আমার শক্তির বহির্ভূত ছিল।

বোম্বাইএ পেস্তনজীকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তিনি হাইকোর্টে 'প্রোথোনোটারী' ছিলেন। যখন তাঁহার সহিত দেখা হয় তখন তিনি বৃহৎ গুজরাটী অভিধান প্রণয়নে নিযুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে সাহায্য করার জন্য আমি একজন মিত্রকেও বাদ দিই নাই। পেস্তনজী পাদাশাহ ত আমাকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় না যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলিলেন—"আমি আপনাকে সাহায্য করিব কি, আপনার যাওয়াই আমি পছন্দ করি না। কেন—নিজের দেশে কি কিছু কম কাজ আছে? আপনার ভাষার দিকে তাকাইলেই দেখিবেন—সেখানে সেবার কত দরকার। আমাদের বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা নাই। ইহা সেবার একটি ক্ষেত্র। দেশের দারিদ্র্যের কথা ধরুন। দক্ষিণ আফ্রিকায় কষ্ট আছে, কিন্তু তাহার জন্য আপনার মত লোক খরচ করা আমি সহ্য করিতে পারি না। যদি এখানে আপনি স্বাধীনতা পাইতে পারেন, তবে ওখানেও সাহায্য করিতে পারিবেন। আমি জানি, আমি আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিব না, কিন্তু আপনার ন্যায় অপর কাহাকে আপনার সাথী হওয়ারও ত সাহায্য করিতে পারিব না।" আমার একথা ভাল লাগিল না। কিন্তু পেস্তনজী পাদশাহ সম্বন্ধে সম্মান বাড়িল। তাঁহার দেশ-প্রেম, ভাষা প্রেম দেখিয়া আমি মোহিত হইলাম। আমাদের মধ্যে

প্রেম বন্ধন ইহাতে আরো দৃঢ় হইল। তাঁহার দৃষ্টিকেন্দ্র আমি পুরাপুরি দেখিতে পাইলাম। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ ছাড়ার বদলে, তাহা আরো বেশী করিয়া ধরিয়া থাকা দরকার বলিয়া আমার মনে হইল।

দেশ-প্রেমী কোনও একদিক দিয়া যদি কেহ হয় তবে তাহা ত্যাগ করিতে নাই। আমার জন্য গীতার শ্লোকে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ * ৩।৩৫

---

* পরধর্ম্ম সুলভ হইলেও এবং তাহা অপেক্ষা নিজ ধর্ম্ম বিগুণ হইলেও নিজধর্ম্ম অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্ম মরাও ভাল। পরধর্ম্ম ভয়ানক।

২৮

পুনায়

সার ফিরোজ শা আমার রাস্তা সোজা করিয়া দিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে আমি পুনায় গেলাম। পুনায় দুই পক্ষ আছে সে খবর আমি জানিতাম। আমার সকলেরই সাহায্য লইতে হইবে। লোকমান্যের সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন :—

"দুইপক্ষের সাহায্য লইতে যে স্থির করিয়াছেন তাহা খুব ভাল। আপনার প্রশ্ন সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কিন্তু আপনার একজন নিরপেক্ষ সভাপতি দরকার। আপনি প্রফেসর ভাণ্ডারকরের সহিত দেখা করুন। তিনি আজকাল কোনও আন্দোলনে যোগ দেন না, তবে এই কার্য্যে যোগ দিতে পারেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া কি ফল হইল আমাকে জানাইবেন। আমি আপনাকে পুরাপুরি সাহায্য করিতে চাই। আপনি প্রফেসর গোখলের সহিত ত দেখা করিবেন নিশ্চয়ই। যখনই ইচ্ছা আমার সহিত অসঙ্কোচে দেখা করিতে আসিবেন।

লোকমান্যের এই আমার প্রথম দর্শন। তাঁহার লোক-প্রিয়তার কারণ আমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম।

এই স্থান হইতে আমি গোখলের নিকটে গেলাম। তিনি ফার্গুসন কলেজে ছিলেন। আমাকে খুব প্রেমের সহিত গ্রহণ করিলেন ও আপনার লোক করিয়া লইলেন। তাঁহার সহিত ইহাই আমার প্রথম পরিচয়। কিন্তু কে জানে কেন আমার বোধ হইল যেন কতকালের পরিচয়। সার ফিরোজশাকে আমার হিমালয়ের মত লাগিয়াছিল, আর লোক-

মান্থকে সমুদ্রের মত। গোখলেকে দেখিলাম গঙ্গার স্থায়। উহাতে স্নান করা যায়। হিমালয়ে চড়া যায় না, সমুদ্রে ডুবিবার ভয় আছে। কিন্তু গঙ্গার কোলে খেলা করা যায়, ডিঙ্গী লইয়া পার হওয়া যায়। গোখলে আমাকে খুব ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন,যেন কোনও বিদ্যার্থী স্কুলে প্রবেশ করিতে আসিয়াছে। কাহার কাহার সহিত দেখা করিব, কেমন করিয়া দেখা করিব, তাহা বলিয়া দিলেন ও আমার বক্তৃতা দেখিতে চাহিলেন। আমাকে কলেজের সজ্জা দেখাইয়া দিলেন। যখন দেখা করার দরকার হয় তখন আবার দেখা করিতে ও ডাক্তার ভাণ্ডারকর কি বলেন তাহা জানাইতে বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে গোখলে জীবিতকালে অমার হৃদয়ে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং দেহান্তের পর আজও যে স্থান ভোগ করিতেছেন, সেস্থান আর কেহ পান নাই।

যেমন পুত্রকে পিতা স্নেহ করেন, তেমনি ভাণ্ডারকর আমাকে স্নেহের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কাছে যখন গেলাম তখন দুপুর হইয়াছে। তখন পর্য্যন্তও আমি আমার কাজ করিয়া যাইতেছি, ইহাতেই এই উদ্যমশীল শাস্ত্রজ্ঞের আমাকে ভাল লাগিল। নিরপেক্ষ সভাপতি করায় আমার আগ্রহ দেখিয়া তিনি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক কথা, ঠিক কথা।" আমার কাজের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"যাহাকে হোক্ জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে, আমি আজকাল কোনও রাজনৈতিক কার্য্যে যোগ দিই না। কিন্তু তোমাকে আমি ফিরাইতে পারি না। তোমার মাম্‌লা এত মজবুত ও তোমার উদ্যম এমন বস্তু যে তোমার সভায় যাইতে আমার অস্বীকার করার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত তিলক ও শ্রীযুত গোখলের সহিত দেখা করিয়া ভাল করিয়াছ।

তাঁহাদিগকে বলিও যে উভয় পক্ষ হইতে সভা আহ্বান করিলে আমি যাইব ও সভাপতি হইব। সময়ের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নাই। যে সময় উভয় পক্ষের অনুকূল হইবে সেই সময়েই আমার সুবিধা হইবে।" এই বলিয়া ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন।

বিনা গণ্ডগোলে বিনা আড়ম্বরে এক সামান্য গৃহে পুনার এই বিদ্বান ও ত্যাগী মণ্ডল সভা করিলেন ও আমাকে সম্পূর্ণ প্রোৎসাহিত করিয়া বিদায় দিলেন।

আমি সেখান হইতে মাদ্রাজ গেলাম। মাদ্রাজ আমার জন্য উন্মত্ত হইয়া ছিল। বালাসুন্দরমের কাহিনী সভায় বড়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমার বক্তৃতা আমার আন্দাজে লম্বা হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেকটী শব্দ সভার লোক মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়াছিল। সভার পর 'সবুজ পুঁথির' জন্য হিড়িক পড়িল। মাদ্রাজে উহা সংশোধিত করিয়া দশ হাজার ছাপাই। তাহার বেশীভাগ খরচ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমি দেখিয়াছিলাম যে, দশহাজারের আবশ্যক ছিল না—উৎসাহের টানে বেশী ছাপানো হইয়াছিল। আমার বক্তৃতার প্রভাব ত কেবল ইংরাজী-ভাষাবিদ্‌দের উপরই হইয়াছিল, কেবল সেই শ্রেণীর জন্য মাদ্রাজে দশহাজারের দরকার ছিল না।

এইস্থানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য আমি স্বর্গগত জি, পরমেশ্বরণ পিল্লের নিকট হইতে পাই। 'তিনি মাদ্রাজ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' সম্পাদক ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার আফিসে সময় সময় ডাকিতেন ও উপদেশ দিতেন। 'হিন্দু' পত্রের সুব্রহ্মণ্যমের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তিনি ও ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ পূর্ণ সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু জি পরমেশ্বরণ

তাঁহার নিজের কাগজখানা আমাকে এই কার্য্যের জন্য যথা-ইচ্ছা ব্যবহার করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং আমিও ব্যবহার করিয়াছিলাম। সভা 'পাচ্যাপ্পা' হলে হইয়াছিল। ডাক্তার সুব্রহ্মণ্যম্ সভাপতি হইয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে।

মাদ্রাজে আমি অনেকের নিকট হইতে ভালবাসা ও উৎসাহ পাইয়াছিলাম। যদিও তাঁহাদের সকলের সহিত ইংরাজীতে কথা বলিতে হইয়াছিল, তথাপি আমার সেখানে বাড়ীর মত মনে হইতেছিল। প্রেম কোন্ বাধা না লঙ্ঘন করিতে পারে?

২৯

শীঘ্র ফিরিয়া আসুন

মান্দ্রাজ হইতে আমি কলিকাতায় গেলাম। কলিকাতায় গিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। গ্রেট ইষ্টারর্ণ হোটেলে গিয়া উঠিলাম। কাহারও সহিত পরিচয় নাই। হোটেলে 'ডেলী টেলিগ্রাফের' প্রতিনিধি এলারথর্পের সহিত পরিচয় হইল। তিনি বেঙ্গল ক্লাবে থাকিতেন। সেখানে আমাকে তিনি নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন তিনি জানিতেন না যে, হোটেলের বৈঠকখানায় (ড্রইং রূমে) ভারতবাসীর প্রবেশ নিষেধ। পরে তিনি এই প্রতিবন্ধকের বিষয় জানিতে পারেন এবং আমাকে তাঁহার নিজের কামরায় লইয়া যান। স্থানীয় ইংরেজদের ভারতবাসীর প্রতি এই বিরুদ্ধভাবের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমাকে বৈঠকখানায় না লইয়া যাইতে পারার জন্য মাফ্‌ও চাহিয়াছিলেন।

বাঙ্গলার সর্ব্বজন-মান্য সুরেন্দ্রনাথের সহিত ত দেখা করিতে হইবেই। তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। আমি যখন দেখা করিলাম তখন তাঁহার চতুঃপার্শ্বে আরো অন্য লোক ছিলেন যাঁহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"আপনার এই কাজে লোকে যে মনোযোগ দিবে এমন বোধ হয় না। আপনি ত জানেন—আমাদের এখনাকার ঝঞ্ঝাটই কম নয়। তবুও আপনার জন্য যতটা পারা যায় করিতে হইবে। এই কাজে আপনার মহারাজাদের সাহায্য লওয়া দরকার। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সহিত দেখা করুন। রাজা

সার প্যারীমোহন মুখার্জী ও মহারাজ ঠাকুরের সহিত দেখা করুন। ইঁহারা উভয়েই উদার প্রকৃতির লোক এবং জন-সেবার কাজে খুব যোগ দিয়া থাকেন।" এই মহোদয় ব্যক্তিদিগের সহিত আমি দেখা করিলাম। কিন্তু সুবিধা হইল না, তাঁহারা গা লাগাইলেন না। দুইজনেই এই কথা বলিলেন—"কলিকাতায় সাধারণ সভা করা সহজ কথা নয়, যদি করিতে হয় তবে তাহা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উপর নির্ভর করে।"

আমার মুস্কিল বাড়িয়াই চলিল। 'অমৃতবাজার' পত্রিকার আফিসে গেলাম। যে ভদ্রলোক আমার সহিত দেখা করিলেন তিনি আমাকে কোনও ভবঘুরে বলিয়া ধরিয়া লইলেন। 'বঙ্গবাসী'তে গিয়া নাকালের এক শেষ হইলাম। আমাকে ত ঘণ্টাখানেক বসাইয়া রাখিলেন। সম্পাদক মহাশয় অপরের সহিত কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার কাছে লোক যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু আমার দিকে তিনি ফিরিয়াও তাকান না। এক ঘণ্টা আশা করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার কথা বলিতে আরম্ভ করিতেই তিনি বলিলেন—"আপনি দেখিতেছেন না, আমার হাতে কত কাজ রহিয়াছে? আপনার মত অনেক লোক আমার কাছে আসিয়া থাকে। আপনার বিদায় হওয়াই ভাল, আমি আপনার কথা শুনিতে পারিব না।" আমার মনে অল্পক্ষণের জন্য দুঃখ হইল। কিন্তু তখনই আমি সম্পাদকের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। 'বঙ্গবাসীর' খ্যাতি শুনিয়াছিলাম। সম্পাদকের নিকট যে লোকজন যাতায়াত করিতেছে তাহাও দেখিলাম। তাঁহারা সকলেই তাঁহার পরিচিত। তাঁহার কাগজে আলোচ্য বিষয়ের অভাব ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার নামও তখন কেহ শোনে নাই। তাঁহার কাছে নিত্য

নূতন লোক নিজের দুঃখের কাহিনী বলিতে আসে, আর তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দুঃখই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করে। সম্পাদকের নিকট তাহাদের ভিড় লাগিয়াই আছে, সম্পাদক বেচারা কি করে? আর্ত্ত-জন মনে করে—সম্পাদকের মস্ত একটা শক্তি আছে। সম্পাদক ত জানেন যে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব তাঁহার আফিস ঘরের দরজার বাহিরে এক পাও নয়।

আমি নিরাশ হইলাম না। অন্য সম্পাদকদের সহিত দেখা করিতে লাগিলাম। আমার প্রথা অনুযায়ী আমি ইংরাজদের নিকটও গেলাম। 'ষ্টেটসম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' উভয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নের গুরুত্ব জানিতেন। তাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাতের লম্বা বিবরণ প্রকাশ করিলেন। 'ইংলিশম্যানের' মিঃ সনডাস আমাকে আপন জনের মত করিয়া লইলেন। তাঁহার আফিস আমার অবাধ ব্যবহারের জন্য মুক্ত করিয়া দিলেন, তাঁহার কাগজ আমার ইচ্ছা মত ব্যবহার করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি যে সম্পাদকীয় মন্তব্য এ বিষয়ে লিখিয়াছিলেন তাহাও আমাকে আবশ্যক মত সংশোধন করিয়া দিতে অনুমতি দিলেন। আমাদের মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল—একথা বলায় অতিশয়োক্তি হইবে না। তাঁহার দ্বারা যে সাহায্য হইতে পারে তাহা করিবেন বলিয়া আমাকে কথা দিলেন এবং আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া গেলে তাঁহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন। আমি জানি, তিনি তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীর খারাপ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার সহিত পত্র ব্যবহার বন্ধ করেন নাই। আমার জীবনে এই প্রকার অপ্রত্যাশিত মধুর সম্বন্ধ অনেক হইয়াছে। আমার ভিতরে অতিশয়োক্তির অভাব ও সত্যপরায়ণতা

লক্ষ্য করিয়াই মিঃ সনডাসের্র আমাকে ভাল লাগিয়াছিল। তিনি আমাকে কম জেরা করেন নাই। তিনি তাহা হইতে দেখিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার গোরাদের দিকটাও পক্ষপাত-শূন্য হইয়া আমি দেখিতেছি এবং তাহাদের স্বার্থের সম্বন্ধেও আমার দৃষ্টি অন্ধ নহে।

আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বলিতেছে যে, বিরুদ্ধ পক্ষকে ন্যায় দান করিলেই নিজ পক্ষে ন্যায় সহজে পাওয়া যায়।

এই প্রকার অপ্রত্যাশিত সাহায্য পাইয়া কলিকাতাতেও সাধারণ সভা করার আশা হইল। ইতিমধ্যে ডারবান হইতে তার পাইলাম—"পার্লামেণ্ট জানুয়ারীতে বসিবে। শীঘ্র ফিরিয়া আসুন।"

অতঃপর আমি সংবাদপত্রে জানাইয়া দিলাম—কেন আমাকে এখনই ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। প্রথম যে ষ্টীমার বোম্বাই হইতে পাওয়া যায় তাহাতেই আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য দাদা আবদুল্লার বোম্বাইএর এজেণ্টকে তার করিলাম। দাদা আবদুল্লা নিজে 'কুরল্যাণ্ড' ষ্টীমারখানা কিনিয়া লইয়াছিলেন। সেইজন্য উহাতেই আমাকে সপরিবারে বিনা ব্যয়ে লইয়া যাওয়ার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিলেন। আমি ধন্যবাদের সহিত এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া ডিসেম্বরের প্রথম ভাগেই আমার ধর্ম্মপত্নী, দুই পুত্র এবং আমার বিধবা ভগ্নীর একমাত্র পুত্র লইয়া দ্বিতীয় বার দক্ষিণ আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই ষ্টীমারের সহিত দ্বিতীয় ষ্টীমার 'নাদেরী'ও রওনা হইল, উহার এজেণ্টও দাদা আবদুল্লা ছিলেন। দুই ষ্টীমারে মিলিয়া প্রায় আটশত ভারতীয় যাত্রী ছিল। তাহাদের অর্দ্ধেকের বেশী ট্রান্সভাল যাইতেছিল।

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

তৃতীয় ভাগ

১

তুফানের গর্জ্জন

পরিবার লইয়া ইহাই আমার প্রথম সমুদ্র-যাত্রা। আমি অনেকবার এ কথা লিখিয়াছি যে, হিন্দু-সংসারে বাল্য বিবাহ হইলেও, এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামী লেখাপড়া জানা হইলেও স্ত্রী নিরক্ষর থাকে, আর তাহাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধান থাকিয়া যায় এবং স্বামীকে স্ত্রীর শিক্ষক হইতে হয়। আমাকে আমার স্ত্রীর ও ছেলেপেলেদের, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-পরা ও চাল-চলন সামলাইয়া লইতে হইত, উহাদিগকে আচার-ব্যবহার আমার শিখাইতে হইত। তখনকার দিনের কতকগুলি ঘটনার কথা মনে হইয়া খুব হাসি পায়। হিন্দু স্ত্রী পতিপরায়ণতাকে ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বলিয়া মানে, হিন্দু স্বামী নিজেকে স্ত্রীর ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। স্ত্রীকে সে যেমন নাচায় স্ত্রী তেমনি নাচে।

যে সময়ের কথা আমি লিখিতেছি তখন আমি মনে করিতাম যে, সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে যথা সম্ভব ইউরোপীয়দের মত হইতে হইবে। এইপ্রকার করিলেই খাতির হইবে, আর খাতির না জমিলে দেশ-সেবা করা যায় না।

সেইজন্য স্ত্রীর ও ছেলেদের পোষাক কেমন হইবে আমিই স্থির করিয়া দিলাম। ছেলেপেলেদিগকে যদি কাথিয়াওয়াড়ী বাণিয়ার মত দেখায় তবে কি ভাল লাগে? পার্শীরা সকলের অপেক্ষা বেশী সভ্য হইয়াছে বলিয়া লোকে জানিত। সেই জন্য ইউরোপীয় পোষাকের

অনুকরণে যেখানে অসুবিধা হইল সেখানে পার্শীর অনুকরণ করিলাম। স্ত্রীর জন্য পার্শী ভগ্নীরা যে সাড়ী পরেন সেই সাড়ী ও ছেলেদের জন্য পার্শী কোট পাত্‌লুন আনিয়া দিলাম। সকলেরই জুতা-মোজা ত থাকাই চাই। এই দুইটা জিনিষ স্ত্রীর ও ছেলেদের অনেক দিন ধরিয়া ভাল লাগে নাই। জুতায় পা চাপিয়া ধরে, মোজায় দুর্গন্ধ হয়, পা ব্যথা করে। কিন্তু এসকল অসুবিধার জবাব আমার কাছে তৈরী ছিল। জবাবের মধ্যে যুক্তি যত না ছিল হুকুমের জোর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। নাচার হইয়াই স্ত্রী ও ছেলেপেলেরা পোষাকের পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া লইল। তেমনি নিরুপায় হইয়া এবং তাহা হইতেও বেশী অসুবিধা ভুগিয়া উহাদিগকে খাওয়ার সময় ছুরি-কাঁটা ব্যবহার করিতে হইল। কিন্তু যখন ঐ সকল জিনিষের উপর হইতে আমার মোহ চলিয়া গেল তখন আবার তাহাদিগকে জুতা-মোজা, ছুরি-কাঁটা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পরিবর্ত্তন গ্রহণের সময় উহা যেমন দুঃখদায়ক হইয়াছিল, আবার ত্যাগ করাও তেমনি দুঃখদায়ক হইয়াছিল। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, সভ্য হওয়ার পোষাক ও আচারের বোঝা ফেলিয়া দিয়া আমরা হাল্‌কা হইয়াছিলাম।

এই ষ্টীমারে কয়েকজন আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সহিত ও ডেকের অন্য যাত্রীদের সহিত আমি খুব মেলামেশা করিতাম। মক্কেল ও মিত্রের ষ্টীমার বলিয়া নিজের ঘরের মত আমি অবাধে যেখানে ইচ্ছা চলাফেরা করিতে পারিতাম।

ষ্টীমার অন্য কোনও বন্দরে না থামিয়া সোজা নাতালে পঁহুছিবে বলিয়া পথ মাত্র আঠার দিনে শেষ হইবার কথা। আমাদের নাতাল

পঁহুছিবার তিন চারদিন পূর্ব্বে, আমরা ভীষণ তুফানের মুখে পড়িলাম। এ তুফান হয়ত সাম্‌নে যে আর একটা ভীষণ ঝড় আসিতেছে তাহারই সাবধানতার সঙ্কেত। দক্ষিণ প্রদেশে এই সময় গ্রীষ্মকাল ও ঝড় বৃষ্টির সময়। দক্ষিণ সমুদ্রে এই সময় ছোট বড় ঝড় হইয়াই থাকে। ঝড়ের এত জোর ছিল ও এত অধিকক্ষণ ঝড় ছিল যে, যাত্রীরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ষ্টীমারে দৃশ্য ছিল গাম্ভীর্য্য পূর্ণ। দুঃখের সময় সকলেই এক হইয়া গিয়াছিল, ভেদ ভুলিয়া গিয়াছিল। ঈশ্বরকে সকলেই অন্তরের সহিত ডাকিতে ছিলেন। হিন্দু মুসলমান একত্র মিলিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেছিলেন। কেহ কেহ বা মানত করিতেছিলেন। কাপ্তেনও যাত্রীদের সহিত প্রার্থনায় যোগ দিয়াছিলেন ও সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছিলেন—"ঝড় অবশ্য খুবই ভীষণ। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভীষণতর তুফানেও তিনি পূর্ব্বে পড়িয়াছেন। ষ্টীমার মজবুত, সহজে ডুবিবে না।" যাত্রীদিগকে তিনি যতই বুঝান না কেন, যাত্রীদের ভরসা আসে না। ঝড়ের আঘাতের এমন আওয়াজ হইতেছিল যে, এই বুঝি ষ্টীমার ভাঙ্গিয়া গেল, এই ফাটিয়া গেল। এমন দুলিয়া উঠে যে, আমরা পড়িয়া যাওয়ার মত হই। ডেকের উপর থাকে কাহার সাধ্য? 'ঈশ্বর রাখিলেই রক্ষা'—ইহা ছাড়া আর কোনও কথা শুনা যাইতেছিল না।

আমার স্মরণ আছে, এই শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটে। তারপর মেঘ কাটিয়া যায়, সূর্য্য-নারায়ণ দর্শন দেন। কাপ্তেন বলিলেন—'তুফান গিয়াছে'। লোকের মুখ হইতে চিন্তার ভাব দূর হইল, ঈশ্বরের নামও ফুরাইল। মৃত্যুর ভয় চলিয়া যাওয়াতেই গান-বাজনা, খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হইয়া গেল, ঈশ্বর চিন্তার ভাব মায়ার আবরণে

ঢাকা পড়িল। নমাজ রহিল, ভজন রহিল, কিন্তু ঝড়ের তালে উহা হইতে যে গম্ভীর সুর উঠিয়াছিল তাহা চলিয়া গেল।

এই ঝড় আমাকে যাত্রী দলের সহিত ওতঃপ্রোত করিয়া যুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আমার ঝড়ের ভয় ছিল না, অথবা নামমাত্র ছিল। প্রায় এই প্রকার ঝড় আমি পূর্ব্বেও পাইয়াছি।

ঝড়ের দোলায় আমার গা-বমি ভাব আসিত না, ঝড়ের দাপটে আমার মাথা ঘুরিত না, সেইজন্য আমি যাত্রীদের মধ্যে নির্ভয়ে ঘুরিতে পারিতাম, তাহাদিগকে আশ্বাস দিতে পারিতাম ও কাপ্তেনের নিকট হইতে অবস্থার সংবাদ আনিয়া শুনাইতে পারিতাম। এই স্নেহের বন্ধন আমার খুব উপকারে আসিয়াছিল।

আমরা ১৮ই কি ১৯শে ডিসেম্বর ডারবানের বন্দরে নোঙ্গর করিলাম। 'নাদেরী'ও সেই দিনই পঁহুছিল।

সত্যিকার তুফান এইবার সহিতে হইবে।

২
তুফান

১৮ই ডিসেম্বর কিম্বা তারপর দিন দুইখানা ষ্টীমারই নোঙ্গর করিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দরে স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে পুরা পরীক্ষা করিয়া তবে নামিতে দেওয়া হয়। যদি রাস্তায় কাহারও সংক্রামক রোগ হয় তবে 'কোয়েরেণ্টাইনে'—সংসর্গ-প্রতিষিদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া দেয়। বোম্বাইতে যখন আমরা জাহাজে চড়ি তখন সেখানে প্লেগ ছিল, সেই জন্য আমাদিগকে 'কোয়েরেণ্টাইনে' রাখার ভয় ছিলই। বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করিলেই হলুদ নিশান উঠাইয়া রাখিতে হয়। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া গেলে নিশান নামাইবার হুকুম হয়, তখন যাত্রীদের আত্মীয়-পরিজনেরা ষ্টীমারে প্রবেশ করিতে পারে।

এই জন্য আমাদের ষ্টীমারের উপর হলুদ নিশান উড়িতেছিল। ডাক্তার আসিলেন। পরীক্ষা করিয়া পাঁচদিন 'কোয়েরেণ্টাইনে' থাকিবার আদেশ দিলেন। ইহার কারণ, মড়কের বিষ তেইশ দিন পরেও দেখা দিতে পারে। সেইজন্য বোম্বাই ত্যাগ করার ২৩ দিন পর্য্যন্ত ষ্টীমারের 'কোয়েরেণ্টাইন'-বাসের আদেশ হইল। কিন্তু কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই এ হুকুম দেওয়া হয় নাই। আমাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য নাতালের গোরা বাসিন্দারা আন্দোলন করিতেছিল। উহাই এই হুকুমের প্রধান হেতু ছিল।

দাদা আবদুল্লার লোকেরা সহরের এই আন্দোলনের সম্বন্ধে খবর আমাদিগকে দিতেছিলেন। গোরারা প্রতিদিন বিরাট সভা করিতেছিল,

দাদা আব্দুল্লাকে ধমক দেখাইতেছিল, আবার তাঁহাকে লোভও দেখাইতেছিল। যদি দাদা আব্দুল্লা ষ্টীমার দুইখানা ফেরৎ পাঠাইয়া দেন তবে তাহার ক্ষতি-পূরণ করিতেও তাহারা প্রস্তুত ছিল। দাদা আব্দুল্লা কোম্পানী ভয় পাওয়ার পাত্র নহেন। সে সময় আব্দুল করিম হাজী আদম কোম্পানীর প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতই লোকসান হোক্ না কেন, ষ্টীমার বন্দরে লাগাইবেন ও যাত্রীদিগকে নামাইবেন। তিনি আমার নিকট প্রতিদিন সমস্ত বিবরণ সহ পত্র দিতেন। আমাদের ভাগ্যক্রমে এই সময় স্বর্গীয় মনসুখলাল হীরালাল নাজর আমার সহিত দেখা করার জন্য নাতালে আসিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্ম-কুশল ও নির্ভীক ছিলেন। তিনিই সম্প্রদায়কে উপযুক্ত পরামর্শ দিতেছিলেন। তাঁহাদের উকীল ছিলেন মিঃ লাটন্, তিনিও তেমনি নির্ভীক ছিলেন। তিনি গোরাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং কেবল উকীল বলিয়া পয়সার জন্যই কার্য্য না করিয়া, অকৃত্রিম বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছিলেন। এমনি করিয়া ডারবানে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ জমিয়া গেল। একদিকে মুষ্টিমেয় গরীব হিন্দুস্থানী, এবং তাঁহাদের গোণা-গাঁথা কয়েকটি ইংরাজ মিত্র, আর অন্য দিকে ধনবল, বাহুবল, বিদ্যাবল, ও সংখ্যাবলে পূর্ণ বলীয়ান ইংরাজ। এই বলবান প্রতিপক্ষের সঙ্গে কর্ত্তৃত্বের বলও যুক্ত হইয়াছিল। কেননা নাতাল সরকার খোলাখুলিভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মিঃ হ্যারী এসকম্ব মন্ত্রীমণ্ডলের একজন বিশেষ শক্তিশালী সদস্য ছিলেন। তিনি এই যোদ্ধ-মণ্ডলের সভায় প্রকাশ্যভাবেই যোগ দিলেন। আমাদের কোয়েরেণ্টাইন স্বাস্থ্যের দিক হইতে না বসাইয়া যেমন করিয়া হোক্, এজেণ্ট অথবা যাত্রীদিগকে ভয় দেখাইয়া ফিরাইয়া পাঠানোর জন্যই

বসানো হইয়াছিল। এজেণ্টকে ত ভয় দেখানো চলিতেছিলই, এখন আমাদের উপরেও এই বলিয়া ভয় দেখানো আরম্ভ হইল যে, 'যদি না ফিরিয়া যাও তবে তোমাদিগকে সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়ার জন্য আসিতেছি, আর যদি ফিরিয়া যাও তবে যাওয়ার ভাড়াও দিয়া দিতে পারি।' আমি যাত্রীদের মধ্যে খুব ঘুরিতে লাগিলাম। তাহাদিগকে ধৈর্য্য রাখিতে বলিলাম। 'নাদেরী'র যাত্রীদিগকেও ধৈর্য্য রাখার উপদেশ পাঠাইলাম। যাত্রীরা শান্ত রহিল ও সাহস হারাইল না।

যাত্রীদের আমোদের জন্য আমরা ষ্টীমারের উপরেই খেলার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। বড়দিন আসিল। সে দিন কাপ্তেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদিগকে ভোজ দিলেন। যাত্রী বলিতে প্রধানতঃ আমি ও আমার পরিবার। ভোজের পর বক্তৃতা ত হওয়াই চাই। আমি পশ্চিমের সভ্যতার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলাম। আমি জানিতাম যে, উহা গম্ভীর বিষয় আলোচনার সময় নয়। কিন্তু আমার দ্বারা আর কোনও বক্তৃতা হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। আমি খেলা-ধূলায় যোগ দিতাম, কিন্তু আমার মন ত ছিল ডারবানে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেইখানে। আমিই এই লড়াইয়ের লক্ষ্য ছিলাম। আমার উপর দুইটা অভিযোগ ছিল—

১। আমি ভারতবর্ষে নাতালবাসী গোরাদের অসম্ভব রকম নিন্দা করিয়াছি।

২। আমি ভারতবাসী দ্বারা নাতাল ভরিয়া ফেলিতে চাই বলিয়া 'কুরল্যাণ্ড' ও 'নাদেরী'তে করিয়া ভারতবাসী বোঝাই করিয়া লইয়া আসিয়াছি।

আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ছিল। আমার জন্য দাদা আবদুল্লা মহালোকসানের মধ্যে পড়িয়াছেন, যাত্রীদিগের প্রাণ আমা দ্বারা বিপন্ন

হইয়াছে এবং পরিবারকে সঙ্গে আনিয়া তাহাদিগকেও সেই বিপদেই ফেলিয়াছি।

কিন্তু এ সকলের জন্য আমি নিজে নির্দ্দোষ। আমি কাহাকেও নাতাল আসিতে বলি নাই। 'নাদেরীর' যাত্রীদিগকে ত আমি দেখিও নাই, আর 'কুরল্যাণ্ডে' আমার দুইজন কুটুম্ব ব্যতীত আর কাহারও নাম-ধাম পর্য্যন্ত আমি জানিতাম না। আমি ভারতবর্ষে নাতালের গোরাদের সম্বন্ধে এমন একটা কথাও বলি নাই যাহা আমি পূর্ব্বে নাতালে বলি নাই, আর আমি যাহা বলিয়াছি তাহার জন্য আমার নিকট যথেষ্ট প্রমাণও রহিয়াছে।

নাতালের ইংরাজেরা যে সভ্যতার ফল, যে সভ্যতার তাহারা সমর্থক, এজন্য সেই সভ্যতার সম্বন্ধেই আমার মনে গ্লানির সৃষ্টি হইয়াছিল। আমি এই বিষয় ভাবিতেছিলাম আর আমার এই সকল ভাব আমি সেই ছোট সভায় প্রকাশ করিলাম এবং শ্রোতারাও তাহা ধীরভাবে শুনিলেন। আমি যে মনোভাব হইতে আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছিলাম কাপ্তেন ইত্যাদিরা সেই ভাবেই তাহা লইয়াছিলেন। উহা হইতে তাঁহাদের জীবনের কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কিনা তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইহার পর এই বিষয় লইয়া কাপ্তেন ও অন্য আমলাদের সঙ্গে আমার অনেক কথা হইয়াছিল। বক্তৃতায় আমি বলি—"পশ্চিমের সভ্যতা প্রধানতঃ হিংসামূলক এবং পূর্ব্বদেশের সভ্যতা অহিংসামূলক। প্রশ্ন-কর্ত্তারা আমার সিদ্ধান্তের উপর আমাকে চাপিয়া ধরিলেন। বিশেষ করিয়া কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"গোরারা যেমন ভয় দেখাইতেছে, কাজেও যদি তেমনি ক্ষতি

করিয়া বসে, তবে আপনার অহিংসার সিদ্ধান্ত কি ভাবে প্রয়োগ করিবেন?"

আমি জবাব দিলাম—"আমার আশা আছে, তাহাদিগকে মাফ্ করিবার ও তাহাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ না লওয়ার সাহস ও বুদ্ধি ঈশ্বর আমাকে দিবেন। আজও তাঁহাদের উপর আমার রোষ নাই। তাঁহাদের অজ্ঞতার, তাঁহাদের সঙ্কুচিত দৃষ্টির জন্য দুঃখ হয়। তাঁহারা যাহা বলিতেছেন, তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহাই ঠিক, একথা তাঁহারা শুদ্ধ ভাবেই বিশ্বাস করেন—ইহা আমি স্বীকার করি। সেইজন্য আমার রোষের কারণ নাই।" প্রশ্নকর্তা হাসিলেন। আমার কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

এমনি করিয়া আমাদের লম্বা দিন কাটিতে লাগিল। কবে যে এই 'সূতিকা-গৃহ'-বাসের শেষ হইবে তাহা স্থির নাই। এ বিষয় বন্দরের আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে—'উহা আমাদের হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, সরকার যখন হুকুম করিবে তখনই নামিতে দিতে পারিব।'

অবশেষে যাত্রীদিগের উপর ও আমার উপর চরম-পত্র আসিল। আমাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইল। জবাবে আমরা জানাইলাম যে, বন্দরে নামার অধিকার আমাদের আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইলাম যে, আমরা নামিব এবং যতই ক্ষতি হোক্ না কেন, আমাদের সেই অধিকার বজায় রাখার জন্য আমরা কৃতসঙ্কল্প।

অবশেষে বত্রিশ দিন পরে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী ষ্টীমারকে মুক্তি দেওয়া হইল ও যাত্রীদিগকে নামিতে হুকুম দেওয়া হইল।

৩

পরীক্ষা

জাহাজ ডকে আসিল, যাত্রীরা নামিল। কিন্তু মিঃ এসকম্ব আমার সম্বন্ধে কাপ্তেনকে বলিয়া পাঠাইলেন—"গান্ধীকে ও তাঁহার পরিবারকে সন্ধ্যাবেলা নামাইয়া দিও। তাঁহার উপর গোরারা খুব চটিয়া আছে এবং তাঁহার জীবনের আশঙ্কা আছে। ডক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সন্ধ্যাবেলায় তাঁহাকে নামাইয়া লইয়া যাইবেন।"

কাপ্তেন এই সংবাদ আমাকে দিলেন। আমি তাহা পালন করিতে স্বীকৃত হইলাম। এই সংবাদ পাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই মিঃ লাটন আসিলেন এবং কাপ্তেনের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"যদি মিঃ গান্ধী আমার সহিত আসেন তবে আমার দায়িত্বে আমি তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাই। ষ্টীমার-এজেণ্টের উকীল হিসাবে আমি একথা আপনাকে বলিতেছি যে, গান্ধীর সম্বন্ধে যে সংবাদ আপনি পাইয়াছেন সে বিষয়ে আপনি দায়-মুক্ত হইলেন। কাপ্তেনের সহিত এই কথাবার্ত্তা বলিয়া তিনি আমার নিকট আসিলেন। আমাকে তিনি যাহা বলিলেন তাহা কতকটা এই রকমের—"যদি আপনার প্রাণের ভয় না থাকে, তবে আমি ইচ্ছা করি যে, মিসেস্ গান্ধী ও ছেলে-পেলেরা গাড়ী করিয়া রুস্তমজী শেঠের বাড়ী যান, আপনি ও আমি তাঁহাদের পিছনে পিছনে হাঁটিয়া যাই। আপনি অন্ধকারে লুকাইয়া সহরে প্রবেশ করিবেন, ইহা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। আমি মনে করি, আপনার কেশাগ্রও

কেহ স্পর্শ করিবে না। এখন ত সব শান্ত আছে। গোরারা সব চলিয়া গিয়াছে। সে যাহাই হোক্ না কেন, আমার মতে আপনার লুকাইয়া সহরে প্রবেশ করা উচিত নয়।"

আমি সম্মত হইলাম। আমার স্ত্রী ও ছেলেপেলে গাড়ীতে রুস্তমজী শেঠের বাড়ীতে গেলেন ও মঙ্গলমত পঁহুছিলেন। আমি কাপ্তেনের নিকট বিদায় লইয়া মিঃ লাটনের সহিত নামিলাম। রুস্তমজী শেঠের বাড়ী প্রায় দুই মাইল দূরে।

আমরা জাহাজ হইতে নামিলে কতকগুলি ছোকড়া আমাকে দেখিতে পাইয়া 'গান্ধী গান্ধী' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। দুই চারজন দৌড়াইয়া আসিয়া বেশী করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মিঃ লাটন দেখিলেন—ভিড় বাড়িতেছে, তিনি রিক্সা ডাকিলেন। উহাতে চড়া আমি কখনো পছন্দ করি না। এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা হইতে যাইতেছিল। কিন্তু ছোক্রারা বসিতে দিল না। তাহারা রিক্সাওয়ালাকে ধমকাইতে সে পালাইল।

আমরা অগ্রসর হইলাম। ভিড় বাড়িয়াই চলিল। চারিদিক ভিড়ে ভরিয়া গেল। ভিড়ের ধাক্কা প্রথমেই মিঃ লাটনকে আমার নিকট হইতে পৃথক করিয়া ফেলিল। তারপর জনতা আমার উপর ঢিল ও পচা ডিম ছুঁড়িতে লাগিল। একজন আমার পাগ্ড়ী ফেলিয়া দিল। লাথি দেওয়া আরম্ভ হইল। আমার মূর্চ্ছা হইল। আমি একটা বাড়ীর রেলিং ধরিয়া শ্বাস লইলাম। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা যাইতেছিল না, অনবরত ঘুষি ও কীল পড়িতেছিল। পুলিশের প্রধান কর্ত্তার স্ত্রী আমাকে জানিতেন। এই সময়ে তিনি এই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও রৌদ্র না থাকিলেও তাঁহার ছাতা খুলিলেন।

ইহাতে ভিড় কতকটা নরম হইল। মিসেস্ আলেকজেণ্ডারকে আঘাত না করিয়া আমাকে মারা যায় না।

ইতিমধ্যে কোনও ভারতীয় যুবক, আমার উপর মার চলিতেছে দেখিয়া থানায় দৌড়াইয়া গিয়াছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডার আমাকে বাঁচাইবার জন্য একটা দল পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা সময় মত আসিয়া পঁহুছিল। আমার রাস্তা পুলিশ থানার নিকট দিয়াই ছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থানায় আশ্রয় লওয়ার জন্য বলিলেন। আমি বলিলাম, যখন লোকে নিজের ভুল দেখিবে তখন শান্ত হইয়া যাইবে। তাহাদের ন্যায়-বুদ্ধির উপর আমার বিশ্বাস আছে।

পুলিশদের দল পরিবৃত হইয়া ভাল ভাবেই পার্শী রুস্তমজীর বাড়ীতে পঁহুছিলাম। আমার সমস্ত শরীরেই খুব আঘাত লাগিয়াছিল, কেবল একটা জায়গায় ছড়িয়া গিয়াছিল। ষ্টীমারের ডাক্তার দাদী বরজোর হাজির ছিলেন। তিনি ভাল করিয়া শুশ্রূষা করিলেন।

বাড়ীর ভিতরে শান্তি ছিল, কিন্তু বাহিরে গোরারা ধর্ণা দিয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। অন্ধকার হইয়াছিল। জনতা চীৎকার করিতে-ছিল—"গান্ধীকে আমাদের কাছে দাও।" এই সময় আলেকজেণ্ডার সেখানে পঁহুছিয়া কখনো বা ধমক দিয়া, কখনো বা তাহাদিগকে ভুলাইয়া বশে রাখিতে ছিলেন।

তাহা হইলেও তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে এই মর্ম্মের সংবাদ পাঠাইলেন—"যদি আপনি আপনার মিত্রের ঘর-দ্বার ও আপনার পরিবার বাঁচাইতে চা'ন, তবে আমি যেমন বলিতেছি, তেমনি করিয়া আপনাকে এই বাড়ী হইতে পলাইয়া বাহির হইতে হইবে।"

একই দিনে আমার ঠিক দুই বিপরীত কাজ করিবার অবকাশ

উপস্থিত হইল। যখন জীবনের ভয় মাত্র কাল্পনিক ছিল, তখন মিঃ লাটন আমাকে প্রকাশ্যভাবে বাহিরে আসিতে বলিলেন এবং আমি তাঁহার কথা রাখিলাম। যখন হানির সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তখন অন্য মিত্র অন্যরূপ পরামর্শ দিলেন এবং আমি তাঁহার কথাও রাখিলাম। কে বলিতে পারে জীবনের ভয়ে, অথবা মিত্রের ধন-প্রাণের ভয়ে, কি পরিবারের জন্য, অথবা এই তিনটার জন্যই আমি পলাইবার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম? কে বলিতে পারে যে, আমার ষ্টীমারের উপর হইতে সাহস করিয়া নামা ও বিপদ প্রত্যক্ষ দেখিয়া লুকাইয়া পালানো—এ উভয় কার্য্যই ঠিক হইয়াছে কিনা? কিন্তু যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে এখন আলোচনা মিথ্যা। যাহা গত হইয়াছে তাহা বুঝাই আবশ্যক এবং তাহা হইতে শিক্ষালাভ করাই উপযুক্ত কাজ। বিশেষ কোনও ঘটনায় বিশেষ লোক কেমনভাবে চলিবে একথা নিশ্চয়পূর্ব্বক বলা যায় না। বাহিরের ব্যবহার হইতে কোনও লোকের গুণের যখন পরীক্ষা করা হয়, তখন তাহাও যে অসম্পূর্ণ এবং আনুমাণিক মাত্র ইহাও আমাদের জানা দরকার।

সে যাহাই হোক্, পলায়ন কার্য্যের প্রচেষ্টায় আমি শরীরের জখমের কথা ভুলিয়া গেলেন। আমি ভারতীয় সিপাহীর পোষাক পরিলাম। মাথায় যদি ডাণ্ডা পড়ে তবে তাহা হইতে বাঁচিবার জন্য পিতলের তাওয়া রাখিয়া তাহার উপর মাদ্রাজী বড় ফেটা জড়াইলাম। আমার সহিত দুইজন ডিটেক্‌টিভ ছিলেন, তাঁহাদের একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পোষাক পড়িলেন, মুখে ভারতীয়দের মত রং দিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি কি পরিয়াছিলেন তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আমি পাশের গলি দিয়া নিকটবর্ত্তী এক দোকানে গেলাম। সেখানে গুদামের চটের বস্তার

মধ্য দিয়া অন্ধকারে রাস্তা করিয়া দোকানের গেট দিয়া বাহির হইলাম ও ভিড়ের মধ্য দিয়া চলিলাম। গলির সাম্‌নেই গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে চড়াইয়া আমাকে সেই থানায় লইয়া যাওয়া হইল, যেখানে পূর্ব্বে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডার আমাকে আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। এই ভাবে একদিক দিয়া আমাকে যখন লইয়া যাওয়া হইতেছিল, অন্যদিকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডার তখন ভিড়ে লোকের সহিত কৌতুক করিয়া তাহাদের সঙ্গে গান গাহিতেছিলেন—

'আমরা এখন গান্ধীকে নেব,
তেঁতুলের ডালে ফাঁসি ঝুলাব।'

যখন আমার নিরাপদে থানায় পঁহুছার সংবাদ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডারের নিকট পঁহুছিল, তখন তিনি লোকগুলিকে বলিলেন—"তোমাদের শীকার ত এই দোকানের মধ্য দিয়া নিরাপদে পলাইয়াছে।" কথাটা শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে কেহ ক্রুদ্ধ হইল, কেহ হাসিল। অনেকেই ইহা বিশ্বাস করিল না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডার বলিলেন—"তাহা হইলে তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও দাও, আমি তাহাকে ভিতরে লইয়া যাই; সে খুঁজিয়া দেখিবে। যদি গান্ধীকে খুঁজিয়া পাও তবে তোমাদের হাতে গান্ধীকে ফেলিয়া দিব, যদি না পাও তবে ঘরে ফিরিয়া যাইবে। পাশী রুস্তমজীর বাড়ী নিশ্চয় তোমরা লুট করিতে চাও না, আর গান্ধীর স্ত্রী-পুত্রকেও তোমরা নিশ্চয় মারিতে চাও না।"

ভিড়ের দঙ্গল প্রতিনিধি বাছিয়া দিল। প্রতিনিধিরা আসিয়া ভিড়ের মধ্যে নিরাশাজনক খবর দিল। সকলেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

আলেকজেণ্ডারের চতুরতার প্রশংসা করিল, কিন্তু কতকগুলি দুষ্ট লোক ইহা লইয়াও হল্লা করিল। তথাপি ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল।

পরলোকগত মিঃ চেম্বারলেন তখন উপনিবেশ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইংলণ্ডের মন্ত্রী। আমার উপর যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের নামে নালিশ করিতে ও যাহাতে ন্যায় বিচার হয় তাহা করিবার জন্য তিনি তার করিলেন। মিঃ এসকম্ব আমাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। আমার উপর অত্যাচারের জন্য দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন, ও বলিলেন—"আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ হইলে তাহা যে আমাকে ব্যথিত করিত তাহা আপনি জানেন। মিঃ লাটনের পরামর্শ অনুসারে আপনি পূর্ব্বেই নামিয়া আসিয়া দুঃসাহসের কাজ করিয়াছিলেন, যদিও ওরূপ করার আপনার অধিকার ছিল। কিন্তু আমার কথা শুনিলে এই দুর্ঘটনা হইত না। এখন আপনি যদি অত্যাচারকারীদিগকে চিনিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে ধরিয়া নালিশ চালাইতে আমি প্রস্তুত আছি। মিঃ চেম্বারলেন তাহাই করিতে বলিয়াছেন।"

আমি জবাব দিলাম—"আমি কাহারও উপর নালিশ করিব না। হাঙ্গামাকারীদের মধ্যে দুই একজনকে আমি চিনি। কিন্তু তাহাদিগকে সাজা দিয়া কি লাভ? আমি হাঙ্গামাকারীদিগকে দোষীও বলি না। তাহাগিকে একথা বলা হইয়াছে যে, আমি ভারতবর্ষে গিয়া অতিশয়োক্তি করিয়া নাতালের গোরাদের ক্ষতি করিয়াছি। একথা যদি তাঁহারা বিশ্বাস করে ও রাগ করে তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? দোষ ত উপরওয়ালাদের, আর যদি আমাকে বলিতে দেন, তবে বলিব—দোষ আপনারই। আপনি ইচ্ছা করিলে লোকদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা আপনি করেন নাই। কারণ আপনিও

রয়টারের তারের খবর বিশ্বাস করিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন যে, আমি অতিশয়োক্তি করিয়াছি। আমি কাহারও নামে নালিশ করিতে চাই না। যখন সত্য অবস্থা প্রকাশিত হইবে ও সকলে তাহা জানিবে তখন তাহারা পস্তাইবে।"

"আপনি যদি একথা আমাকে লিখিয়া দেন তবে মিঃ চেম্বারলেনকে উহা তার করিয়া আমি জানাইতে পারি। অবশ্য তাড়াতাড়ি কিছু লিখিয়া দিতে আমি আপনাকে বলি না। আপনি মিঃ লাটন ও অন্যান্য মিত্রদের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা সঙ্গত মনে করেন তাহাই করিবেন। তবে এটুকু আমি বলিতে পারি যে, যদি আপনি নালিশ না করেন তবে সব শান্ত করিতে, আমার খুব সাহায্য করা হইবে; এবং আপনার প্রতিষ্ঠাও তাহাতে যথেষ্ট বাড়িবে।"

আমি জবাব দিলাম—"এবিষয়ে আমার কর্ত্তব্য স্থির হইয়াই আছে। আমি কাহারও নামে নালিশ করিব না ইহা নিশ্চয়। একথা আমি এখনই আপনাকে লিখিয়াও দিতেছি।"

এই কথা বলিয়া যাহা লেখা আবশ্যক আমি তাঁহাকে লিখিয়া দিলাম।

৪

শাস্তি

হাঙ্গামার দুইদিন পরেও, যখন আমি মিঃ এসকম্বের সহিত দেখা করিলাম তখন পর্য্যন্ত থানাতেই ছিলাম। আমাকে রক্ষা করার জন্য আমার সঙ্গে একজন সিপাই থাকিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তখন আর ওরূপ সাবধানতার আবশ্যকতা ছিল না।

যেদিন আমি নামিয়াছিলাম সেই দিনই অর্থাৎ হলুদ পতাকা নামাইবার সাথে সাথেই "নাতাল-অবজারভারের" প্রতিনিধি আমার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন ও তাহার উত্তরে আমি একে একে আমার নামে আরোপিত অভিযোগের জবাব সম্পূর্ণ ভাবে দেই। সার ফিরোজশার অনুগ্রহে আমি সেই সময় না লিখিয়া একটা বক্তৃতাও ভারতবর্ষে দিই নাই। আমার এই সকল বক্তৃতা ও লেখার সংগ্রহ আমার কাছে ছিল। আমি সেগুলি তাঁহাকে দিলাম এবং প্রমাণ করিয়া দিলাম যে, ভারতবর্ষে এমন একটা বিষয়ও বলি নাই, যাহা উহা অপেক্ষা কঠিন ভাষায় দক্ষিণ আফ্রিকায় না বলিয়াছি। আমি ইহাও দেখাইয়া দিলাম যে, 'কুরল্যাণ্ড' ও 'নাদেরী'তে যাত্রী আনা সম্পর্কে আমার অনুমাত্রও হাত ছিল না। যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের অনেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার পুরাণো অধিবাসী, এবং অধিকাংশই নাতালে নয়, ট্রান্সভালে থাকিতে আসিয়াছে। সে সময় নাতালে রোজগার তেমন সুবিধাজনক ছিল না, কিন্তু ট্রান্সভালে বেশ

রোজগার হইতেছিল। সেইজন্য অনেক ভারতীয় সেইখানে যাওয়াই স্থির করিয়াছিল।

এই খোলাসা খবরের ও তাহার উপর হাঙ্গামাকারীদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে অস্বীকার করার প্রভাব এই হইল যে, গোরারাই তাহাদের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রসমূহও আমাকেই নির্দ্দোষ বলিয়া সমর্থন করিয়াছিল এবং হাঙ্গামাকারীদিগকেই নিন্দা করিয়াছিল। এমনি করিয়া পরিণামে আমার লাভই হইল। আর আমার লাভ মানে আমার কার্য্যের লাভ। ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা বাড়িল ও আমার কাজ খুব সহজ হইল।

তিন চার দিনের মধ্যেই আমি নিজের বাড়ীতে গেলাম ও অল্প দিনেই এই ব্যাপার একেবারে মিটিয়া গেল। উকীল হিসাবেও আমার ব্যবসা উপরের ঘটনা হইতে বাড়িয়া গেল।

কিন্তু এদিকে যেমন ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা বাড়িল, অপর দিকে তেমনি তাহাদের প্রতি দ্বেষ-ভাবও বাড়িল। ভারতীয়দের ভিতরে যে দৃঢ়তার সহিত লড়িবার শক্তি আছে তাহা গোরারা এইবার বুঝিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভারতীয়দের সম্বন্ধে ভয়ও বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই নাতালের কাউন্সিলে এমন দুইটা আইন পাস হইল, যাহাতে ভারতীয়দের কষ্ট আরও বাড়ে। এই দুইটি আইনের একটি দ্বারা লোকসান হইল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসার। দ্বিতীয় আইন সৃষ্টি করিল ভারত-বাসীদের সেখানে যাওয়ার বিরুদ্ধে কড়া বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা। ভাগ্যক্রমে ভোটের অধিকার লইয়া লড়াইয়ের সময় এই নির্দ্ধারণ হয় যে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ভারতীয় বলিয়াই কোনও আইন করা চলিবে না, অর্থাৎ আইনে রং-ভেদ বা জাতিভেদ থাকিতে পারিবে না। সেইজন্য উপরের

দুই আইনের ভাষা এমন ছিল যে, তাহা সকলের সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু আসলে তাহা কেবল ভারতীয়দের উপরই চাপ দেওয়ার জন্য হইয়াছিল।

এই আইনগুলি পাশ হওয়ায় আমার কাজও খুব বাড়াইয়া দিল এবং ভারতীয়দের মধ্যে জাগৃতিও বাড়াইয়া দিল। এই আইনের সম্বন্ধে কোন ভারতীয়েরই অনভিজ্ঞ থাকা সঙ্গত নয়, ইহা সম্প্রদায় বুঝিল এবং আমরা সেইজন্য উহার অনুবাদও প্রকাশ করিলাম। এই আইন লইয়া তর্ক অবশেষে বিলাত পর্য্যন্ত গড়াইয়া ছিল। কিন্তু আইন নামঞ্জুর হইল না।

আমার অধিকাংশ সময়ই জন-সেবায় যাইতে লাগিল। মনসুখলাল নাজর নাতালে ছিলেন লিখিয়াছি। তিনি আমার সঙ্গেই থাকিয়া গেলেন এবং জন-সেবার কাজে খুব লাগিয়া গেলেন। আমার কাজ কতকটা হাল্কা হইল।

আমার অনুপস্থিতিতে শেঠ আদমজী মিঞা খান কংগ্রেস সম্পাদকের পদে থাকিয়া ভারি সুন্দরভাবে কার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন। সভ্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল এবং স্থানীয় কংগ্রেসের আয় প্রায় এক হাজার পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছিল। যাত্রীদের উপর যে হাঙ্গামা হইয়াছিল সে জন্য ও উক্ত আইনের জন্য যে জাগৃতি হইয়াছিল তাহার সুবিধা লইয়া আমি উহা আরও বাড়াইবার বিশেষ চেষ্টা করিলাম ও কালে প্রায় ৫০০০ পাউণ্ড হইল। কংগ্রেসের স্থায়ী ফণ্ড গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা আমার ছিল। ভাবিলাম—যদি উহা হইতে জমি খরিদ করিয়া ভাড়া দেওয়া যায়, তবে যে ভাড়া আসিবে তাহাতেই কংগ্রেস ব্যয় নির্ব্বাহ সম্বন্ধে আমরা নির্ভয় হইতে পারিব। সাধারণ অনুষ্ঠানের আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি আমার কল্পনা সাথাদিগকে জানাইলাম।

তাঁহারাও ইহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন। বাড়ী কিনিয়া তাহাতে ভাড়াটে বসাইলাম। সম্পত্তির জন্য ভাল ট্রাষ্ট গঠিত হইল। এই সম্পত্তি আজও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু উহা এখন আত্ম-কলহের হেতু হইয়াছে এবং ভাড়া আদালতে জমিতেছে।

এই দুঃখদায়ক ঘটনা আমি দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করার পর ঘটিয়াছে। কিন্তু সাধারণ সংস্থার জন্য স্থায়ী ফণ্ড গঠন করা সম্বন্ধে আমার ধারণা দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বদলাইয়া গিয়াছিল। অনেক সাধারণ সংস্থার উৎপত্তি ও তাহার পরিচালনার দায়িত্ব লওয়ার পর আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে, কোনও সাধারণ অনুষ্ঠান স্থায়ী ফণ্ডের উপর চালাইবার প্রযত্ন করা উচিত নহে। কারণ স্থায়ী ফণ্ড উহার নৈতিক অধোগতিরই বীজ বহন করিয়া আনে।

সাধারণ অনুষ্ঠান মানে লোকের সম্মতিতে ও লোকের অর্থে পরিচালিত সংস্থা। এই সংস্থায় যখন লোকের সাহায্য পাওয়া যায় না, তখন তাহার অস্তিত্ব রাখার অধিকারও চলিয়া যায়। স্থায়ী সম্পত্তির আয়ে পরিচালিত সংস্থা লোক-মতের উপর নির্ভর করে না, স্বাধীন হইয়া যায় বলিয়া দেখা যায় এবং কত সময় বিপরীত আচরণ পর্য্যন্ত করে। এই অভিজ্ঞতা আমাদের ভারতবর্ষেই ভূরি ভূরি হইয়াছে। ধর্ম্ম-সংস্থা বলিয়া প্রচলিত কত অনুষ্ঠানের হিসাব-কিতাব পর্য্যন্তও নাই। উহার ট্রাষ্টিরাই উহার মালিক হইয়া পড়িয়াছেন এবং কাহারও নিকট যে তাঁহাদের জবাব দিবার আছে একথাও তাঁহারা স্বীকার করেন না। সেই জন্য যেমন প্রকৃতি রোজ উপার্জ্জন করিয়া রোজ খায়, সাধারণ অনুষ্ঠানেরও সেইরূপ হওয়া সঙ্গত। যে অনুষ্ঠানকে লোকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয়, তাহা সাধারণ অনুষ্ঠান বলিয়া চালাইবার অধিকারও কাহারো নাই।

প্রতি বৎসর প্রাপ্ত চাঁদাই উহার জন-প্রিয়তার এবং পরিচালকদিগের বিশ্বস্ততার কষ্টি-পাথর। প্রত্যেক অনুষ্ঠানকেই এই কষ্টি-পাথরে কষা দরকার—ইহাই আমার মত।

আমার এই উক্তি যেন কেহ ভুল না বুঝেন। উপরের মন্তব্য সে সকল সংস্থার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে যাহাদের বাড়ী ইত্যাদির আবশ্যক। সাধারণ অনুষ্ঠানের চলতি খরচা লোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদা দ্বারাই মিটানো দরকার।

এই সিদ্ধান্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের সময় দৃঢ় হয়। এই ছয় বৎসরের মহাযুদ্ধ স্থায়ী ধনভাণ্ডার ছাড়াই চালানো হইয়াছে। উহাতে লক্ষ লক্ষ টাকার আবশ্যক হইয়াছে। এমন দিনের কথা আমার স্মরণ আছে যখন কালের খরচার টাকা কোথায় পাইব তাহা জানিতাম না। কিন্তু সে কথা পরে হইবে। উপরের কথার সমর্থন পাঠকগণ যথাস্থানে দেখিতে পাইবেন।

৫

বালকদের শিক্ষা

১৮৯৭ সালের জানুয়ারীতে আমি যখন ডারবানে নামিলাম তখন আমার সঙ্গে তিনটি বালক ছিল—আমার ভাগিনা—বয়স দশ বৎসর, বড় ছেলে—বয়স নয় বৎসর ও অপরটি—বয়স পাঁচ বৎসর। ইহাদিগকে কোথায় পড়াইব?

গোরাদের স্কুলে আমার ছেলেদিগকে পাঠাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহাতে কেবল অনুগ্রহ ও অপমান গ্রহণ করা হইত। কারণ সকল ভারতীয় ছেলে সেখানে পড়িতে পারে না। ভারতীয় ছেলেদের পড়ার জন্য খৃষ্টীয় মিশনারী স্কুল ছিল। সেখানেও আমার ছেলেদিগকে পাঠাইতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেখানে যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা আমার পছন্দ হইত না। গুজরাটী ভাষায় সেখানে কোথা হইতে পড়ানো হইবে? হয় ইংরাজী ভাষা, না হয়ত অশুদ্ধ তামিল ও হিন্দী ভাষার সাহায্যে পড়ানো যায়। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা করাও খুব সহজ ছিল না। এই সকল ও অন্যান্য অসুবিধা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আমি নিজে অবশ্য ছেলেদিগকে কিছু কিছু পড়াইতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাহা অল্পক্ষণ মাত্র ও অনিয়মিত ভাবে হইত। আমার মনোমত গুজরাটী কোনও শিক্ষক খুঁজিয়া পাই নাই। আমি কি করিব ঠিক করিতে পরিতেছিলাম না। আমার পছন্দ মত একজন ইংরাজ মাষ্টারের জন্য বিজ্ঞাপন দিলাম। মনে করিলাম, এমনি করিয়া যে শিক্ষক পাওয়া যাইবে তাহাকে দিয়া নিয়মিত পাঠ শিক্ষা দেওয়াইব, আর তাহার

উপর আমি যেমন চালাইতেছিলাম তেমনি চালাইব। এক ইংরাজ মহিলাকে মাসিক সাত পাউণ্ড বেতনে রাখিয়া দেওয়া হইল এবং এইরূপ ভাবে দিন কতক চলিল।

আমি ছেলেদের সহিত কেবল গুজরাটীতেই কথাবার্ত্তা বলিতাম। সেইজন্য তাহারা কিছু কিছু গুজরাটী শিখিতে পারিয়াছিল। আমার তখন মনে হইত, ছেলেদিগকে মা-বাপের নিকট হইতে দূরে রাখিতে নাই। সুব্যবস্থিত ঘরে ছেলেরা যে শিক্ষা পায়, স্কুল-বোর্ডিংএ তাহা পাইতে পারে না। সেইজন্য ছেলেদিগকে বেশীর ভাগ আমার সঙ্গেই রাখিয়াছিলাম। ভাগিনা ও বড় ছেলেকে আমি কয়েক মাস দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্কুল-বোর্ডিং-এ রাখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অল্পকাল পরেই আবার ফিরাইয়া আনি। পরে আমার বড় ছেলে বয়স হইলে নিজের ইচ্ছায় আহ্‌মেদাবাদের হাই স্কুলে পড়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িয়া চলিয়া আসে। আমার ভাগিনাকে আমি যাহা শিক্ষা দিতে পারিতাম তাহাতেই তাহার সন্তোষ হইত বলিয়া আমার মনে হয়। সে পূর্ণ যৌবনে দিন কয়েকের জন্য অসুখে ভুগিয়া স্বর্গে গিয়াছে। অপর তিন ছেলের কেহই স্কুলে যায় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সম্পর্কে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে দিন কতক নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিয়াছিল মাত্র।

ছেলেদের শিক্ষায় এই সকল পরীক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল। বালকদিগকে আমি নিজেই শিক্ষা দিতে চাহিলেও তত সময় দিতে পারি নাই। সেই জন্য এবং অন্য প্রকার ঘটনাচক্রে আমি তাহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারি নাই। আমার সকল ছেলেরেই এজন্য আমার উপর কম-বেশী অভিযোগ রহিয়াছে। যখনই তাহারা

এম-এ, বি-এ, অথবা কোনও ম্যাট্রিকুলেটের সংস্পর্শে আসে, তখনই তাহারা স্কুলে না পড়ার অসুবিধা দেখিতে পায়।

তাহা হইলেও আমার এই বিশ্বাস যে, তাহারা যে ব্যবহারিক জ্ঞান পাইয়াছে, মাতাপিতার যে সংসর্গ তাহারা পাইয়াছে, স্বাধীনতার যে দৃষ্টান্ত তাহারা দেখিতে পাইয়াছে, যদি আমি তাহাদিগকে কোনও স্কুলে পাঠাইবার আগ্রহ করিতাম, তাহা হইলে তাহারা তাহা পাইত না এবং তাহাদের সম্বন্ধে যে নিশ্চিন্ততা আজ আমার আছে তাহাও থাকিত না। যে সাদাসিধা জীবন যাপন করার ও সেবাভাব পোষণ করার শিক্ষা তাহারা আমার নিকট হইতে পাইয়াছে, আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিলাতের স্কুলে ভর্ত্তি হইলে, অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃত্রিম শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে তাহা তাহারা পাইত না। উপরন্তু তাহাদের কৃত্রিম জীবনযাত্রা আমার দেশ-সেবার কার্য্যেই বিঘ্ন-স্বরূপ হইত।

সেই জন্য যদিও আমি তাহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ লেখাপড়া শিখাইতে পারি নাই, তথাপি পরবর্ত্তীকালে তখনকার দিনের কথা বিচার করিয়াও আমার একথা মনে হয় না যে, আমি তাহাদিগকে আমার সাধ্যমত শিক্ষা দিই নাই। বস্তুতঃ আমার মনে সেজন্য কোন অনুতাপও নাই। আবার বিপরীত দিকে আমি আমার বড় ছেলের যে শোচনীয় পরিণাম দেখিতে পাই, তাহা আমার প্রথম বয়সের অর্দ্ধপক্ক জীবনের প্রতিধ্বনি বলিয়াই আমি মনে করি। যে সময়ের কথা তাহার স্মরণে মুদ্রিত হওয়ার মত, তাহার সেই বয়সটাতে ছিল আমার মোহের সময়—আমার ভোগের সময়। কিন্তু সে কেন মানিবে যে উহা আমার মোহের সময়? সে কেন মনে করিবে না যে, উহাই আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠকাল? সে কেন মনে করিবে না যে, পরে যে পরিবর্ত্তন

আসিয়াছিল তাহাই মোহ-উদ্ভূত—ভ্রান্তি-প্রসূত? বস্তুতঃ সে তাহা মনে করিতেও পারে। সে মনে করিতে পারে যে, সেই প্রথম বয়সটাতেই আমি জগতের জাগরণের পথে চলিতেছিলাম, আমি সুরক্ষিত ছিলাম এবং আমার পরবর্ত্তী যে পরিবর্ত্তন তাহা সূক্ষ্ম আত্মাভিমানের ফল, তাহা আমার অজ্ঞানের পরিচয়। যদি আমার ছেলেরা ব্যারিষ্টার ইত্যাদি পদবী পাইত তবে কি হানি হইত, তাহাদের উন্নতির পথে বাধা হওয়ার আমার কি অধিকার আছে, আমি কেন তাহাদিগকে ডিগ্রী ইত্যাদি লইতে দিয়া তাহাদের ইচ্ছা মত জীবন-পথ তাহাদিগকে লইতে দিই নাই?—এই রকমের প্রশ্ন আমার কতিপয় মিত্রও আমার নিকট অনেকবার করিয়াছেন। কিন্তু এই সব প্রশ্নের মধ্যে যে কোনও যুক্তি আছে তাহা আমার মনে হয় না। আমি অনেক ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন বালকদের উপর আমি ভিন্ন ভিন্ন রকম পরীক্ষা করিয়াছি, অথবা করিতে সাহায্য করিয়াছি। তাহার পরিণামও আমি দেখিয়াছি। এই সব ছেলেরা ও আমার ছেলেরা সমসাময়িক। আমি একথা স্বীকার করি না যে, আমার ছেলেদের অপেক্ষা তাহারা মনুষ্যত্বে বড় হইয়া গিয়াছে, অথবা তাহাদের নিকট হইতে আমার ছেলেদের বিশেষ কিছু শিখিবার আছে।

তাহা হইলেও আমার পরীক্ষার পরিণাম ত ভবিষ্যৎকালেই জানা যাইবে। এই বিষয়ে এখানে আলোচনা করার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা মনুষ্যজাতির উন্নতির প্রগতির ইতিহাসের অনুশীলন করিবেন, তাঁহারা গৃহ-শিক্ষা ও স্কুলের শিক্ষার পার্থক্য ও বাপ-মা নিজের জীবনে যে পরিবর্ত্তন করে তাহা ছেলেদের উপর কি ভাবে কার্য্য করে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিমাপ ইহাতে পাইবেন।

আবার সত্যের পূজারী দেখিতে পাইবেন যে, সত্যের প্রয়োগ তাঁহাকে কতদূর পর্য্যন্ত লইয়া যায়, স্বাধীনতা দেবীর উপাসক দেখিবেন যে, স্বাধীনতা দেবী কি দুর্ভোগ দিয়া থাকেন। ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য। যদি আমি ছেলেদিগকে আমার কাছে রাখিয়াও আমার আত্মসম্মান বলি দিতাম, যদি অপর ভারতীয়েরা যে শিক্ষা ছেলেদিগকে দিতে পারে না, সে শিক্ষা আমার ছেলেদিগকে দিতে আমার প্রবৃত্তি হইত, তবে আমার ছেলেদিগকে লেখা-পড়া শিখাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইলে তাহারা যে আত্মমর্য্যাদার ও স্বাধীনতার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা পাইত না। যেখানে স্বাধীনতা ও পুঁথিপড়া বিদ্যার মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হয় সেখানে কে না বলিবে যে, স্বাধীনতা পুঁথির বিদ্যা অপেক্ষা হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ?

সে সকল যুবককে আমি ১৯২০ সালে স্বাধীনতা-ঘাতক স্কুল ও কলেজ ছাড়িতে বলিয়াছিলাম, যাঁহাদিগকে আমি বলিয়াছিলাম যে, স্বাধীনতার জন্য নিরক্ষর থাকিয়া প্রকাশ্য রাস্তায় পাথর ভাঙ্গাও গোলামীর ভিতর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করা অপেক্ষা ভাল, তাঁহারা আজ হয়ত দেখিতে পারিবেন যে, আমার সে কথার মূল কোথায়।

৬

সেবাবৃত্তি

আমার ব্যবসা ঠিক চলিতেছিল, কিন্তু তাহাতে আমার তৃপ্তি ছিল না। জীবন খুব সরল করা চাই, কিছু কায়িক সেবা-কার্য্য করা চাই, এই প্রকার একটা আন্দোলন হৃদয়ের মধ্যে চলিতেছিল।

এমন সময় এক দিন এক আতুর—এক কুষ্ঠ-রোগ-পীড়িত ব্যক্তি আমাদের ঘরে আসিল। তাহাকে খাওয়াইয়া বিদায় করিতে মন চাহিল না। তাহাকে একটা কামরায় রাখিলাম, তাহার ঘা সাফ্ করিলাম ও তাহার সেবা করিলাম।

কিন্তু এমন করিয়া দীর্ঘদিন চালানো যায় না। বাড়ীতে তাহাকে রাখার মত ব্যবস্থা ছিল না, আমার সাহসও ছিল না। আমি তাহাকে গিরমিটিয়াদের জন্য সরকারী হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলাম।

কিন্তু তাহাতে মনের ক্ষুধা মিটিল না। এই রকম শুশ্রূষা প্রতিদিন যদি কিছু কিছু করা যায় তবে কত ভাল হয়! ডাক্তার বুথ ছিলেন সেণ্ট এডন্‌স্ মিশনারীদের কর্ত্তা। তিনি প্রতিদিনই সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন। তিনি বড় ভাল ও সদাশয় লোক ছিলেন। পার্শী রুস্তমজীর দানশীলতার সাহায্যে ডাঃ বুথের অধীনে একটি খুব ছোট হাসপাতাল খোলা হইল। এই হাসপাতালে শুশ্রূষাকারী (নার্স) রূপে কাজ করিতে আমার প্রবল ইচ্ছা হইল। সেখানে ঔষধ দেওয়ায় কাজ এক কি দুই ঘণ্টার জন্য থাকিত। সে জন্য একজন বেতনভোগী লোক অথবা স্বেচ্ছাসেবকের আবশ্যক ছিল।

এই কাজের ভার লওয়া ও ঐ সময়টা নিজের কাজ হইতে বাঁচানো ঠিক করিলাম। আমার ওকালতীর কাজ ছিল আফিসে বসিয়া পরামর্শ দেওয়া, অথবা দস্তাবেজ তৈরী করা, মামলা আপোষ করা। অল্প-স্বল্প মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টেও হইত। কিন্তু সে সমস্ত অবিতর্কিত (আনকন্‌টেষ্টেড্) মামলা ছিল। এই রকম মামলা থাকিলে তাহা মিঃ খানের ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া আমি হাসপাতালে সময় দিতাম। মিঃ খান আমার পরে আসিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গেই থাকিতেন।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে যাইতে হইত। যাইতে আসিতে ও হাসপাতালের কাজ করিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিত। এই কাজ করিয়া মনে কতকটা শান্তি পাইলাম। আমার কাজ ছিল রোগীদের ব্যারাম কি বুঝিয়া লইয়া ডাক্তারকে তাহা জানানো ও ডাক্তার যে ব্যবস্থা করেন সেই মত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া। এই ভাবে দুঃখী ভারতীয়দের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারা অধিকাংশই তামিল অথবা তেলুগু অথবা উত্তর ভারতীয় গিরমিটিয়া ছিল।

এই অভিজ্ঞতা উত্তর কালে আমার খুব কাজে আসিয়াছিল। বোয়ার যুদ্ধের সময় আমি যে শুশ্রূষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম তাহাতে ও অন্য রোগীর ব্যবস্থাতেও এই বিদ্যা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

ছেলেদের লালন-পালন করার প্রশ্নও আমার মনের ভিতর জাগরূক ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার আরো দুই পুত্র হয়। তাহাদিগকে কি করিয়া পালন করিব, এই প্রশ্নের সমাধানে আমার হাসপাতালের কাজ খুব সাহায্য করিয়াছিল। আমার স্বাধীন স্বভাব আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে—এখনো দিতেছে। প্রসবের সময় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিব, ইহা আমি ও আমার স্ত্রী ঠিক

করিয়াছিলাম। সেজন্য ডাক্তার ও দাই-এর ব্যবস্থা ছিলই। কিন্তু যদি ঠিক সময়ে ডাক্তার না পাওয়া যায় ও দাই পলায় তবে আমার কি অবস্থা হইবে? শিক্ষিতা দেশী দাই ভারতবর্ষেই বড় মিলে না, দক্ষিণ আফ্রিকার তাহা জোগাড় করা যে কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সকল কারণে আমি প্রসব করানো বিদ্যা অভ্যাস করিয়া লইলাম। ডাক্তার ত্রিভুবন দাসের 'মায়ের জন্য উপদেশ' নামক পুস্তক পড়িলাম। সেই বই পড়িয়া ও এদিক সেদিক হইতে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহার সাহায্যে আমি দুইটী শিশুকেই আতুড়ে শুশ্রূষা করিয়াছিলাম—একথা বলা যায়। দুইবারই দাই-এর সাহায্য অল্প দিনের জন্য লইয়াছিলাম, কোনবারেই সে দুই মাসের বেশী ছিল না। এ সাহায্যও প্রধানতঃ স্ত্রীর সেবার জন্য। ছেলেদের নাওয়ানো ধোয়ানোর কাজ প্রথম হইতেই আমি করিতাম। শেষ ছেলেটির জন্মের সময় আমি কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়া যাই। প্রসূতির বেদনা হঠাৎ আরম্ভ হয়। ডাক্তার বাড়ী ছিলেন না। দাই যোগাড় করিতেও সময় গেল। সে উপস্থিত থাকিলেও তাহার দ্বারা প্রসব করানোর কাজ চলিত না। প্রসবের সময়কার সমস্ত কার্য্যই আমার নিজ হাতে করিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্য বশতঃ এই কার্য্য আমি উক্ত পুস্তক হইতে সূক্ষ্মভাবে পড়িয়া লইয়াছিলাম বলিয়া আমাকে শঙ্কিত হইতে হয় নাই।

আমি দেখিলাম যে, যদি ছেলে পেলেকে ভাল ভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, তবে বাপ ও মা দু'জনেরই শিশুপালন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা দরকার। আমি এই বিষয় যে অনুশীলন করিয়াছিলাম তাহার লাভ পদে পদে পাইয়াছি। যে স্বাস্থ্য আমার

ছেলেরা আজ ভোগ করিতেছে, যদি শিশু পালন সম্বন্ধে আমার সাধারণ জ্ঞান না থাকিত তবে তাহা ভোগ করিতে পারিত না। আমাদের মধ্যে একটা ভুল বিশ্বাস আছে যে, প্রথম পাঁচ বৎসর শিশুদিগের শিক্ষা দেওয়ার কাল নয়। কিন্তু আসলে হইতেছে এই যে, প্রথম পাঁচ বৎসরে তাহারা যে শিক্ষা পায়, পরে সে রকম শিক্ষা আর পাইতে পারে না। শিশুদিগের শিক্ষা পেটে থাকিতেই আরম্ভ হয়—একথা আমি অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। গর্ভাধান কালে মাতা-পিতার দেহ ও মনের অবস্থার প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে। গর্ভকালে মায়ের প্রকৃতি, মায়ের আহার-বিহারের ভাল-মন্দ ফল লইয়াই বালক জন্ম গ্রহণ করে। জন্মিবার পরও মাতা-পিতার অনুকরণ করিতে থাকে। শিশু নিজে অসমর্থ বলিয়াই মাতা-পিতার উপর তাহার বিকাশ নির্ভর করে।

দম্পতির এই প্রকার সঙ্কল্প করা সঙ্গত যে, তাহারা কখনো ভোগ-লালসা তৃপ্ত করার জন্য সংসর্গ করিবে না। কেবল যখন সন্তান লাভের ইচ্ছা হইবে তখনই সংসর্গ করিবে। রতি-সুখ এক স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহা মনে করা ঘোর অজ্ঞতা। জনন ক্রিয়ার উপর সংসারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। সংসার ঈশ্বরের লীলার স্থান, তাঁহার মহিমার প্রতিবিম্ব। যাঁহারা একথা বুঝিবেন যে, এই জগৎ কার্য্য সুব্যবস্থিত ভাবে চলার জন্যই রতি-ক্রিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা ভোগের বাসনা সর্ব্বপ্রযত্নে রুদ্ধ করিবেন এবং রতি-কার্য্যের ফল স্বরূপ যে সন্তান হয় তাহাকে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দেওয়ার যোগ্য জ্ঞান লাভ করিয়া প্রয়োগ করিবেন এবং সেই জ্ঞানের ফল ভবিষ্যৎ বংশকেও দিয়া যাইবেন।

৭
ব্রহ্মচর্য্য—১

এখন ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বলার সময় আসিয়াছে। বিবাহের পর হইতেই এক-পত্নী-ব্রত আমার হৃদয়ে স্থান লইয়াছিল। স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করা আমার সত্যব্রতের অঙ্গ ছিল। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গেও যে ব্রহ্মচর্য্য পালন্ করিতে হইবে, ইহা আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কি ঘটনায় অথবা কি পুস্তকের প্রভাবে আমার মনে এই বিচারের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহার আমার এখন পরিষ্কার স্মরণ নাই। তবে এ পর্য্যন্ত স্মরণ আছে যে, ইহাতে রায়চন্দ ভাই-এর প্রভাবের প্রাধান্য ছিল।

এই বিষয়ে একটি কথোপকথন মনে পড়িতেছে। এক সময় আমি গ্ল্যাডষ্টোনের প্রতি মিসেস্ গ্ল্যাডষ্টোনের প্রেমের প্রশংসা করিতাম। পার্লামেণ্ট সভাতেও মিসেস্ গ্ল্যাডষ্টোন স্বামীর জন্য নিজে চা করিয়া দিতেন। এই ব্যবস্থা পালন করা এই বিখ্যাত দম্পতির একটা নিয়মের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল—একথা আমি কোথাও পড়িয়াছিলাম। উহা আমি কবিকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম এবং ইহার জন্য দম্পতির প্রশংসাও করিয়াছিলাম। রায়চন্দ ভাই বলিলেন—'ইহাতে আপনি মহত্বের কি দেখিলেন? যদি সেই মহিলা গ্ল্যাডষ্টোনের ভগ্নী হইতেন, অথবা তাঁহার বিশ্বস্ত চাকর হইত ও এমনি প্রেমের সহিত চা দিত তবে? এই রকম ভগ্নী, এই রকম চাকরের দৃষ্টান্ত কি আপনি আজও দেখিতে পান না? নারী জাতির পরিবর্ত্তে পুরুষ যদি এই প্রকার

প্রেম দেখাইত তবে কি আপনি অধিকতর আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না? আমি যাহা বলিলাম বিচার করিয়া দেখিবেন।"

রায়চন্দ্র নিজে বিবাহিত ছিলেন। আমার স্মরণ আছে, সে সময় তাঁহার সে কথা কঠিন বোধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার এই কথা আমাকে, চুম্বক যেমন লোহাকে আকৃষ্ট করে তেমনি ভাবে আকৃষ্ট করিল। পুরুষ চাকরের ঐ প্রকার বিশ্বস্ততার মূল্য ত স্ত্রীর বিশ্বস্ততার মূল্য অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী। পতি-পত্নীর মধ্যে ঐক্য হয়, এই জন্য উভয়ের মধ্যে প্রেমও হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই। চাকর মনিবে সেই প্রেমের বিকাশ দরকার। দিনে দিনে কবির বাক্যের প্রভাব আমার উপরে বাড়িতে লাগিল।

আমার পত্নীর সহিত কি প্রকারের সম্বন্ধ রাখিব? পত্নীকে ভোগের বাহন রূপে ব্যবহার করিলে পত্নীর প্রতি কি রকম বিশ্বস্ততা দেখানো হয়? যত দিন আমি ভোগের অধীন থাকিব তত দিন আমার পত্নী-ব্রাত্যের কিছুই মূল্য নাই। এখানে একথা বলা দরকার যে, আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ সত্ত্বেও, কোন দিনই পত্নীর দিক হইতে আক্রমণ আসে নাই। সেই দিক হইতে দেখিলে, আমি যখনই ইচ্ছা করি না কেন, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা আমার পক্ষে সহজ ছিল। কেবল আমার নিজের অক্ষমতা অথবা ভোগের আসক্তিই আমাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না।

আমি জাগ্রত হওয়ার পরেও দুইবার নিষ্ফল হইয়াছিলাম—প্রযত্ন করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হইয়াছিলাম। আমার এই বিফলতার হেতু—আমার চেষ্টার মূলে উচ্চ আদর্শ ছিল না, মুখ্য হেতু ছিল সন্তান উৎপাদন বন্ধ করা। উহার জন্য বাহ্যিক বস্তু ব্যবহার বিষয়ে আমি বিলাতে

কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম। ডাক্তার এলিন্সনের এই উপায় প্রচারের উল্লেখ আমি নিরামিষ আহার প্রসঙ্গে করিয়াছি। তাহার কতকটা ক্ষণিক প্রভাব আমার উপর হইয়াছিল, কিন্তু এই সব পদ্ধতি সম্বন্ধে মিঃ হিল্‌সের বিরুদ্ধতা, তাঁহার অন্তর-সাধনা, ও সংযম-সাধনার সমর্থনের প্রভাবই আমার মনে গভীর ভাবে রেখা পাত করে এবং সেই অনুভূতিই চিরস্থায়ী হইয়াছিল। সেই জন্য সন্তান উৎপাদনের অনাবশ্যকতা বুঝিয়া, সংযম-পালনের দিকেই আমার চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলাম।

সংযম পালন করিতে মুস্কিলের শেষই ছিল না। আলাদা আলাদা খাট করিলাম। রাত্রিতে খুব শ্রান্ত হইয়া শুইতে প্রযত্ন করিলাম। কিন্তু এই সকল চেষ্টার বেশী ফল আমি শীঘ্র দেখিতে পাই নাই। কিন্তু আজ বিগত দিবসের উপর চোখ ফিরাইয়া দেখি যে, এই সকল প্রযত্নই আমাকে অন্তিম বল দিয়াছিল।

অন্তিম সঙ্কল্প অবশেষে ১৯০৬ সালে গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। তখনো সত্যাগ্রহের আরম্ভ হয় নাই। তখন সত্যাগ্রহ কল্পনা আমার স্বপ্নেও ছিল না। বোয়ার যুদ্ধের পর নাতালে জুলু বিদ্রোহ হয়। সে সময় আমি জোহানেসবর্গে ওকালতী করিতাম। তখন স্থির করিয়াছিলাম যে, এই বিদ্রোহের সময় নাতাল সরকারকে আমার সেবা দেওয়া আবশ্যক। সেবা অর্পণ করিয়াছিলাম। সরকার সে সেবা গ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বর্ণনা অতঃপর করিব। এই সেবার বিষয় লইয়াই আমার মনে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয়। আমার যেমন স্বভাব, আমি একথা আমার সাথীদের সহিত আলোচনা করি। আমার বোধ হইল যে, সন্তানোৎপত্তি ও সন্তান-পালন জন-সেবার বিরোধী। এই জুলু বিদ্রোহ সম্পর্কে সেবা-কার্য্যে যোগ দেওয়ার জন্য আমি আমার

জোহানেসবর্গের বাড়ী উঠাইয়া দিই। সযত্নে সাজানো বাড়ী মাস খানেক ব্যবহার করিতে-না-করিতেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীও ছেলেদিগকে ফিনিক্সে রাখিয়া আমি সেবক-দল লইয়া বাহির হইয়া পড়ি। সেই সময় যখন কঠিন কুচ-কাওয়াজ (মার্চ্চ) করিতেছিলাম, তখনই আমার মনে হয় যে, যদি আমি লোক-সেবায় তন্ময় হইতে চাই তবে আমার পুত্রান্বেষণ ও বিত্তান্বেষণের স্পৃহা ত্যাগ করা দরকার এবং বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম পালন করা আবশ্যক।

এই 'বিদ্রোহ' ব্যাপারে আমাকে দেড় মাসের বেশী থাকিতে হয় নাই। কিন্তু এই ছয় সপ্তাহ আমার জীবনের অতিশয় মূল্যবান সময়। ব্রতের মহত্ব আমি এই সময় খুব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমি দেখিলাম যে, ব্রত বন্ধন নহে, উহা স্বাধীনতার দ্বার স্বরূপ। এতদিন পর্য্যন্ত যে আমি প্রযত্নে সফলতা পাই নাই তাহা কেবল আমার সঙ্কল্প স্থির ছিল না বলিয়া—আমার শক্তির উপর আমার বিশ্বাস ছিল না বলিয়া। সেই জন্য আমার মন অনেক চঞ্চলতা ও অনেক বিকারের বশীভূত হইত। আমি দেখিলাম যে, মানুষ ব্রতের বন্ধন না লইলে মোহের বন্ধনে পড়ে। ব্রতের বন্ধন গ্রহণ করিলেই ব্যভিচার হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ এক-পত্নীর সম্বন্ধের বন্ধন গ্রহণ যথার্থ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে। 'আমি চেষ্টা করার সার্থকতা মানি, কিন্তু ব্রত দ্বারা বদ্ধ হইতে চাই না'—এই প্রকার উক্তি দুর্ব্বলতার লক্ষণ, উহা এক প্রকার সূক্ষ্ম ভোগেরই ইচ্ছা। যে বস্তু ত্যাজ্য তাহা সর্ব্বথা ত্যাগ করার দ্বারা হানি কি করিয়া হইতে পারে? যে সাপ আমাকে দংশন করিতে আসিতেছে তাহাকে আমরা ত্যাগ করার চেষ্টা করি না, নিশ্চয় পূর্ব্বক ত্যাগ করি। আমি জানিয়াছি যে, কেবল প্রযত্নের উপর

থাকা মানে মৃত্যু। প্রযত্ন করার মধ্যে সর্পের ভয়ঙ্করত্বের জ্ঞানের অভাব আছে। সেই জন্য যখন কোনও বস্তু আমরা ত্যাগ করিতে প্রযত্ন মাত্র করি, তখন সেই বস্তুর ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট দৃষ্টি নাই একথা বলা যায়। 'আমার সঙ্কল্প যদি পরে বদলায় তবে'—এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া আমরা অনেক সময় ব্রত লইতে ভয় পাই। এই যুক্তির মধ্যে স্পষ্ট দর্শনের অভাব আছে। সেই জন্যই নিষ্কুলানন্দ বলিয়াছেন ঃ—

'ত্যাগ না টেকেরে বৈরাগ বিনা।'

যখন কোনও বস্তু বিশেষের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তখন সে বিষয়ে ব্রত গ্রহণ অনিবার্য্য বস্তু হয়।

৮

ব্রহ্মচর্য্য—২

ভালরকম বিবেচনা করিয়া ও অনেক আলোচনা করার পর ১৯০৬ সালে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত লইয়াছিলাম। ব্রত লওয়ার জন্য আমি পত্নীর সহিত পূর্ব্বে পরামর্শ করি নাই, কেবল ব্রত লওয়ার সময় করিয়াছিলাম। তাঁহার দিক হইতে আমি কোনও বিরোধ পাই নাই।

ব্রত লইতে কষ্টকর বোধ হইতেছিল। আমার শক্তির অল্পতা অনুভব করিতেছিলাম। মনের বিকার কি করিয়া চাপিয়া রাখিব? নিজের পত্নীর সহিত বিকারযুক্ত সম্বন্ধের ত্যাগ—নূতন জিনিষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহা হইলেও ব্রত লওয়া যে কর্ত্তব্য তাহাও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমার ইচ্ছা শুদ্ধ ছিল। ঈশ্বর সঙ্কল্প-রক্ষার শক্তি দিবেন ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

আজ কুড়ি বৎসর পরে সেই ব্রতের বিষয় স্মরণ করিয়া আমার আনন্দ-মিশ্রিত বিস্ময় বোধ হয়। সংযম পালন করার বৃত্তি ১৯০১ সাল হইতেই প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু এখন যে স্বাধীনতা ও আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলাম, ১৯০৬-এর পূর্ব্বে তাহা ভোগ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তখন আমি বাসনাবদ্ধ ছিলাম এবং যে কোনও মুহূর্ত্তে বাসনার বশীভূত হইয়া পড়িতে পারিতাম। কিন্তু এখন আর বাসনা আমার উপর চাপিয়া বসিতে সমর্থ হইল না। এখন হইতে ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা আমার নিকট দিন দিন বেশী করিয়া ধরা পড়িতে লাগিল। আমি ফিনিক্সে ব্রত লইয়াছিলাম।

আহতদিগকে শুশ্রূষা করার কাজ হইতে অবকাশ পাওয়ার পরই আমাকে জোহানেসবর্গে যাইতে হয়। আমি সেখানে গেলাম ও এক মাসের মধ্যেই সত্যাগ্রহের ভিত্তি স্থাপিত হইল। কে জানে—এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত লওয়ার আকাঙ্ক্ষা সত্যাগ্রহের জন্য তৈরী করিয়া দেওয়ার নিমিত্তই আমাকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছিল কিনা! সত্যাগ্রহের কল্পনা আমি পূর্ব্ব হইতে রচনা করি নাই। উহার উৎপত্তি অনায়াসে হইয়াছিল—অনিচ্ছা-লব্ধ ভাবেই হইয়াছিল। আমি দেখিতেছি যে, আমি তৎপূর্ব্বে যে সকল পদক্ষেপ করিয়াছিলাম—ফিনিক্স-গমন, জোহনেস-বর্গের বাড়ীর সমস্ত খরচা কমাইয়া ফেলা, পরিশেষে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ—এ সমস্তই সত্যাগ্রহের জন্য আমাকে প্রস্তুত করার কল্পেই হইয়াছিল।

ব্রহ্মচর্য্যের সম্পূর্ণ পালন মানে ব্রহ্ম-দর্শন। এই জ্ঞান আমি শাস্ত্রের মধ্য হইতে পাই নাই। এই অর্থ আমার নিকট ধীরে ধীরে অনুভব-সিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ঐ সম্পর্কে শাস্ত্রবাক্য আমি পরে পড়িয়াছিলাম। ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যেই শরীর-রক্ষা, বুদ্ধি-রক্ষা ও আত্মার রক্ষা। এ সকল আমি ব্রত লওয়ার পর দিন দিন অধিক করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচর্য্য এখন এক ঘোর তপশ্চর্য্যার বদলে আমার নিকট এক রসময় অনুভূতির বস্তু হইয়া উঠিল এবং ইহার আশ্রয়েই আমার জীবন পরি-চালিত হইতে লাগিল। এখন হইতে উহার সৌন্দর্য্যের নিত্য নূতনত্ব দর্শন করিতে লাগিলাম।

যদিও আমি ব্রহ্মচর্য্য হইতে রস উপভোগ করিতেছিলাম তথাপি ইহাতে কাঠিন্য ছিল না—একথা যেন কেহ না মনে করেন। আজ ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তবুও তাহার কঠিনতা অনুভব করিতেছি। ইহা যে অসি-ধারা-ব্রত, ইহা যে তলবারীর ধারের উপর দিয়া চলার ন্যায়

কঠিন ব্রত, তাহাও প্রতিদিন অধিক করিয়া বুঝিতেছি। ইহার জন্য নিরন্তর জাগৃতির আবশ্যকতা দেখিতেছি।

ব্রহ্মচর্য্য যদি পালন করিতে হয় তবে আস্বাদের ইন্দ্রিয় রসনার উপর সংযম রাখা আবশ্যক। যদি স্বাদ জয় করা যায়, তবে ব্রহ্মচর্য্য অতিশয় সহজ হয়—একথা আমি নিজে অনুভব করিলাম। সেইজন্য আমার আহারের পরীক্ষা কেবল নিরামিষ আহারের দিক হইতে নয়, ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা করার দৃষ্টি হইতেই করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচারীর খাদ্য অল্প, সাদাসিধা, বিনা মসলায় ও স্বাভাবিক অবস্থায় হওয়া চাই। ইহা আমি ব্যবহার করিয়া অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি।

ব্রহ্মচারীর খাদ্য যে ফল-মূল তাহা আমি ছয় বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। যখন আমি শুষ্ক ও টাটকা ফলাদির উপর নির্ভর করিতাম, তখন আমি যে প্রকার বিকারশূন্যতা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা খাদ্য পরিবর্ত্তনের পর আর অনুভব করিতে পারি নাই। ফলাহারের সময় ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সহজ ছিল, দুধ খাওয়ার পর উহা কঠিন হয়। ফলাহার ত্যাগ করিয়া দুধপান কেন আরম্ভ করিলাম তাহা যথাস্থানে বলা হইবে। এখানে কেবল এইটুকুই বলা যথেষ্ট যে, ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে দুগ্ধ খাওয়া যে বিঘ্নকারক তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে কেহ যেন একথা বুঝিবেন না যে, ব্রহ্মচারী মাত্রকেই দুগ্ধপান ত্যাগ করিতে হইবে। খাদ্যের প্রভাব ব্রহ্মচর্য্যের উপর কতটা, সে বিষয় অনেক পরীক্ষা করার আবশ্যকতা আছে। খাদ্য হিসাবে দুধের ন্যায় স্নায়ু-গঠনকারক ও তেমনি সহজ পাচ্য কোনও ফল আছে কিনা তাহা এ পর্য্যন্তও আমি জানিতে পারি নাই। ফল অথবা শস্য ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন বলিয়া কোনও ডাক্তার বা বৈদ্যও আমাকে দেখাইতে পারেন নাই। সেইজন্য

দুধকে বিকার-উপস্থিতকারী দ্রব্য জানিয়াও উহা ত্যাগ করার পরামর্শ কাহাকেও দিতে পারি না।

ব্রহ্মচর্য্যের জন্য বাহ্য সাধনের মধ্যে যেমন আহার্য্যের প্রকার ও পরিমাণের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, তেমনি উপবাসেরও আবশ্যক। ইন্দ্রিয় এত বলবান যে, তাহাকে যদি চারিদিক হইতে—উপর হইতে, নীচ হইতে, দশদিক হইতে ঘিরিয়া রাখা যায় তবেই তাহা বশে থাকে। খোরাক না দিলে যে ইন্দ্রিয় সকল কাজ করিতে পারে না একথা সকলেই জানে। সুতরাং ইন্দ্রিয় দমন করার জন্য ইচ্ছাকৃত উপবাস যে খুব সাহায্য করে, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। কোন কোন লোক উপবাস করিয়াও নিষ্ফল হয়। তাহার কারণ এই যে, উপবাসই সব করিয়া দিবে এইরূপ মনে করিয়া তাহারা মাত্র স্থূল উপবাস করে। মনে মনে তাহা ছাপ্পান্ন রকম ভোগ করে, উপবাস কালেও উপবাসের পর কি খাইবে তাহারই আস্বাদ লইতে থাকে, আর তাহার পর অভিযোগ করে যে, উপবাসে না হইল স্বাদেন্দ্রিয়ের সংযম, না হইল জননেন্দ্রিয়ের সংযম। উপবাসের সত্য উপযোগিতা তখনই দেখা যায়, যখন উপবাসের সহিত মন দেহকে দমন করিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ মনের বিষয়-ভোগের প্রতি বৈরাগ্য আসা চাই। বিষয়ের মূল মনেই রহিয়াছে। সাধনার সম্পর্কে উপবাসাদির শক্তি পরিমিত। কারণ উপবাস করিয়াও মানুষ বিষয়াসক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু উপবাস না করিয়া বিষয়াসক্তি সমূলে নাশ করা সম্ভব নহে। সেই হেতু ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য উপবাস অনিবার্য্য অঙ্গ।

যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের মধ্যে অনেকে বিফল হয়, কেননা তাহারা খাওয়া-পরা দেখা ইত্যাদি বিষয়ে যদৃচ্ছা

চলিয়াও ব্রহ্মচর্য্য রাখিতে চায়। তাহাদের এ আকাঙ্ক্ষা গ্রীষ্মকালে শীত-ঋতুর অনুভূতি পাওয়ার ইচ্ছার মত। সংযমী ও স্বেচ্ছাচারীর, ভোগী ও ত্যাগীর মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই। সাম্য যদি দেখা দেয় তবে তাহাও সে ক্ষেত্রে উপরে উপরে মাত্র। ভেদ ভাল রকমের আসা চাই। চক্ষুর ব্যবহার উভয়েই করে, ব্রহ্মচারী দেব দর্শন করে, ভোগীর চোখ নাটকাভিনয়ে লীন থাকে। কানের ব্যবহার উভয়েই করে, একে ঈশ্বর-ভজন শোনে, অপরে বিলাসের গীত শুনিয়া মজা পায়। জাগিয়া থাকে দুইজনেই, একজন জাগ্রত অবস্থায় হৃদয়-মন্দির-বিহারী রামকে পূজা করে, আর অপরে নাচ-রঙ্গের ধুমে শোওয়ার কথা ভুলিয়া যায়। দুই-জনেই খায়, একজন শরীরকে চালাইয়া লওয়ার জন্য মুখকে প্রাপ্য ভাড়া দেয়, অপরে স্বাদের জন্য অনেক বস্তু দেহে প্রবেশ করাইয়া উহাকে দুর্গন্ধ যুক্ত করিয়া ফেলে। এই ভাবে উভয়ের ভিতর আচার-বিচারের ভেদ থাকিবেই ও এই ভেদ প্রতিদিন বাড়িয়াই যাইবে—কমিবে না।

ব্রহ্মচর্য্য মানে—মন, বাক্য দেহদ্বারা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের সংযম। এই সংযমের জন্য উপরের লিখিত রূপে ত্যাগের আবশ্যকতা আছে তাহা আমি প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। যেমন ত্যাগের ক্ষেত্রের সীমাই নাই, তেমনি ব্রহ্মচর্য্যের মহিমারও সীমা নাই। এই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য অল্প চেষ্টায় প্রাপ্তব্য নয়। কোটি কোটি লোকের পক্ষে ইহা কেবল আদর্শ-রূপেই বিদ্যমান থাকিবে। প্রযত্নশীল নিজের ত্রুটির দর্শন নিত্যই করিবে, নিজের হৃদয়ের কোণে কোণে লুকানো বিকারের দিকে দৃষ্টি দিবে ও তাহা দূর করার চেষ্টা করিবে। যে পর্য্যন্ত চিন্তার উপর এমন অধিকার না পাওয়া যায় যে, বিনা ইচ্ছায় মনে একটা চিন্তাও আসিবে না, ততক্ষণ সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য হয় নাই। চিন্তা মাত্রই বিকার। উহাকে

বশ করা মানে মনকেই বশ করা। মনকে বশ করা, বায়ুকে বশ করা অপেক্ষাও কঠিন। তাহা হইলেও আত্মার পক্ষে এই অধিকার লাভ সম্ভব। এই কার্য্য কঠিন বলিয়াই ইহা অসাধ্য—একথা কেহ মনে করিবেন না। ইহাই পরম অর্থ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য। পরম অর্থের জন্য যে পরম প্রযত্ন আবশ্যক, তাহাতে ত বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

কিন্তু এই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য-লাভ যে কেবলমাত্র প্রযত্নের দ্বারাই হয় না, তাহা আমার কাছে ধরা পড়িল দেশে আসিয়া। তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি মোহের ভিতরে ছিলাম একথা বলা যায়। ফলাহার দ্বারা চিত্ত-বিকার সমূলে নষ্ট হয়, এই প্রকার আমি মানিয়া লইয়াছিলাম এবং অভিমান বশতঃ মনে করিতাম যে, আমার আর কিছু করার নাই।

কিন্তু আমার ব্রহ্মচর্য্যলাভের চেষ্টার সকল কথা বলার স্থান এ অধ্যায় নহে। ইতিমধ্যে এইটুকু বলিয়া রাখা যায় যে, আমি যে ব্রহ্মচর্য্য মানে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ বলিয়াছি, সেই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য যে পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে যদি তাহার নিজের প্রযত্নের সহিত ঈশ্বরের উপর শ্রদ্ধা রাখে তবে তাহার নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

সেইজন্য রামনাম ও রাম-কৃপা মোক্ষার্থীর পক্ষে অন্তিম সাধন। আমি ভারতবর্ষে ফিরিবার পর এই কথা বুঝিতে পারিয়াছি।

* দেহধারী যখন নিরাহার থাকে তখন তাহার সে বিষয়ের ভোগ মান্দা পড়িয়া থাকে, কিন্তু রস যায় না। সে রসও ঈশ্বর সাক্ষাৎকার দ্বারা শান্ত হয়। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৯।

৯

সরল জীবন-যাত্রা

ভোগময় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা টিকিল না ; বাড়ীখানা পরিপাটি করিয়া সাজাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমাকে মোহে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। ঐ ভাবে সংসার-যাত্রা আরম্ভ করিয়া আমি খরচ কমাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ধোপার খরচা খুব লাগিত। কাপড় কাচিয়া দিতেও এত বিলম্ব করিত যে দুই তিন ডজন সার্ট ও কলারেও আমার চলিত না। কলার রোজ বদলাইতে হয় ; সার্ট রোজ না হইলেও একদিন অন্তর বদলাইতে হয়। ইহাতে দুই দিক হইতে ব্যয় পড়ে, ইহা আমার নিকট অনাবশ্যক বোধ হইল এজন্য আমি কাপড় কাচার সরঞ্জাম জোগাড় করিলাম। কাপড় কাচা সম্বন্ধে বই পড়িয়া ধোপার বিদ্যা শিখিয়া লইলাম। স্ত্রীকেও শিখাইলাম। কাজ বাড়িল, কিন্তু নূতনত্বের আনন্দও পাওয়া গেল।

আমার হাতের কাচা প্রথম কলারটার কথা কখনো ভুলিতে পারিব না। এরারুট বেশী করিয়া দিয়াছিলাম, ইস্ত্রীও পুরা গরম হইয়াছিল না। কলার পুরিয়া যাইবে বলিয়া ইস্ত্রী বেশী করিয়া চাপি নাই। কলার শক্ত হইল বটে, কিন্তু উহা হইতে এরারুট ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এই কলার পরিয়াই কোর্টে গেলাম। ইহাতে আমাকে লইয়া ব্যারিষ্টারদের মজা করার সুবিধা হইল। কিন্তু ঠাট্টা সহ্য করার শক্তি তখনও আমার যথেষ্ট ছিল।

তাঁহাদিগকে বলিলাম—"কলার নিজে ধুইয়াছি ও এরারুট কিছু বেশী পড়িয়াছিল, প্রথম চেষ্টা বলিয়া এরারুট উঠিয়া যাইতেছে। ইহাতে আমার কোন ক্ষতি হইতেছে না, উপরন্তু আপনাদের সকলকার আমোদ হইতেছে। বেশ ভালই ত!"

"ধোপা পাওয়া যায় না নাকি?"—একজন মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এখানকার ধোপার খরচা আমার কাছে অসম্ভব বোধ হয়। একটা কলার ধোওয়ার খরচ প্রায় কলারের দামের সমান। তাহার উপর আবার ধোপার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ইহা অপেক্ষা নিজে নিজে কাচিয়া লওয়াই আমি ভাল বলিয়া মনে করি।"

এই স্বাবলম্বনের সৌন্দর্য্য আমি মিত্রদিগকে বুঝাইতে পারি নাই।

একথা জানাইয়া রাখিতেছি যে, কালক্রমে আমি ধোপার কাজ বেশ ভাল রকম শিখিয়াছিলাম। বাড়ীতে ধোওয়া, ধোপার ধোওয়া অপেক্ষা কোন ক্রমেই খারাপ হইত না। আমার কলার ঠিক ধোপার ধোওয়া কলারের মত শক্ত ও চক্‌চকে হইত।

স্বর্গগত মহামতি গোবিন্দ রাণাডে গোখলেকে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ একখানা উত্তরীয় দান করিয়াছিলেন। উত্তরীয়খানা গোখলে বিশেষ যত্নের সহিত রাখিতেন ও বিশেষ দিনে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সম্মানের জন্য জোহানেসবর্গের ভারতীয়েরা যে 'ভোজ দিয়াছিল, সেও ঐ রকম একটা বিশেষ দিন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে, এইখানেই তিনি খুব বড় একটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সুতরাং এ দিনেও তিনি সেই উত্তরীয় ব্যবহার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উহা কোঁচ্‌কাইয়া গিয়াছিল, ইস্ত্রী করার আবশ্যক ছিল। ধোপার নিকট হইতে তাড়াতাড়ি ইস্ত্রী করিয়া আনা সম্ভব ছিল

না। কাজেই আমি আমার ধোপার বিদ্যা উহার উপর প্রয়োগ করিতে চাহিলাম।

"তোমার ওকালতীর উপর বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু এই উত্তরীয়ের উপর তোমার ধোপাগিরির পরীক্ষা করিতে দিব না। যদি উত্তরীয়খানা খারাপ করিয়া ফেল? ইহার মূল্য তুমি জানো?" —এই বলিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত উপহার-প্রাপ্তির ইতিহাস শুনাইলেন।

আমি বিনয়ের সহিত জানাইলাম—"আমি কথা দিতেছি যে, আমার হাতে উহা খারাপ হইবে না।" তিনি তখন ইস্ত্রী করার অনুমতি দিলেন। তারপর তাঁহার নিকট হইতে আমার ধোপাগিরির সার্টিফিকেট পাইলাম। অতঃপর সারা জগৎও যদি আমার ধোপাগিরির কুশলতার সম্বন্ধে সন্দেহ রাখে তাহাতে কি আসে যায়।

যেমন ধোপার অধীনতা হইতে আমি মুক্তি পাইলাম তেমনি নাপিতের অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়ারও ব্যাপার ঘটিল। বিলাতে যাহারা যায় তাহারা সকলেই নিজে নিজে দাড়ি কামাইতে শিখে। কিন্তু নিজের চুল নিজে কাটিতে শিখে—একথা আমি জানি না। প্রিটোরিয়াতে আমি একবার এক ইংরাজ নাপিতের দোকানে গেলাম। সে দৃঢ়তার সহিত আমাকে কামাইতে অস্বীকার করে, তাহার অস্বীকারের ভিতর অপমানের ভাবও ছিল। আমার দুঃখ হইল। আমি চুল ছাঁটাই ক্লিপ খরিদ করিলাম ও আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল ছাঁটিলাম। সম্মুখের চুল এক রকম ছাঁটা হইল। কিন্তু পিছনের চুল ভাল ছাঁটা হইল না। কোর্টে গেলাম, আমাকে দেখিয়া হাসাহাসি পড়িয়া গেল।

"আপনার মাথায় কি ইন্দুর লাগিয়াছিল?"

আমি বলিলাম—"আরে না! আমার কালো মাথা কি ধলা নাপিত স্পর্শ করিতে পারে? তার চাইতে যেমন তেমন করিয়া নিজের হাতেই আমার চুল ছাঁটা ঢের ভাল।"

এই উত্তরে মিত্রেরা আশ্চর্য্য হইলেন না। দেখিতে গেলে সে নাপিতের কোনও দোষ ছিল না। সে যদি কালো রং-এর লোকের চুল ছাঁটে, তবে তাহার গোরা খরিদ্দার ছুটিয়া যাইবে। আমাদের উচ্চবর্ণের চুল যে নাপিত ছাঁটে আমারই কি তাহাকে অস্পৃশ্যদিগকে কামাইতে দিই! ইহার প্রতিদান দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি একবার নয়, অনেকবার পাইয়াছি। ইহা আমাদের নিজেদের দোষেরই পরিণাম জানিয়া উহাতে কখনো আমার রাগ হয় নাই।

স্বাবলম্বন ও সাধাসিধা চাল-চলনের জন্য আমার আগ্রহ ইহার পর যে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল সে কথা যথা স্থানে আসিবে। ঐ ইচ্ছার মূল পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, উহা গজাইয়া উঠার জন্য কেবল জল ঢালার আবশ্যক ছিল। সে জল অনায়াসেই আসিয়া পড়িল।

১০

বোয়ার যুদ্ধ

১৮৯৭ হইতে ১৮৯৯ সাল পর্য্যন্ত আমার জীবনের অনেক ঘটনা বাদ দিয়া এখন বোয়ার যুদ্ধের কথায় আসিব। যখন যুদ্ধ বাধে তখন বোয়ারদের প্রতিই আমার সহানুভূতি ছিল। কিন্তু এই রকম অবস্থায়, ব্যক্তিগত ধারণার উপর কার্য্য করার অধিকার নাই বলিয়া তখন আমি বিশ্বাস করিতাম। আমার মনে এই বিষয় লইয়া যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছি। সেইজন্য এখানে সে আলোচনা করার আর ইচ্ছা নাই। জিজ্ঞাসুকে সেই ইতিহাস পড়িতে বলি। এখানে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রিটিশ-রাজের প্রতি আমার আনুগত্য-রক্ষার প্রেরণাই আমাকে এই যুদ্ধে বলপূর্ব্বক টানিয়া নামাইয়াছিল। আমার এই বোধ হইয়াছিল যে, যদি ব্রিটিশ-প্রজা বলিয়া প্রজার অধিকার চাহিয়া থাকি, তবে ব্রিটিশ-প্রজা বলিয়া বৃটিশ-রাজ্য রক্ষা-কল্পে যে যুদ্ধে তাহাতে যোগ দেওয়াও আমার ধর্ম্ম। তখন আমি ইহাও মনে করিতাম যে, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ উন্নতি বৃটিশ-শাসনাধীনেই হইতে পারে।

সেই জন্য যতগুলি পাইলাম সঙ্গী সংগ্রহ করিয়া আহতদের শুশ্রূষা করার জন্য একটা দল দাঁড় করাইলাম।

এ পর্য্যন্ত এখানকার ইংরাজেরা সাধারণতঃ ইহাই মনে করিত যে, ভারতীয়েরা কোনও বিপদজনক কার্য্যে যাইতে বা স্বার্থ ছাড়া আর

কিছু বুঝিতে পারে না। এই জন্য অনেক ইংরাজ মিত্র আমাকে নিরাশা-পূর্ণ জবাব দিয়াছিলেন। কেবল ডাক্তার বুথ খুব উৎসাহ দিয়াছিলেন। তিনিই আমাদিগকে আহতকে শুশ্রূষা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। আমরা ডাক্তারের নিকট হইতে যোগ্যতার সার্টিফিকেট পাইলাম। মিঃ লাটন ও স্বর্গগত মিঃ এসকম্বও আমাদের এই উদ্যম অনুমোদন করিলেন। অবশেষে যুদ্ধে সেবা করিতে দেওয়ার অনুমতির জন্য আমরা সরকারের নিকট আবেদন করি। সরকার ধন্যবাদ দিয়া জানাইলেন যে, তখন আমাদের সেবা-কার্য্যের আবশ্যকতা নাই।

কিন্তু এই 'না' আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। ডাক্তার বুথের সাহায্য লইয়া তাঁহারই সঙ্গে আমি নাতালের 'বিশপের' সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার দলের লোকেরা ভারতীয় খৃষ্টান ছিল। বিশপের নিকট আমার যাচ্ঞা খুবই ভাল লাগিল। তিনি সাহায্য করিবেন বলিয়া কথা দিলেন। ইতিমধ্যে অদৃষ্টও আমাদের সাহায্য করিল। যে প্রকার মনে করা গিয়াছিল বোয়ারদের দৃঢ়তা ও বীরত্ব তাহা অপেক্ষা বেশী বলিয়া দেখা গেল। সরকারের অনেক সৈন্য সংগ্রহ করা (রংরুট) দরকার হইল। তখন সরকার আমাদের সাহায্য লইতে স্বীকার করিলেন।

আমরা যে দল গঠন করিয়াছিলাম তাহাতে প্রায় ১১০০ লোক ছিল, এবং ইহার প্রায় ৪৪ জন নায়ক ছিল। প্রায় তিনশত জন স্বাধীন ভারতীয় এই দলে যোগদান করিয়াছিলেন, বাদ-বাকী সকলে ছিল গির-মিটিয়া। ডাক্তার বুথ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। দলের কাজ সহজ ছিল, কেন না আমাদিগকে গুলি-গোলার সীমানার বাহিরে কাজ করিতে

হইত এবং রেড্‌ক্রশের * চিহ্নের জন্যও বিপদ খুব বেশী ছিল না। তাহা হইলেও সঙ্কটের সময় গোলা-বারুদের সীমার মধ্যে গিয়াও আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এই বিপদের মধ্যে আমাদিগকে নামানো হইবে না, সরকার নিজ ইচ্ছাতেই এইরূপ সর্ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পিয়ন্‌কোপ-এর পরাজয়ের পরে অবস্থা বদলায়। তখন জেনারেল বুলার সংবাদ দিলেন যে, যদিও আমরা বিপদের সীমার মধ্যে কার্য্য করিতে বাধ্য নই, তবুও যদি আমরা আহত সিপাই ও আমলাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া ডুলিতে করিয়া লইয়া যাই তাহা হইলে সরকার উপকৃত হইবেন। বিপদের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাজ করিবার জন্য আমাদের আগ্রহই ছিল। সুতরাং স্পিয়ন্‌কোপ-এর যুদ্ধের পরে গোলা-বারুদের সীমানার মধ্যে যাইয়া কার্য্য করিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা করি নাই।

সকলকেই অনেক সময় রোজ কুড়ি পঁচিশ মাইল মার্চ্চ করিতে হইত, যাওয়ার বেলায় আহত সৈন্যকে ডুলিতে করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতে হইত। যে সকল আহত যোদ্ধাকে আমাদের বহন করিতে হইয়াছিল তাহার মধ্যে জেনারেল উডগেট্‌ প্রভৃতিও ছিলেন।

ছয় সপ্তাহের পর আমাদের দলকে বিদায় দেওয়া হয়। স্পিয়ন্‌কোপ ও ভালক্রানজের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ-সেনাপতিরা অকস্মাৎ স্থির করেন যে, লেডিস্মিথ প্রভৃতি স্থানের উদ্ধারের চেষ্টা আপাততঃ স্থগিত রাখা হইবে এবং ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে

* রেড ক্রশ মানে লাল স্বস্তিক। যুদ্ধের সময় এই চিহ্নযুক্ত পাটা সুশ্রূষাকারীদের বাম হাতে বাঁধা থাকে। নিয়ম এই যে, শত্রু তাহাদিগকে আঘাত করিবে না। এই সমস্ত বিবরণের জন্য "দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ" দেখুন।

বেশী সৈন্য আসিয়া না পৌঁছানো পর্য্যন্ত কাজ আস্তে আস্তে চালানো হইবে।

আমাদের ক্ষুদ্র কার্য্য তখন খুবই প্রশংসালাভ করিয়াছিল এবং ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। "ভারতীয়েরাও একই সাম্রাজ্যের সন্তান" এই বলিয়া গান পর্য্যন্ত রচিত হয়। জেনারেল বুলার আমাদের দলের কার্য্য সরকারী পত্রের মধ্যে প্রশংসা করেন। দলপতিরা যুদ্ধের মেডলও পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

ভারতীয় সম্প্রদায় বেশ ভালরূপেই সংগঠিত হইয়াছিল। গিরমিটিয়াদের সংস্পর্শে আমি খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই আসিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে একটা নবজাগরণের সাড়া দেখা দিয়াছিল এবং হিন্দু-মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, মাদ্রাজী, গুজরাটী, সিন্ধী ইত্যাদি সকলেই, ভারতবাসী বলিয়া একটা দৃঢ় অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই মনে করিলেন—এইবার ভারতীয়দের দুঃখ দূর হওয়া উচিত। গোরাদের ব্যবহারেও সে সময় খুব পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল।

লড়াইয়ের মধ্যে গোরাদের সহিত মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। আমরা হাজার হাজার 'টমী'র সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তাহারাও আমাদের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করিত ও আমরা তাহাদের সেবার জন্য আসিয়াছি বলিয়া উপকৃত বোধ করিত।

মানুষের স্বভাব দুঃখের সম্মুখে কেমন ভাবে গলিয়া যায় তাহার একটা মধুর স্মৃতির কথা এখানে না লিখিয়া পারি না। আমরা চিএভেলীর ক্যাম্পের দিকে যাইতেছিলাম। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই লর্ড রবার্টস্‌এর পুত্র লেফ্‌টনান্ট রবার্টস্‌ আহত হইয়া মারা যান। লেফ্‌টনান্ট

রবার্টসের মৃতদেহ বহন করার সম্মান আমাদের উপর পড়িয়াছিল। সেদিন রৌদ্রের তেজ বড় প্রখর ছিল। আমরা কুচ করিয়া চলিতেছিলাম। সকলেই পিপাসার্ত্ত হইয়াছিল। জল পান করার যোগ্য এক ছোট ঝর্‌ণা রাস্তায় ছিল। কিন্তু কে আগে জল খাইবে? আমি স্থির করিলাম আগে 'টমীরা' পান করুক, তাহার পর আমরা পান করিব। 'টমীরা' অনুরোধ করিতে লাগিল আমাদিগকেই প্রথমে পান করিবার জন্য। সুতরাং আমাদেরই মধ্যে অনেকবার "আপনারা আগে—আমরা পরে" এই ধরণের সাধাসাধি চলিয়াছিল।

১১

সহর সাফাই ও দুর্ভিক্ষে চাঁদা

সমাজের কোনও অঙ্গ যদি অব্যবহৃত থাকে তবে তাহা আমার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বোধ হয়। সম্প্রদায়ের দোষ ঢাকা, অথবা নিজের দোষ না সুধরাইয়া বেশী করিয়া অধিকার দাবী করা—এ ইচ্ছা আমার কখনও হইত না। সেই জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগের প্রতিকার করিতে আমি সেখানে বাস করার প্রারম্ভকাল হইতেই চেষ্টা করিতেছিলাম। অভিযোগটি কতকাংশে সত্য। ভারতীয়েরা নিজেদের বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখে না, অত্যন্ত নোংরা হইয়া থাকে—একথা প্রায়ই শুনিতে হইত। এই অভিযোগ দূর করার জন্য সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিজেদের গৃহে সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ডারবানে যখন মড়কের ভয় উপস্থিত হইল প্রকৃত পক্ষে তখনই বাড়ী বাড়ী গিয়া দেখার কাজ আরম্ভ হয়। এই কার্য্যে মিউনিসাপালিটীর আমলারাও যোগ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের সম্মতি লইয়াই উহা আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা কার্য্য-ভার গ্রহণ করায় তাঁহাদের কাজ যেমন হাল্‌কা হইয়াছিল, ভারতীয়দের কষ্টও তেমনি কম হইয়াছিল। কেন না সাধারণতঃ যখন মড়কের উপদ্রব আরম্ভ হয়, তখন আমলারা অধীর হইয়া উঠেন, সকলের উপর কড়া নিয়ম প্রয়োগ করেন, এবং যাঁহাদের উপর তাঁহাদের বিরাগ থাকে তাহাদের উপর অসহ্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু এবার সম্প্রদায় নিজেদের ঘর-বাড়ী সাফ্ করার

কাজ নিজেদের হাতে লওয়ায় তাহাদের উপর কঠোর ব্যবস্থা আর প্রযুক্ত হয় নাই।

এই ব্যাপারে আমার কতকগুলি দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় হইয়াছিল। স্থানীয় সরকারের নিকট আমাদের দাবী জানাইতে যত সহজে সম্প্রদায়ের সাহায্য পাইয়াছিলাম, লোকের নিকট হইতে তাহাদের কর্ত্তব্য-পালন করার কার্য্য আদায় করিতে তেমন সহায়তা পাইলাম না। কোনও স্থানে অপমানিত হইলাম, কোনও স্থানে বিনয়ের সহিত উদাসীনতা প্রদর্শিত হইল। নোংরা সাফ্ করার কথাই লোকের ভাল লাগিত না। সুতরাং এজন্য কেমন করিয়া লোকে পয়সা খরচ করিবে? লোকের নিকট হইতে কোনও কাজ আদায় করিতে যে অসীম ধৈর্য্যের প্রয়োজন, এই ব্যাপারে সে কথাও খুব ভাল রকমে বুঝিলাম। সংস্কার করিবার গরজ হইতেছে সংস্কারকের। যে সমাজই হোক্ না কেন, সংস্কারের চেষ্টা করিলেই সেইখানে বিরোধ বাধে, বিদ্বেষ জাগে, এমনকি প্রাণান্তকর উৎপীড়ন সুরু হয়। সংস্কারক যাহা সংস্কার মনে করে, সমাজ তাহাকে অন্যায়ই বা কেন মনে করিবে না? আর যদি অন্যায় বলিয়া মনে না-ও করে, তাহার প্রতি উদাসীন কেন থাকিবে না?

কিন্তু সে যাহাই হোক্, এই আন্দোলনের ফল হইয়াছিল। ভারতীয়রা বাড়ী-ঘর সাফ্ রাখার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কতকটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমলাদিগের নিকট আমার প্রতিষ্ঠাও বাড়িয়াছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল অভিযোগ করা, অথবা অধিকার দাবী করাই আমার কাজ নয়। অভিযোগ করিতে বা পাওনা আদায় করিতে আমি যেমন দৃঢ়, নিজেদের ভিতরে সংস্কার সাধন করিতেও ততটাই উৎসাহী ও দৃঢ়।

সহর সাফাই ও দুর্ভিক্ষে চাঁদা

এখন সমাজকে আর একদিকে আকর্ষণ করার কাজ বাকী ছিল। ভারতবর্ষের প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এবং সময় উপস্থিত হইলে সেই কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়কে তৎপর করিয়া তোলার প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষ দরিদ্রের দেশ। লোকে টাকা রোজগারের জন্যই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বিদেশে যায়। সুতরাং তাহাদের উপার্জ্জনের কতক অংশ ভারতবর্ষের বিপদের দিনে দেওয়া সঙ্গত। ১৮৯৭ সালে একটা দুর্ভিক্ষ ও ১৮৯৯ সালে ততোধিক কষ্টকর আর একটা দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষে দেখা দেয়। এই উভয় দুর্ভিক্ষের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভাল রকম সাহায্য পাঠানো হইয়াছিল। প্রথম বারের দুর্ভিক্ষের সময় যে রকম টাকা তোলা হইয়াছিল, পরবর্ত্তী দুর্ভিক্ষের সময় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা উঠিয়াছিল। এই সময় আমরা ইংরাজদের কাছেও চাঁদা তুলিয়াছিলাম। তাহাদের নিকট হইতে ভালই সাড়া পাইয়াছিলাম। গিরমিটিয়ারাও নিজেদের অংশ পূর্ণ করিয়াছিল।

এই দুই দুর্ভিক্ষের সময় যে প্রথার প্রবর্ত্তন হয় এখন পর্য্যন্তও তাহাই কায়েম রহিয়াছে। ভারতবর্ষে কোনও সার্ব্বজনীন সঙ্কটের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভালরকম সাহায্য সেখানকার ভারতীয়েরা পাঠাইয়া আসিতেছেন।

এই ভাবে ভারতীয়দের সেবা করিতে গিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় একটির পর আর একটি শিক্ষা অনায়াসে লাভ করিয়াছিলাম। সত্য এক বিশাল বৃক্ষ, উহার সেবা করিলে উহা হইতে অনেক ফল লাভ হয়। উহার অন্তই নাই। যতই উহার ভিতর গভীর ভাব প্রবেশ করা যায়, ততই উহা হইতে রত্ন পাওয়া যায়, সেবার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়া যায়।

১২

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন

লড়াইয়ের কাজ হইতে ছাড়া পাওয়ার পর আমার মনে হইল যে, আমার কার্য্যক্ষেত্র এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়, ভারতবর্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়া কিছু কিছু সেবা যে না করা যায় তাহা নয়, কিন্তু মনে হইতেছিল—এখানকার প্রধান কাজ যেন পয়সা উপার্জ্জন করাই।

দেশের মিত্রদিগের আকর্ষণও আমাকে দেশের দিকেই টানিতেছিল। আমার বোধ হইল যে, দেশে গেলে আমি বেশী কাজ করিতে পারিব। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ মিঃ খান ও মনসুকলাল নাজরই চালাইয়া লইতে পারিবেন।

আমি সাথীদিগের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলাম। অনেক কষ্টে সর্ত্ত রাখিয়া তাঁহারা এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। সর্ত্ত এই হইল যে—যদি এক বৎসরের মধ্যে আমাকে সম্প্রদায় আবশ্যকতা জানায় তবে আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। এ সর্ত্ত আমার নিকট কঠিন বোধ হইয়াছিল। কিন্তু আমি তাঁহাদের ভালবাসায় বদ্ধ হইয়াছিলাম।

কাচেরে তাঁতনে মনে হরজীয়ে বাঁধি।
জেম জেম তাণে তেম তেমনীরে
ধনে লাগী কটারী প্রেমনী॥

মীরা বাঈ-এর এই উপমা কতক অংশে আমার সম্বন্ধেও খাটিত।

"পঞ্চই পরমেশ্বর।" মিত্রদের কথাও আমি তুচ্ছ করিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাদিগকে কথা দিলাম ও তাঁহাদের অনুমতি পাইলাম।

এই সময় আমার সহিত নাতালেরই নিকট সম্বন্ধ ছিল বলা যায়। নাতালের ভারতীয়েরা আমাকে প্রেমামৃতে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। নানা স্থানে বিদায় অভিনন্দন দেওয়ার জন্য সভা হইয়াছিল ও প্রত্যেক স্থান হইতে মূল্যবান ভেট আসিয়াছিল।

১৮৯৬ সালে যখন আমি দেশে ফিরিয়াছিলাম তখনও ভেট পাইয়াছিলাম। কিন্তু এবারকার ভেট ও সভার দৃশ্যে আমি অভিভূত হইলাম। ভেটের মধ্যে সোনা-রূপার জিনিষ ত ছিলই হীরার দ্রব্যও ছিল।

এই সকল জিনিষ গ্রহণ করার আমার কি অধিকার আছে? এই সকল যদি লই, তবে সম্প্রদায়ের সেবার পরিবর্ত্তে আমি অর্থ লই নাই একথা কেমন করিয়া মনকে বুঝাইব? এই ভেটের মধ্যে সামান্য মাত্র আমার মক্কেলদের দেওয়া। সেগুলি বাদ দিলে বাকী সমস্তই আমার জন-সেবার জন্য। তাহা ছাড়া আমার মনে মক্কেল ও অন্য সাথীদের মধ্যে কোনই ভেদ ছিল না। প্রধান মক্কেলেরা সকলেই জন-সেবার কাজে সাহায্য করিতেন।

এই ভেটের মধ্যে আবার একটা পঞ্চাশ গিণির হার কস্তুরবাঈএর জন্য ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও এই সমস্তই যে আমার সেবার কার্য্যের জন্য দেওয়া, একথা অস্বীকার করা যায় না। যে সন্ধ্যায় আমাকে প্রধান ভেটগুলি দেওয়া হইয়াছিল সে রাত্রি আমার বিনিদ্র অবস্থায় কাটিল। আমি গৃহের ভিতর পায়চারি করিয়া কাটাইলাম, কোনও রাস্তা পাইলাম না। শত শত টাকা মূল্যের ভেট ফিরাইয়া দেওয়া কষ্টকর, রাখা ততোধিক কষ্টকর। আমি যদি এই

ভেট-সকল রাখি, তবে আমার ছেলেদের কি হইবে? স্ত্রীর কি হইবে? তাহাদিগকে ত সেবার শিক্ষাই দেওয়া হইতেছিল। সেবার মূল্য লইতে নাই ইহাই সর্ব্বদা বুঝানো হইত। ঘরে দামী গহনা ছিল না। সরলতা বাড়িয়া যাইতেছিল, এই অবস্থায় সোণার ঘড়ি কে ব্যবহার করিবে? সোণার চেন, হীরার আংটি কে ব্যবহার করিবে? গহনা-পত্রের মোহ আমি অপরকে ছাড়িতে বলিতেছিলাম, আমার এই গহনা-জহরৎ কোন্ প্রয়োজনে আসিবে?

আমার এই সকল দ্রব্য রাখা হইতে পারে না—ইহা স্থির করিলাম। আমি পার্শী রুস্তমজী ও অন্যান্যকে ট্রাষ্টী বানাইয়া এই সমুদয় গহনা তাহাদিগকে সম্প্রদায়ের স্বার্থে ব্যবহার করিতে দিয়া এক পত্র লিখিলাম। সকাল বেলায় স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত পরামর্শ করিয়া আমার ভার লাঘব করা স্থির করিলাম।

স্ত্রীকে বুঝানো কঠিন হইবে, আমি তাহা জানিতাম। আর ইহাও জানিতাম যে, ছেলেদের বুঝাইতে এতটুকুও কষ্ট হইবে না। ছেলেদিগকেই উকীল লাগাইব ঠিক করিলাম।

ছেলেরা চট্ করিয়াই বুঝিল। তাহারা বলিল—"এ গহনা-পত্রে আমাদের প্রয়োজন নাই। আপনি সমস্তই ফিরাইয়া দিন। যদি কখনও এই জিনিষের দরকার হয়, তবে আপনি নিজেই কি দিতে পারিবেন না?"

আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমাদের মাকেও তোমরা বুঝাইয়া দিবে ত?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সেত আমাদেরই কাজ। এখন কি এই সকল গহনা মা পরিতে পারিবেন? এ সকল ত আমাদের জন্যই তাঁহার

রাখিতে ইচ্ছা হইবে। আর আমরা যদি না রাখিতে চাই তবে কেন তিনি ফেরৎ দিবেন না ?"

কিন্তু কাজের বেলা এত সহজে মিটে নাই।

"তোমার না হয় দরকার নাই—তোমার ছেলেদের না হয় দরকার নাই। ছেলেদিগকে তুমি যেমন নাচাইবে তেমনি নাচিবে। ভাল, আমাকেই না হয় না দিলে, কিন্তু আমার বৌদের বেলা ? তাহাদের ত দরকার হইবে ? কে জানে কাল কি ঘটে ? এত ভালবাসিয়া যে জিনিষ দিয়াছে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া যায় না।"—এই ধরণের বাক্য-প্রবাহ চলিল, তাহার সহিত অশ্রুধারাও যোগ দিল। কিন্তু ছেলেরা দৃঢ় রহিল। আমিও টলিলাম না।

আমি নরম সুরে বলিলাম—"ছেলেরা ত বিবাহ করিবে, কিন্তু আমরা কি উহাদিগকে বাল্যকালেই বিবাহ দিব ? বড় হইয়া যদি বিবাহ করিতে হয় তবে করিবে। আমাদের ঘরে কি সৌখীন বৌ আনিতে হইবে নাকি ? আর যদি তখন গহনার দরকারই হয় তবে আমি কি নাই নাকি ?"

"হ্যাঁ, তোমাকে জানি। আমার গহনাগুলি কে নিয়াছে, তুমিই না ? আচ্ছা আমাকে না হয় না-ই পরিতে দিলে, কিন্তু বউদের জন্যও কি রাখিতে দিবে না ? ছেলেদের ত আজ হইতেই বৈরাগী বানাইতেছ ! এ গহনা-পত্তর ফিরাইয়া দেওয়া যায় না, আর আমার হারের উপর তোমার অধিকারটাই বা কি ?

"কিন্তু এ হার তোমার সেবার জন্য, না আমার সেবার জন্য দিয়াছে ?" —আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আচ্ছা, তাহাই হইল। কিন্তু তোমার সেবা ত আমারই সেবা।

আমাকে যে রাতদিন খাটাইয়াছ তাহা সেবা নয়? যাহাকে ইচ্ছা বাড়ীতে রাখিয়াছ, আর আমাকে দিয়া দাসীগিরি করাইয়াছ তাহার কি?"

এ সকলগুলিই তীক্ষ্ণ বাণ, কতকগুলি একেবারে মর্ম্মে গিয়া ঘা দিয়াছিল, কিন্তু গহনা-পত্তর ত আমাকে ফিরাইয়া দিতেই হইবে। অনেক কথাবার্ত্তার পর আমি যেমন তেমন করিয়া তাঁহার সম্মতি লইলাম। ১৮৯৬ সালে ও ১৯০১ সালে যত কিছু ভেট পাইয়াছিলাম সমস্ত ফেরৎ দিলাম। উহার ট্রাষ্ট গঠন করা হইল এবং আমার ইচ্ছা বা ট্রাষ্টিদের ইচ্ছানুযায়ী জন-সেবার জন্য ব্যয় হইবে—এই সর্ত্তে ব্যাঙ্কে রাখা হইল। টাকার আবশ্যক হওয়ায় এই গহনা বেচিতে চাহিয়া উহার বদলে অনেকবার টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। আজও বিপদকালে ব্যবহারের জন্য উহা জমা আছে ও উহাতে আরো অর্থ জমিতেছে।

এই কার্য্য করার জন্য আমাকে কখনো পশ্চাত্তাপ করিতে হয় নাই। পরে কস্তুর-বাঈও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কাজটা ঠিকই হইয়াছিল। ইহাতে আমরা অনেক প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

আমি ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, জন-সেবকের কোনও মূল্যবান ভেট লইতে নাই।

১৩

দেশে

দেশে যাওয়ার জন্য বিদায় লইলাম। রাস্তায় মরিসস্ পড়ে। সেখানে ষ্টীমার অনেক দিন থামিয়া ছিল। সেই জন্য মরিসসে নামি ও সেখানকার অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করি। সেখানকার গভর্ণর সার চার্লস ক্রসের আতিথ্যে এক রাত্রি কাটাই।

ভারতবর্ষে পঁহুছিয়া কিছুদিন ভ্রমণে ব্যয় হয়। ইহা ১৯০১ সালের কথা। এই বৎসর কংগ্রেস কালকাতায় বসিয়াছিল। দীনশা এদুলজী ওয়াচা সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেসে যাইতেই হইবে—স্থির করিলাম। এই আমার প্রথম কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা।

যে গাড়ীতে বোম্বাই হইতে ফিরোজশা মেহ্‌তা যাইতেছিলেন আমিও সেই গাড়ীতেই ছিলাম। তাঁহাকে আমার দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বলিতে হইবে। মাঝে একটা ষ্টেশনে আমি তাঁহার কামরায় উঠিব এইরূপ কথা ছিল। তিনি নিজে একটি সেলুনে যাইতেছিলেন। তাঁহার বাদশাহী খরচ ও আড়ম্বরের পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম। যে ষ্টেশনে তাঁহার কামরায় যাওয়ার কথা সেই ষ্টেশনে সেখানে গেলাম। সে সময় সেখানে দীনশাজী ও চীমনলাল শেতলবাড় বসিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজনীতির আলোচনা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া সার ফিরোজ শা বলিলেন—"গান্ধী তোমার কাজ হইবে না। তুমি যে প্রকার বলিতেছ সে প্রকার প্রস্তাব অবশ্য আমরা পাশ করিয়া দিব। কিন্তু আমাদের নিজের দেশেই আমাদের কোন্ ন্যায্য পাওনা মিলে?

আমি ত বুঝি যে, আমাদের দেশেই আমাদের কর্তৃত্ব যতদিন না হয় ততদিন উপনিবেশে আমাদের অবস্থা বদলাইতে পারে না।"

আমি ত বসিয়া পড়িলাম। সার চিমনলালেরও সেই মত দেখিলাম। সার দীনশা আমার দিকে করুণ নয়নে চাহিলেন।

আমি বুঝাইবার কিছু চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বোম্বাইয়ের মকুটহীন রাজাকে আমার মত লোক কি বুঝাইবে? কংগ্রেসে প্রস্তাব উপস্থিত করার আজ্ঞা পাইলাম, ইহাতেই আমাকে খুসী হইতে হইল।

"ওহে গান্ধী! আমাকে তোমার প্রস্তাবটা দেখাইয়া দিও"—এই বলিয়া সার দীনশা আমাকে উৎসাহিত করিলেন। আমি ধন্যবাদ দিলাম। পরবর্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই নামিয়া নিজের কামরায় আসিলাম।

কলিকাতায় পঁহুছিলাম। সহরের প্রধান ব্যক্তিরা নেতাদিগকে প্রসেশন করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করাইয়া লইয়া গেলেন। আমি একজন স্বেচ্ছাসেবককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমি কোথায় যাইব? সে আমাকে রিপণ কলেজে লইয়া গেল। সেখানে অনেক প্রতিনিধির স্থান হইয়াছিল। আমার সৌভাগ্যবশতঃ, যে বিভাগে আমি ছিলাম সেই বিভাগেই লোকমান্য ছিলেন। আমার স্মরণ হয় একদিন পরে তিনি আসিয়াছিলেন। যেখানে লোকমান্য সেখানে ছোটখাট একটা দরবার জমিয়া থাকে। আমি যদি চিত্রকর হইতাম, তবে যেমন ভাবে খাটের উপর তিনি বসিয়াছিলেন তাহার এক টা চিত্র আঁকিতে পারিতাম। আজও সেই বৈঠকের কথা এমনই পরিষ্কার মনে আছে। তাঁহার সহিত দেখা করিতে যে অসংখ্য লোক আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজনের নামই কেবল আজ মনে পড়ে—তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মতিবাবু।

ইঁহাদের সেই উচ্চ হাস্য ও শাসন-কর্ত্তাদের অন্যায় আচরণের গল্প ভুলিবার নয়।

এখন এই ক্যাম্পের সম্বন্ধে কিছু বলিব।

স্বেচ্ছাসেবকদের পরস্পরের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছিল। যে কাজ যাহাকে দেওয়া যায় সে কাজ তাহার নহে, সে তখনি আর এক জনকে ডাকে, সে আবার ডাকে আর এক জনকে। আর প্রতিনিধিদের কথা—তাহারা এ দিকও নয় সে দিকও নয়।

আমি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিলাম। তাহাদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছু কথা শুনাইলাম। তাহারা তাহাতে একটু লজ্জিত হইল।

তাহাদিগকে আমি সেবার মর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। তাহারা কিছু বুঝিল। কিন্তু সেবার জ্ঞান ত ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠে না। তাহার জন্য প্রথমতঃ ইচ্ছা থাকা চাই, তাহার পর অভিজ্ঞতা চাই। এই সরল সৎ-স্বভাব স্বেচ্ছাসেবকদের ইচ্ছা খুবই ছিল। কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাহারা কোথা হইতে পাইবে? কংগ্রেস বৎসরে তিন দিন হইয়া চুকিয়া যায়। সারা বৎসরে মাত্র তিনদিনের শিক্ষায় কি হইবে?

যেমন স্বেচ্ছাসেবক, প্রতিনিধিরাও তেমনি। তাঁহাদেরও ঐ কয়দিনেরই শিক্ষা। নিজের হাতে তাঁহারা কিছুই করিবেন না। সব কথাতেই কেবল হুকুম। "স্বেচ্ছাসেবক, এটা আন—ওটা আন," —এই চলে।

অস্পৃশ্যতা এখানেও খুব মানা হইতেছিল। দ্রাবিড়ী পাকশালা একেবারে একান্তে ছিল। এই প্রতিনিধিদিগের 'দৃষ্টি-দোষও' লাগিত।

তাঁহাদের জন্য কলেজ কম্পাউণ্ডে বেড়া দিয়া একটী স্থান ঘিরিয়া লওয়া হইয়াছিল। সে ঘরের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়। লোকের খাওয়া দাওয়া সব তাহারই ভিতরে। রান্না ঘর নয়ত যেন একটা সিন্দুক। কোথাও তাহার ফাঁক নাই।

ইহা বর্ণ-ধর্ম্মের অপব্যবহার বলিয়া আমার বোধ হইল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের যদি এই প্রকার অস্পৃশ্যতার শুচি-বাই থাকে তাহা হইলে এই প্রতিনিধিদিগকে যাহারা পাঠাইয়াছে তাহাদের অস্পৃশ্যতা যে কতদূর, তাহারই ত্রৈরাশিক কষিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

সেখানে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার অন্তই ছিল না। জল থই থই করিতেছিল। পায়খানার সংখ্যা কম ছিল। সেখানকার দুর্গন্ধের কথা আজও আমার স্মরণ আছে। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে আমি তাহা দেখাইলাম। তাহারা টানা সুরে বলিল—"ও ত মেথরের কাজ।" আমি ঝাঁটা চাহিলাম। তাহারা খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, পরে ঝাঁটা আনিয়া দিল। পায়খানা সাফ্ করিলাম। কিন্তু সে কেবল নিজের সুবিধার জন্য। ভিড় এত ছিল, পায়খানা এত খারাপ ছিল যে, প্রতিবার ব্যবহারের পরই সাফ্ করা দরকার। উহা করা আমার শক্তির অতিরিক্ত ছিল। সুতরাং আমরা নিজের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু সাফ্ করিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট হইতে হইল। আমি দেখিলাম—অপরের এই নোংরায় বাধে না।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। রাত্রে কেহ কেহ কামরার বারান্দাতেই প্রস্রাব করিত। সকালে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে আমি ময়লা দেখাইলাম। কেহ সাফ্ করিতে প্রস্তুত হইল না। সাফ করার সম্মান তখন আমি একাই গ্রহণ করিলাম।

আজ যদিও এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তথাপি এরূপ অবিবেচক প্রতিনিধি আজও আছে যাহারা ক্যাম্পের যেখানে সেখানে মল-ত্যাগ করিয়া স্থান খারাপ করে, এবং সকল স্বেচ্ছাসেবক তাহা সাফ করিতে প্রস্তুত হয় না।

আমি দেখিলাম যে, এই প্রকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় যদি কংগ্রেস বেশী দিন ধরিয়া চলার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মড়ক লাগা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়।

১৪

কেরাণী ও বেয়ারা *

কংগ্রেস বসিতে এখনো এক কি দুই দিন বাকী ছিল। আমি স্থির করিলাম যে, কংগ্রেসের আফিস যদি আমার সেবা গ্রহণ করে তবে আমি সেবা করিব, অভিজ্ঞতাও বাড়িবে।

যে দিন কলিকাতায় পঁহুছিলাম সেই দিনই স্নানাহার করিয়া কংগ্রেস আফিসে গেলাম। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুত ঘোষাল সম্পাদক ছিলেন। ভূপেনবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া সেবা করিতে চাহিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন :—

"আমার কাছে ত কোনও কাজ দেখিতেছি না, তবে মিঃ ঘোষাল হয়ত কিছু কাজ দিতে পারেন। আপনি তাঁহার কাছে যান।"

আমি ঘোষাল মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কাছে ত কেরাণীর কাজ আছে, উহা করিবেন?"

আমি জবাব দিলাম—"আমার সাধ্যায়ত্ত যে কোনো কাজ দিবেন তাহাই করিব। সেইজন্যই ত আপনার নিকট আসিয়াছি।"

"তুমি ঠিক বলিয়াছ, যুবক।" তাঁহার পার্শ্বে যে সব স্বেচ্ছাসেবক দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন,—"ইনি কি বলিলেন, তোমরা শুনিলে?"

* 'বেয়ারা' ইংরাজী-বেয়ারার শব্দের অপভ্রংশ—যে লোক ব্যক্তিগত সেবা করে—ফরমাস খাটে। কলিকাতায় এই শব্দটির ব্যবহৃত হয়

তারপর আমার দিকে তাকাইয়া আবার বলিলেন—"ঐ রহিয়াছে এক তাড়া চিঠি, আর এই নাও আমার সম্মুখের চেয়ার। তুমি বসিয়া যাও। তুমি ত দেখিতেছ যে, আমার নিকট শত শত লোক আসিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গেই দেখা করিব না, যে সব বাজে চিঠি-পত্র আসিয়াছে তাহারই জবাব দিব? আমার কাছে এমন কেরাণী নাই যাহাকে দিয়া এই কাজ করাইয়া লইতে পারি। এই সকল চিঠির অনেকগুলির মধ্যেই কিছু নাই। এখন তুমি সবগুলি দেখিয়া লও। যেগুলির উত্তর দেওয়ার সেগুলির উত্তর দাও। যে গুলির জন্য আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইও।" আমি এই বিশ্বাস লাভ করিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া গেলাম।

শ্রীযুত ঘোষাল আমার পরিচয় জানিতেন না। পরে তিনি আমার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐ চিঠির জবাবের কাজ আমার কাছে খুব সহজ লাগিল। প্রথম তাড়াটা আমি তখনই শেষ করিয়া ফেলিলাম। ঘোষাল মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার বেশী ছিল কথা বলার স্বভাব। আমি দেখিলাম, কথা বলিতেই তাঁহার অনেক সময় যায়। আমার পরিচয় শুনিয়া আমাকে কেরাণীর কাজ দেওয়ার জন্য তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া বলিলাম—"আমি কে, আর আপনি কে? আপনি কংগ্রেসের পুরাতন সেবক আমার গুরুজনের সমান। আমি ত অনভিজ্ঞ যুবকমাত্র। কাজ দিয়া আপনি ত আমার উপকারই করিয়াছেন। আমি কংগ্রেসের কাজ করিতে চাই। আপনি ত আমাকে কাজ-কর্ম্ম শিক্ষা করিবার অমূল্য সুযোগ দিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন—"সত্য বলিতে কি, এই মনোভাবই ঠিক, কিন্তু আজ-কালের যুবকেরা ইহা মানে না। আর ধরিতে গেলে আমি ত কংগ্রেসের জন্ম হইতেই আছি। কংগ্রেসের জন্মকালে মিঃ হিউমের সহিত আমারও যোগ ছিল।"

আমাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন প্রগাঢ় হইল। দুপুরে খাওয়ার সময় আমাকে তিনি সঙ্গে লইলেন। ঘোষাল বাবুর বোতাম কিন্তু 'বেয়ারা' লাগাইয়া দিত। ইহা দেখিয়া বেয়ারার কাজ আমিই চাহিয়া লইলাম। উহা আমার ভাল লাগিত। গুরুজনের প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধার ভাব ছিল। যখন তিনি আমার সেবা-প্রবৃত্তি টের পাইলেন তখন তাঁহার সমস্ত সেবাই আমাকে করিতে দিলেন। বোতাম লাগাইবার সময় মৃদু হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"দেখ না, কংগ্রেস সেক্রেটারীর বোতাম লাগাইবার সময়ও নাই, কেন না সকল সময়ই তাহার কাজ করিতে হয়।" তাঁহার ছেলে-মানুষীতে আমার হাসি পাইল। কিন্তু ঐ ধরণের সেবায় আমার মনে আদৌ অনিচ্ছা ছিল না। এই সেবা দ্বারা আমার অগণিত লাভ হইয়াছিল।

অল্প দিনেই কংগ্রেস পরিচালনার ব্যাপার বুঝিতে পরিলাম। অনেক নেতাদের সহিত পরিচয় হইল। গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির গতিবিধি দেখিলাম। যে প্রকার সময় নষ্ট হইত তাহাও দেখিতে পাইলাম। তাহাতে দুঃখও হইল। যে কাজ একজনের দ্বারা হয় তাহাতে অনেক লোক লাগানো হইতেছে দেখিলাম, আর কতকগুলি আবশ্যকীয় কাজ হয়ই না, তাহাও দেখিলাম।

আমার মন এই সমস্ত কার্য্যের সমালোচনা করিত। কিন্তু মন উদার ছিল বলিয়া, উহার বেশী সংস্কার সম্ভব নহে একথা মানিয়া লইতাম। মনে মনে কাহারও কাজের মূল্য খাটো করিতাম না।

১৫

কংগ্রেসে

কংগ্রেস বসিল। মণ্ডপের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃশ্য, স্বেচ্ছাসেবকের পংক্তি, মঞ্চের উপর রাষ্ট্র-গুরুদিগকে দেখিয়া আমি অভিভূত হইলাম। এই মহতী সভায় আমার স্থান কোথায় ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইলাম।

সভাপতির অভিভাষণ একখানা পুস্তক ছিল। তাহার সবটা পড়া সম্ভব ছিল না। তাহার কতকাংশ পড়া হইল।

তারপর বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন। গোখলে আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন।

সার ফিরোজ শা আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে সে কথা কে তোলে, কেমন করিয়া তোলা যায়, আমি বসিয়া ভাবিতেছিলাম। প্রত্যেক প্রস্তাবের জন্য লম্বা বক্তৃতা আর সকল বক্তৃতাই ইংরাজীতে। প্রত্যেক বক্তাই খ্যাতনামা ব্যক্তি। এই তূর্য্যধ্বনির মধ্যে আমার ক্ষীণ স্বর কে শুনিবে? যেমন রাত বাড়িয়া যাইতেছিল তেমনি আমার বুক ধুক্-ধুক্ করিতেছিল। শেষের দিকে বায়ুবেগে প্রস্তাব সকল গৃহীত হইতেছিল বলিয়া আমার স্মরণ আছে। রাত্র এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। আমার কিছু বলার সাহস হইতেছে না। আমি গোখলের সহিত দেখা করিয়াছিলাম, তিনি আমার প্রস্তাব দেখিয়া লইয়াছিলেন।

তাঁহার চেয়ারের নিকট গিয়া আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—"আমার কিছু করুন"

তিনি বলিলেন—"তোমার প্রস্তাবের কথা আমার মনে আছে। এখানকার তাড়াহুড়া ত দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু আমি তোমার প্রস্তাব উপেক্ষিত হইতে দিব না।"

"কেমন, এখন ছুটি"—সার ফিরোজ শা বলিলেন।

গোখলে বলিলেন—"দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়ে প্রস্তাব এখনো বাকী আছে। মিঃ গান্ধী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন।"

সার ফিরোজ শা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি প্রস্তাবটা দেখিয়াছেন?"

"অবশ্য।"

"আপনার পছন্দ হইয়াছে?"

"ঠিক আছে।"

"তাহা হইলে গান্ধী, পড়।"

আমি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া শুনাইলাম।

গোখলে সমর্থন করিলেন।

"সর্ব্ব সম্মতি অনুসারে গৃহীত"—সকলে বলিয়া উঠিলেন।

ওয়াচা বলিলেন—"গান্ধী, তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিব?"

এই ব্যাপারে আমি খুসী হইলাম না। কেহই প্রস্তাব বুঝিবার জন্য ইচ্ছা করিল না। সকলেই যাইবার জন্য ব্যস্ত। গোখলে প্রস্তাব দেখিয়াছেন, সেই জন্য আর কাহারও শোনারও দরকার নাই।

প্রাতঃকাল হইল, আমি ত আমার বক্তৃতা সম্বন্ধেই ভাবিতেছিলাম। পাঁচ মিনিটে কি বলিব? আমি ভাল রকম তৈরী ছিলাম, কিন্তু শব্দ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। লিখিত বক্তৃতা পড়িব না স্থির করিয়াছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অবাধে বক্তৃতা করিতে পারিতাম, সে শক্তি যেন এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল।

আমার প্রস্তাবের সময় উপস্থিত হইলে সার দীনশা আমার নাম ডাকিলেন। আমি দাঁড়াইলাম। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কোনও রকমে প্রস্তাবটা পড়িলাম। কোনও কবি নিজের লেখা কবিতা ছাপাইয়া সকল প্রতিনিধির মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে বিদেশে যাওয়ার ও সমুদ্র-যাত্রার প্রশংসা ছিল। তাহাই আমি পড়িয়া শুনাইলাম ও দক্ষিণ আফ্রিকার দুঃখের সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। ইতিমধ্যেই সার দীনশা ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, তখনো পাঁচ মিনিট হয় নাই। আমি জানিতাম না যে, সময় শেষ হওয়ার দুই মিনিট পূর্ব্বেই সাবধান করার জন্য ঘণ্টার শব্দ করা হয়। আমি অনেককে আধঘণ্টা, তিনপোয়া ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতে শুনিয়া আসিতেছি, তাহাতেও ঘণ্টা বাজানো হয় নাই। আমার মনে দুঃখ হইল। ঘণ্টার শব্দ হইতেই আমি বসিয়া পড়িলাম। তখনকার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি মানিয়া লইয়াছিলাম যে, ঐ কবিতাতেই সার ফিরোজ শার জবাব দেওয়া হইয়াছিল।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সম্বন্ধে আর কোনও কথা নাই। তখনকার দিনে অভ্যাগত ও প্রতিনিধিদের মধ্যে কোনও ভেদ ছিল না। সকলেই হাত তুলিত। সকল প্রস্তাবই সর্ব্ব-সম্মত হইয়া পাস হইত। আমার প্রস্তাবও তেমনি হইল। ইহাতে প্রস্তাবের সম্বন্ধে গুরুত্ব আমার নিকট কমিয়া গেল। তাহা হইলেও কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ইহাই আমার আনন্দের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কংগ্রেসের সম্মতি যে বিষয়ে আছে সারা দেশের, সম্মতি তাহাতে আছে। একথা কাহার পক্ষেই বা যথেষ্ট নয়?

১৬
লর্ড কার্জ্জনের দরবার

কংগ্রেস হইয়া গেল। আমার তখনো কলিকাতায় থাকিয়া চেম্বারস্ অব কমার্স ইত্যাদির সহিত সাক্ষাৎ করার কাজ বাকী ছিল। সেই জন্য আমি কলিকাতায় এক মাস থাকিলাম। এইবারে হোটেলে না থাকিয়া ইণ্ডিয়া ক্লাবে থাকার জন্য পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই ক্লাবে ভারতবর্ষের প্রধান নেতৃস্থানীয়েরা আসিয়া উঠিতেন। সেই জন্য সেখানে উঠিলে তাঁহাদের সহিত মেলামেশায় তাঁহারাও দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধে কিছু ভাবিবেন—এইরূপ মনে হইয়াছিল। এই ক্লাবে প্রতিদিন না হইলেও প্রায়ই গোখলে বিলিয়ার্ড খেলিতে আসিতেন। আমি কলিকাতায় থাকিব জানিয়া তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমিই নিজে নিজে সেখানে যাইব ইহা আমার নিকট ঠিক বোধ হইল না। দুই এক দিন অপেক্ষা করার পর গোখলে আমাকে নিজেই সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। আমার সঙ্কোচ দেখিয়া তিনি বলিলেন—"গান্ধী এখন ত তোমাকে দেশে থাকিতে হইবে, এত লজ্জা করিলে চলিবে না। যত লোকের সহিত সংস্পর্শে আসিবে তাহাই ভাল। তোমাকে দিয়া আমার কংগ্রেসের কাজ করাইতে হইবে।"

গোখলের নিকট যাওয়ার পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া ক্লাবের একটা অভিজ্ঞতা বিষয় লিখিব।

লর্ড কার্জ্জনের দরবার

এই সময়ে লর্ড কার্জ্জনের দরবার হইতেছিল। সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকজন রাজা-মহারাজা এই ক্লাবে ছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই বাঙ্গালীর সুন্দর ধুতি সার্ট ও চাদর-পরা অবস্থায় দেখিতাম। আজ তাঁহারা পাত্‌লুন জেব্বা খানসামার পাগড়ী ও চমকদার বুট পরিয়াছিলেন। আমার মনে দুঃখ হইল, আমি এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আমাদের দুঃখ আমরাই জানি। আমাদের টাকা-পয়সা ও আমাদের পদবী রাখার জন্য আমাদিগকে যে অপমান সহ্য করিতে হয়, আপনি তাহার কি বুঝিবেন?"

"তাহা যেন হইল, কিন্তু এই খানসামার পাগড়ী ও বুট কেন?"

"খানসামা ও আমাদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে? তাহারা যেমন আমাদের খানসামা, আমরা তেমনি লর্ড কার্জ্জনের খানসামা। আমি যদি 'লেভিতে' অনুপস্থিত হই তাহা হইলে আমাকে পস্তাইতে হইবে। আমি যদি আমাদের নিত্যকার পোষাক পরিয়া যাই তবে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি লর্ড কার্জ্জনের সহিত সেখানে গিয়া একটা কথা বলারও সুবিধা হইবে? কখনো না।"

এই খোলা কথা শুনিয়া সেই বন্ধুটির উপর দয়া হইল। এই প্রসঙ্গে আর এক দরবারের কথা আমার মনে হইতেছে। লর্ড হার্ডিং যখন কাশী-হিন্দু-বিশ্বাপীঠের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন সেখানে প্রধানতঃ রাজা-মহারাজারাই ছিলেন, কিন্তু ভারত-ভূষণ মালব্যজী আমাকেও সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি সেখানে গিয়াছিলাম। যে পোষাক কেবল স্ত্রীলোকেরই শোভা পায় সেই

পোষাকে রাজা-মহারাজাদিগকে দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। রেশমী ইজার, রেশমী জামা ও গলায় হীরা-মতির মালা। হাতে বাজু-বন্ধ ও পাগড়ীর উপর হীরা-মতির ঝালর। আবার সকলের কোমরেই সোনার হাতল দেওয়া তলোয়ার ঝুলানো ছিল। আমি কয়েক জনকে বলিয়াছিলাম যে, ঐ সকল ভূষণ তাঁহাদের রাজ মর্য্যাদার চিহ্ন নহে, গোলামীর চিহ্ন। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, এই স্ত্রীজন-সুলভ ভূষণ তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই পরেন। কিন্তু পরে শুনিয়াছিলাম যে, এই রকম দরবারে রাজাদের সমস্ত মূল্যবান গহনা ও পোষাক পরারই আদেশ আছে। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, কাহারও কাহারও ঐ পোষাক পরিতে গ্লানি বোধ হয় এবং এই দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় ব্যতীত অন্য কোনও সময় উহা ব্যবহার করেন না। এই অবস্থা কতটা সত্য তাহা জানি না। তাঁহারা এই প্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ অন্যত্র পরিধান না করেন ভালই, কিন্তু ভাইসরয়ের দরবারে যে স্ত্রীলোক-দিগের উপযুক্ত এই সব পোষাক পরিধান করিয়া আসেন তাহাও অতিমাত্রায় গ্লানিকর। ধন মান ও প্রভুত্ব মানুষের কতই না পাপ ও অনর্থের হেতু হয়।

১৭

গোখলের সহিত একমাস—১

প্রথম দিন হইতেই আমাকে গোখলে অতিথি হইয়া থাকিতে দেন নাই। আমি যেন তাঁহার ছোটভাই এমনি ভাবে রাখিয়াছিলেন। আমার কি কি আবশ্যক তাহা জানিয়া লইয়াছিলেন ও যাহাতে সে সমস্ত পাই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে আমার প্রয়োজন অল্পই ছিল। সকল কাজই নিজে হাতে করিয়া লওয়ার অভ্যাস করিয়াছিলাম, সেই জন্য আমাকে অন্যের সেবা কমই লইতে হইত। আমার স্বাবলম্বনের অভ্যাস, আমার পোষাক ইত্যাদির সংস্কার, আমার শ্রমশীলতা ও আমার নিয়মানুবর্ত্তীতা তাঁহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি আমাকে এজন্য প্রশংসা করিয়া বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আমার নিকট তাঁহার কিছুই গোপনীয় ছিল না। যখনই কোনও বিশেষ ব্যক্তি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, তখনই আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেন। এই সকল পরিচয়ের মধ্যে আজ আমার সকলের আগে চোখে পড়ে ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে। তিনি গোখলের বাড়ীর কাছেই থাকিতেন ও প্রায়ই আসিতেন।

"ইনিই প্রফেসর রায়, যিনি মাসে আটশত টাকা উপার্জ্জন করিয়া নিজের জন্য মাত্র ৪০৲ টাকা রাখিয়া বাকী সমস্তই জন-সেবায় দান করেন। ইনি বিবাহ করেন নাই,—করিবেনও না।"—গোখলে এই বলিয়া তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেন।

আজকার ডাক্তার রায় ও সেদিনের প্রফেসর রায়ের মধ্যে আমি কম পার্থক্যই দেখিতে পাই। তখন যেমন পোবাক পরিতেন, আজও প্রায় তেমনি পরিতেছেন। তবে আজ খাদির পোষাক, তখন খাদি হয় নাই। স্বদেশী মিলের তৈরী কাপড় পরিতেন। গোখলে ও প্রফেসার রায়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার আশ মিটিত না। তাঁহারা হয় দেশের হিত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, নয়ত অন্য কোন জ্ঞানগর্ভ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। নেতাদের যখন সমালোচনা হইত তখন কোন কোন কথা শুনিয়া দুঃখ হইত। যাঁহাদিগকে মহা মহা যোদ্ধা বলিয়া ভাবিতাম তাঁহাদিগকে ভারি ছোট দেখাইতে লাগিল।

গোখলের কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া আমার যেমন আনন্দ হইত তেমনি শিক্ষালাভও হইত। তিনি এক মুহূর্ত্তও নষ্ট হইতে দিতেন না। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই দেশের সেবার জন্য দেখিলাম, সকল কথাই তাঁহার দেশের কথা। তাঁহার কথাতেও মলিনতা অথবা দম্ভ অথবা মিথ্যার স্পর্শ ছিল না। কথায় কথায় রাণাডের প্রতি তাঁহার পূজার ভাব ফুটিয়া উঠিত। 'রাণাডে এই বলিয়াছেন'—এ কথা তাঁহার কথাবার্ত্তার মধ্যে লাগিয়াই থাকিত। আমি থাকিতেই রাণাডের জয়ন্তী (অথবা জন্মতিথি তাহা স্মরণ নাই) উৎসব উপস্থিত হয়। গোখলে উহা নিয়মিত পালন করেন বলিয়া মনে হইল। তখন তাঁহার সঙ্গে আমি ছাড়া আরও দুইজন বন্ধু ছিলেন—ইহাদের একজন প্রফেসর কথাভাটে, ও অন্য বন্ধুটি একজন সবজজ। এই উৎসব পালন করার জন্য গোখলে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই সময় রাণাডের সম্বন্ধে আমাদিগকে তিনি অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। রাণাডে, তেলং ও মণ্ডলিকের তুলন-

মূলক সমালোচনাও করিয়াছিলেন। তিনি তেলং-এর ভাষার প্রশংসা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ আছে। সংস্কারক বলিয়া মণ্ডলিকের প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার মক্কেলের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণতার এক উদাহরণ-স্বরূপ, ট্রেণ ফেল করায় স্পেসাল ট্রেণ করিয়া তিনি গিয়াছিলেন—সে গল্পও শুনাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রাণাডের সর্ব্ববিষয়-ব্যাপী শক্তির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তৎকালের সমস্ত নেতার মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাণাডে কেবল জজই ছিলেন না, তিনি ঐতিহাসিক, অর্থশাস্ত্রী ও সংস্কারক ছিলেন। তিনি সরকারের ভৃত্য হইয়াও দর্শক হিসাবে নির্ভয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতেন। তাঁহার বিজ্ঞতার উপর সকলের এমন আস্থা ছিল যে, সকলেই তাঁহার নির্দ্ধারণ মানিয়া লইতেন। এই সকল কথা বলিতে গোখলের আনন্দের অবধি থাকিত না।

গোখলে ঘোড়ার গাড়ী রাখিতেন। আমি ইহা লইয়া তাঁহার নিকট অভিযোগ করি। আমি তাঁহার অসুবিধা বুঝিতে পারি নাই। তাই বলিয়াছিলাম—"আপনি কি সকল সময়েই ট্রামে যাইতে পারেন না? ইহাতে কি নেতাদের প্রতিষ্ঠা কমে?"

কতকটা দুঃখিত হইয়া তিনি উত্তর দিলেন—"তুমিও আমাকে বুঝিতে পারিলে না? কাউন্সিল হইতে যে অর্থ পাই, তাহা আমার নিজের জন্য ব্যবহার করি না। তোমার ট্রামে চড়া দেখিয়া আমার হিংসা হয়। আমার উহা করার যো নাই। তুমিও যখন আমার মত পরিচিত হইয়া পড়িবে, তখন তোমারও ট্রামে চলা সম্ভব হইবে না—অসুবিধা হইবে। নেতারা যাহা করেন তাহা যে আমোদ ভোগ করার জন্য করেন, ইহা মনে করার কোনও হেতু নাই। তোমার

সরল জীবন-যাত্রা আমার ভাল লাগে। আমি যতটা পারি সাদা-সিধা ধরণে থাকি। কিন্তু আমাদের মত লোকের কতকগুলি খরচ অনিবার্য্য।"

এমনি করিয়া আমার একটা নালিশ ত মিটিয়া গেল। কিন্তু আমার দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর দিয়া তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—

"কিন্তু আপনি বেড়াইতেও ঠিক মত যান না। ইহাতে যে আপনি অসুস্থ থাকেন তাহাতে বিস্মিত হইবার হেতু নাই। দশটা কাজের মধ্যে বেড়াইবার অবকাশও কেন পাওয়া যাইবে না?"

জবাব পাইলাম—"তুমি কখন আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিতেছ যে, আমি বেড়াইতে যাওয়ার সময় করিব?"

আমি গোখেলের সম্বন্ধে এত সম্মান পোষণ করিতাম যে, তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার উপরোক্ত জবাবে আমার তৃপ্তি হইল না, তবু চুপ করিয়া রহিলাম। আমি তখন মনে করিতাম, এখনো মনে করি যে, যতই কাজ থাক্ না কেন, যেমন খাওয়ার সময় করিয়া লওয়া হয়, তেমনি ব্যায়ামের সময়ও করিয়া লওয়া উচিত।, তাহাতে দেশের সেবা কম না হইয়া বেশীই হয়—ইহাই আমার বিশ্বাস।

১৮

গোখলের সহিত একমাস—২

গোখলের ছায়ার নীচে, ঘরে বসিয়াই আমি সকল সময় কাটাইতাম না।

আমার দক্ষিণ আফ্রিকার খৃষ্টান মিত্রদিগকে বলিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে আসিয়া খৃষ্টানদের সহিত মিশিব ও তাহাদের অবস্থা জানিব। আমি কালীচরণ ব্যানার্জ্জীর নাম শুনিয়াছিলাম। তিনি কংগ্রেসের অগ্রণীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আমার সম্মান ছিল। সাধারণতঃ খৃষ্টানেরা হিন্দু-মুসলমানের সংস্রব হইতে ও কংগ্রেস হইতে আলাদা হইয়া থাকিতেন। সেই জন্য তাঁহাদের উপর যে অবিশ্বাসের ভাব ছিল, কালীচরণ বাবুর সম্বন্ধে সে ভাব ছিল না। আমি তাঁহার সহিত দেখা করার কথা গোখলেকে বলায় তিনি বলিলেন—"ওখানে গিয়া তুমি কি পাইবে? তিনি খুব ভাল মানুষ, তবে আমার মনে হয় যে, তিনি তোমাকে আনন্দ দিতে পারিবেন না। আমি তাঁহাকে ভাল রকমেই জানি। তবে তোমার যদি যাওয়ার ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে যাও।"

আমি দেখা করার সময় চাহিয়া পাঠাইলাম। তিনি আমাকে তখনই সময় দিলেন এবং আমি দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার ধর্ম্ম-পত্নী তখন মৃত্যু-শয্যায় ছিলেন। কংগ্রেসে তাঁহাকে কোট পাতলুন পরিহিত দেখিয়াছিলাম। বাড়ীতে তাঁহাকে ধুতি-জামা পড়া দেখিলাম।

এই সাদাসিধা ধরণ আমার ভাল লাগিল। তখন আমি নিজে যদিও পার্শী কোট পাত্‌লুন্‌ পরিতাম তবু, এই পোষাক আমার খুব ভাল লাগিত। আমি তাঁহার সময় নষ্ট না করিয়া আমার প্রশ্নগুলি তাঁহাকে বলিয়া আমার যেখানে গোল বোধ হয় তাহা শুনাইলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ত মানেন যে, আমরা পাপ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি?"

আমি বলিলাম—"হাঁ মানি।"

"তাহা হইলেই দেখুন, এই মূল পাপের নিবারণের ব্যবস্থা হিন্দু ধর্ম্মে নাই, খৃষ্টধর্ম্মে আছে।" অতঃপর তিনি বলিলেন—"পাপের প্রতিদান মৃত্যু এবং এই মৃত্যু হইতে বাঁচার মার্গ যিশুর শরণ, বাইবেল একথা বলেন।"

আমি ভগবদ্গীতার ভক্তিমার্গ উপস্থিত করিলাম। কিন্তু আমার কথায় কোনও ফল হইল না। আমি এই মহাশয় ব্যক্তিকে তাঁহার মহত্বের জন্য ধন্যবাদ দিলাম। আমার মনে সন্তোষ আসিল না সত্য, তবে এই দেখা করায় আমার লাভই হইয়াছিল।

এই সময়টাতে আমি কলিকাতায় গলি গলি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম বলা যায়। পায়ে হাঁটিয়াই প্রায় সমস্ত কার্য্য করিতাম। এই সময়েই জজ মিত্রের সহিত দেখা হইল, গুরুদাস ব্যানার্জ্জীর সহিত দেখা হইল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজে আমি তাঁহাদের সাহায্য চাহিলাম। রাজা সার প্যারীমোহন মুখার্জ্জীর সঙ্গেও এই সময়েই দেখা করি।

কালীচরণ ব্যানার্জ্জী আমাকে কালীমন্দিরের কথা বলিয়াছিলেন। আমার সেই মন্দির দেখার তীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল। ইহার বর্ণনা পুস্তকাদিতে পড়িয়াছি। সেই জন্য একদিন গিয়া উপস্থিত হইলাম। জষ্টিস মিত্রের বাড়ী সেই রাস্তাতেই ছিল। সেই জন্য তাঁহার সহিত

যে দিন দেখা করিলাম, সেই দিন কালীমন্দিরেও গেলাম। রাস্তায় দেখিলাম সারি সারি ছাগ বলি দেওয়ার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। গলিতে দেখি সারি সারি ভিক্ষুক বসিয়া আছে। সাধু বাবারা ত ছিলেনই। সে সময়েও আমি হৃষ্টপুষ্ট ভিখারীদিগকে কিছু দিতাম-না। তাহাদের একদল আমার পিছন লইয়াছিল।

এক বাবাজী রকের উপর বসিয়াছিল। সে বলিল—"আরে বেটা, কোথায় যাইতেছ?" আমি উত্তর দিলাম। সে আমাকে ও আমার সাথীকে বসিতে বলিল। আমরা বসিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই ছাগ-বলি কি তুমি ধর্ম্ম বলিয়া মনে কর?"

সে বলিল—"জীব-হত্যা করাকে ধর্ম্ম কে বলে?"

"তাহা হইলে তুমি এখানে বসিয়া লোককে সেই কথা কেন বুঝাও না?"

"আমার সে কাজ নয়, আমি বসিয়া ঈশ্বর আরাধনা করি।"

"তাহা হইলে, আর কোনও জায়গা সে জন্য পাইলে না?"

"আমার সব জায়গাই সমান। লোক ত ভেড়ার পালের ন্যায়, একটা যেদিকে যায় সকলে সেইদিকে দৌড়ায়। উহাতে আমাদের সাধুদের কি প্রয়োজন?"—বাবাজী বলিলেন।

আমি আর কথা বাড়াইলাম না। আমরা মন্দিরে গেলাম। সম্মুখে রক্তের নদী বহিতেছে। উহা দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিলাম না। আমার উত্তেজনা বোধ হইল, অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। সেই দৃশ্য আমি আজ পর্য্যন্তও ভুলিতে পারি নাই। সেই সময় কোনও বাঙ্গালীর বাড়ীতে এক মজলিসে আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেইখানে এক ভদ্র-

লোকের সহিত এই হত্যাকাণ্ড-জড়িত পূজার সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়। তিনি বলিলেন—"ওখানে যে ঢাকের শব্দ হয়, যে গোলমাল হয় তাহাতে ছাগদিগকে মারিলেও উহাদের ব্যথা বোধ হয় না।"

কথাটা মানিতে পারিলাম না। আমি সেই ভদ্রলোকে বলিলাম যে, ছাগদের যদি বাক্‌শক্তি থাকিত তাহা হইলে তাহারা অন্য প্রকার বলিত। এই হত্যার প্রথা বন্ধ হওয়াই উচিত। বুদ্ধদেবের সে কথা স্মরণে আসিল। কিন্তু আমি দেখিলাম—ইহা আমার শক্তির অতীত।

তখন যাহা ভাবিয়াছিলাম আজও তাহাই ভাবি। আমার নিকট একটা ছাগের জীবনের মূল্য মানুষের জীবনের মূল্য অপেক্ষা কম নয়। মানুষের দেহ বাঁচাইবার জন্য ছাগের দেহ নাশ করিতে আমি প্রস্তুত নই। যে জীব যত বেশী নিরাশ্রয় তাহার মানুষের কাছে, মানুষেরই অনুষ্ঠিত হিংসা হইতে বাঁচিবার দাবী তত বেশী আছে বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু যে যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই তাহার পক্ষে ইহাদিগকে রক্ষা করাও সম্ভব নহে। ছাগদিগকে এই পাপময় যজ্ঞ হইতে বাঁচাইতে হইলে যে আত্মশুদ্ধির এবং যে ত্যাগের প্রয়োজন আমার তাহা নাই। এই শুদ্ধি ও এই ত্যাগের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই আমার মরিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। এমন কোনও তেজস্বী পুরুষের উদ্ভব হোক্, এমন কোন তেজস্বিনী সতীর আবির্ভাব হোক্, যিনি মানুষকে এই মহাপাতক হইতে বাঁচাইতে পারিবেন, নির্দ্দোষ প্রাণীটিকে রক্ষা করিতে পারিবেন ও মন্দিরকে শুদ্ধ করিবেন। এই প্রার্থনা নিরন্তর করিতেছি। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, ত্যাগ-বৃত্তি-পূর্ণ ভাব-প্রধান বাঙ্গালী জাতি কেমন করিয়া এই হত্যাকাণ্ড সহ্য করিতেছে?

১৯

গোখলের সহিত একমাস—৩

কালীমাতার জন্য অনুষ্ঠিত এই ভয়ঙ্কর যজ্ঞ দেখিয়া আমার বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা প্রবল হয়। ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে আমি অনেক কথা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জীবন বৃত্তান্ত আমি কিছু কিছু জানিতাম। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি। তাঁহার লেখা কেশবচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্তখানা পাইয়াছিলাম ও পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম। সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ ও আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভেদ বুঝিয়াছিলাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে দর্শন করিলাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিবার জন্যও আমি ও প্রফেসর কথাভাটে গিয়াছিলাম। সে সময় তিনি কাহারও সহিত দেখা করিতেন না বলিয়া দেখা হয় নাই। কিন্তু সেই সময় তাঁহার ওখানে ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব হইতেছিল। সেইখানে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা গিয়াছিলাম। সেখানে উচ্চ অঙ্গের বাংলা গান শুনিয়াছিলাম। সেই হইতেই বাংলা গান আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

ব্রাহ্ম-সমাজের যতটা পারি দেখার পর একবার স্বামী বিবেকানন্দকে না দর্শন করিলে কেমন করিয়া চলিবে? অত্যন্ত উৎসাহের সহিত আমি বেলুড় মঠে গেলাম। অনেকটা পথই হাঁটিয়া গিয়াছিলাম। সবটা রাস্তাই হাঁটিয়া গিয়াছিলাম কি অর্দ্ধেকটা রাস্তা—তাহা স্মরণ নাই। জন-বিরল স্থানে মঠ দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। স্বামীজী

অসুস্থ, তিনি কলিকাতার বাড়ীতে আছেন এখন দেখা হইবে না শুনিয়া নিরাশ হইলাম। ভগ্নী নিবেদিতার ঠিকানা পাইলাম। চৌরঙ্গীর এক মহলে তাঁহার দর্শনও পাইলাম। কিন্তু তাঁহার সমারোহ দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। কথাবার্ত্তায় আমাদের মধ্যে বিশেষ কোনো ঐক্যের সূত্র ধরা পড়িল না। আমি একথা গোখলেকে বলিলাম। তিনি বলিলেন—"এই মহিলা উৎফুল্ল-স্বভাবা, তোমার সহিত তাঁহার ঐক্য না হওয়ায় আমি আশ্চর্য্য হই নাই।"

পুনরায় একবার পেস্তনজী পাদশাহের বাড়ীতে তাঁহার সহিত দেখা হয়। তিনি পেস্তনজীর বৃদ্ধা মাতাকে উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময় আমি সেখানে উপস্থিত হই। আমি তখন উভয়ের মধ্যে দোভাষীর কাজ করিলাম। এই ভগ্নীর ভিতরে হিন্দু ধর্ম্মের জন্য যে উচ্ছ্বসিত প্রেম ছিল, তাহা তাঁহার সহিত মনের মিল না হইলেও আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাঁহার পুস্তকের পরিচয় পরে পাইয়াছি।

আমি দিনের কাজ এইরূপে ভাগ করিয়া লইয়াছিলাম—দক্ষিণ আফ্রিকার কাজের জন্য কলিকাতার নেতাদের সহিত দেখা করা, কলিকাতার ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান সমূহ দেখা এবং কলিকাতার সাধারণ প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শন করা। একদিন আমি এক সভায় বোয়ার যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেবা-দল কি কাজ করিয়াছে সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই। ডাঃ মল্লিক সভাপতি হইয়াছিলেন। ইংলিশম্যানের সহিত আমার পরিচয় এই সময় খুব কাজে লাগিয়াছিল। মিঃ সণ্ডার্স এই সময় পীড়িত ছিলেন। ১৮৯৬ সালে যেমন তাঁহার সাহায্য পাইয়াছিলাম এখনও তেমনি পাইলাম। আমার ঐ বক্তৃতা

গোখলের পছন্দ হইয়াছিল। ডাক্তার রায়ের মুখেও উহার প্রশংসা শুনিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

গোখলের সঙ্গী বলিয়া বাংলা দেশে আমার কাজের ভারি সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার জন্য বাংলার অগ্রগণ্য পরিবার সমূহের সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে সহজ হইয়াছিল ও বাংলার সহিত আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। এই চিরস্মরণীয় মাসের অনেক স্মৃতির কথা আমাকে বাদ দিয়া যাইতে হইবে। এই সময়েই আমি একবার ব্রহ্মদেশ হইতে ঘুরিয়া আসি। সেখানকার ফুঙ্গীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহাদের আলস্য দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল। স্বর্ণ-প্যাগোডা দর্শন করিয়াছিলাম। মন্দিরের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট মোম বাতি আমার চোখে ভাল লাগে নাই। মন্দিরের গর্ভ-গৃহে ইন্দুর চলা-ফেরা করিতেছে দেখিয়া স্বামী দয়ানন্দের অভিজ্ঞতার কথা মনে হইল। ব্রহ্মদেশের মহিলাদের স্বাবলম্বন দেখিয়া, তাঁহাদের কার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তেমনি আবার সেখানকার পুরুষদের অলসতা দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলাম। আমি ইহাও তখনই দেখিয়াছিলাম যে, বোম্বাই যেমন ভারতবর্ষ নহে, রেঙ্গুনও তেমনি ব্রহ্মদেশ নহে। আর ভারতবর্ষে যেমন আমরা ইংরাজ ব্যবসাদারের কমিশন-এজেণ্ট হইয়াছি, তেমনি ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীরা ও ইংরাজেরা একত্র হইয়া ব্রহ্মদেশবাসীকে তাহাদের কমিশন এজেণ্ট বানাইয়া রাখিয়াছে।

ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি গোখলের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইলেও যাইতে হইল, কেন না বাংলাদেশে—কলিকাতায় আমার যে কাজ করার ছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

ব্যবসার কাজে বসিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে আমার একবার তৃতীয় শ্রেণীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখের কথা জানিয়া লওয়ার ইচ্ছা হয়। গোখলের নিকট আমি এই ইচ্ছার কথা বলিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু যখন আমার কি কি দেখার আশা আছে সে কথা বর্ণনা করিলাম, তখন তিনি খুসী হইয়া আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। আমি স্থির করি—প্রথমে কাশী যাইব এবং সেখানে গিয়া বিদুষী য়্যানি বেসাণ্টকে দর্শন করিব। তিনি সে সময় পীড়িত ছিলেন।

এই ভ্রমণের জন্য আমার নূতন সরঞ্জাম তৈরী করিয়া লইতে হইয়াছিল। গোখলে আমার জন্য একটা পিতলের ডিবা লাড়ুতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বারো আনা দিয়া একটা ক্যাম্বিস ব্যাগ কিনিলাম। ছায়ার (পোরবন্দরের নিকটস্থ গ্রাম) উল দিয়া একটি জামা তৈরী করিয়া লইলাম। ব্যাগে কোট ধুতি সার্ট ও তোয়ালে রাখার স্থান হইল। গায় দেওয়ার জন্য একখানা কম্বল লইলাম। আর সঙ্গে একটা লোটা রাখিলাম। মাত্র ইহাই লইয়া আমি রওনা হইলাম।

গোখলে ও ডাক্তার রায় আমাকে ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন। দুই জনকেই আমি ষ্টেশনে না আসার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা আমার সে কথা শোনেন নাই। গোখলে বলিলেন—"তুমি ফার্ষ্ট ক্লাশে গেলে কখনো আসিতাম না। কিন্তু এখন যে আমার আসাই দরকার।"

প্ল্যাটফর্মে আসিতে গোখলেকে কেহ আটকাইল না। তাঁহার মাথায় রেশমী পাগড়ী ছিল এবং কোট ও ধুতি পড়া ছিল। ডাক্তার

রায় বাঙ্গালীর সাধারণ পোষাক পরিয়া আসিয়াছিলেন। টিকিট-কলেক্টর তাঁহাকে ভিতরে আসিতে আটকায়। পরে গোখলে "আমার মিত্র" বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসিয়াছিলেন। দুইজনে আমাকে এমনি করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

২০

কাশীতে

আমার গন্তব্যস্থান ছিল রাজকোট। পথে কাশী, আগ্রা, জয়পুর, পালনপুর হইয়া যাওয়া স্থির করিলাম। ঐ সকল স্থান দেখার জন্য প্রত্যেক জায়গায় এক এক দিনের বেশী সময় দেই নাই। এক পালনপুর ছাড়া অন্য সর্ব্বত্র হয় ধর্ম্মশালায়, নয়ত পাণ্ডার বাড়ীতে যাত্রীদের মত থাকিয়াছি। আমার স্মরণ আছে, এই যাত্রায় গাড়ী-ভাড়া সহিত আমার সর্ব্ব-সাকুল্যে একত্রিশ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তৃতীয় শ্রেণীর এই ভ্রমণে আমি সাধারণতঃ ডাক গাড়ীতে উঠি নাই। আমি জানিতাম যে, ডাক গাড়ীতে বেশী ভিড় হয়। তাহা ছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ ভাড়া হইতে ডাক গাড়ীর ভাড়া বেশী ছিল। ডাক গাড়ীতে না উঠার তাহাও ছিল আর একটা কারণ।

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর অপরিচ্ছন্নতা ও পায়খানার দুর্গন্ধ এখনও যেমন আছে তখনও তেমনি ছিল। আজকাল সামান্য কিছু উন্নতি হইলেও হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীতে সুবিধার যে পার্থক্য, তাহা ভাড়ার পার্থক্য হইতে অনেক বেশী। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা যেন ভেড়া, আর তাহাদের যে ব্যবস্থা তাহাও ভেড়ার জন্য যে ব্যবস্থা হইতে পারে সেই মত। ইউরোপে আমি তৃতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করিতাম। প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা দেখার জন্য একবার মাত্র উহাতে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিয়াছি—প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীতে যে প্রভেদ তাহা ভারতবর্ষের মত নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় নিগ্রোরাই বেশীর ভাগ

তৃতীয় শ্রেণীতে যায়। তাহা হইলেও সেখানে তৃতীয় শ্রেণীতে অনেক সুবিধা আছে। কোন কোনও লাইনে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে শোয়ার ব্যবস্থাও আছে। বেঞ্চগুলিও গদী মোড়া। প্রত্যেক গাড়ীতে যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী লোক না উঠে তাহা সেখানে দেখা হয়। এখানে তৃতীয় শ্রেণীতে কোনও গাড়ীতে যাত্রীর সংখ্যা দেখা হয় বলিয়া আমি ত জানি না।

একদিকে রেল কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে যে সব অসুবিধা আছে তাহার জন্য, অন্যদিকে যাত্রীদের নিজেদের ভিতর যে সব বদ অভ্যাস আছে তাহার জন্য কোনও পরিচ্ছন্নতা-প্রিয় যাত্রীর পক্ষে তৃতীয় শ্রেণীতে চলা শাস্তি পাওয়ার সামিল। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা, সময় অসময় না দেখিয়া বিড়ি খাওয়া, পান জরদা চিবাইয়া যেখানে বসিয়া থাকিবে সেইখানেই পিক ফেলা, মেঝেতেই উচ্ছিষ্ট ফেলা, চেঁচাইয়া কথা বলা, কানে আঙ্গুল দিতে হয় এমন সব খারাপ কথা উচ্চারণ করা—এমন ত সর্ব্বদাই হইতেছে।

১৯০২ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে চড়িয়াছি, এবং ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত একেবারে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তৃতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করিয়াছি। এই দুই সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রমণের মধ্যে তফাৎ বিশেষ দেখি নাই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এই মহাব্যাধি প্রতিকারের একটি মাত্র উপায়ই আমি জানি। সে উপায় হইতেছে—শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করা ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অভ্যাস বদ্‌লাইতে চেষ্টা করা। তাহা ছাড়া রেল-কর্ম্মচারীর প্রত্যেক ত্রুটির জন্য তাহাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা দরকার, যেন তাহারা সোয়াস্তি না পায়। এই শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা নিজের জন্য সুবিধা খুঁজিবেন না, কদাচ ঘুষ দিবেন না ও

যে কেহ আইন-ভঙ্গ করিবে তাহা বরদাস্ত করিবেন না। এই প্রকার করিলে অনেক সংস্কার হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আমার অসুস্থতার জন্য ১৯২০ সাল হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ প্রায় বন্ধই রাখিতে হইয়াছে, ইহা আমার পক্ষে দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। আবার বন্ধও করিতে হইয়াছে এমন সময়ে যখন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দুঃখের কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিকার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। রেল ও ষ্টীমার কোম্পানী গরীব যাত্রীদিগকে যে অসুবিধায় ফেলে, যাত্রীরা নিজেদের খারাপ অভ্যাসের জন্য যে কষ্ট পায়, সরকার বিদেশী বাণিজ্যের সুবিধার জন্য যে ভাবে রেল চালায়, এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া আমাদের প্রজা-জীবনের এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া ধরিতে হয়। ইহার পরিবর্ত্তনের জন্য যদি দুই একজন বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ ব্যক্তি নিজেদের সমস্ত সময়ই ব্যয় করেন তাহা হইলেও তাহা বেশী নহে।

তৃতীয় শ্রেণীর দুঃখের কথা এই খানেই রাখিয়া এক্ষণে কাশীর কথা বলিব। প্রাতঃকালে কাশীতে পঁহুছাই। অনেকগুলি পাণ্ডা আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহাদের মধ্যে যাহাকে কতকটা পরিচ্ছন্ন ও ভাল মনে হইল আমি তাহাকেই পছন্দ করিয়া লইলাম। আমার পছন্দ ভালই হইয়াছিল। পাণ্ডার আঙ্গিনায় একটা গাই ছিল। তাহার বাড়ীর দোতলার ঘরটাতে আমাকে থাকিতে দিল। আমি বিধিমত গঙ্গাস্নান করিব ঠিক করিয়াছিলাম এবং সেজন্য উপবাস করিয়াছিলাম। পাণ্ডা সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমি পাঁচসিকার বেশী দক্ষিণা দিব না, ইহাতেই যাহা করিতে পারা যায় তাহা করিতে হইবে। পাণ্ডা

আপত্তি না করিয়া তাহাতেই রাজি হইয়া বলিল—"আমরা পূজা ধনী ও গরীব সকলের জন্য এক রকমই করি। তবে দক্ষিণা যজমানেরা ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে দিয়া থাকে।" পাণ্ডাজী পূজা-বিধিতে কিছু বাদ দিয়াছিল বলিয়া আমার বোধ হয় নাই। পূজা শেষ করিয়া আমি বারোটা একটার সময় বিশ্বনাথ দর্শন করিতে গেলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম তাহাতে দুঃখ পাইলাম।

১৮৯১ সালে যখন আমি বোম্বাইতে ওকালতী করিতাম তখন এক-বার প্রার্থনা সমাজের মন্দিরে 'কাশীতে তীর্থ যাত্রা' বিষয়ে এক বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। সেই জন্য কতকটা নিরাশ হওয়ার নিমিত্ত আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে অধিকতর নিরাশ হইলাম।

একটা সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল গলি দিয়া মন্দিরে যাইতে হয়। সেখানে শান্তির নামও নাই। মাছির ভন্ ভন্ ও দোকান-পাট হইতে যাত্রীদের বেচা-কেনার গণ্ডগোল অসহ্য বোধ হইল।

যেখানে ধ্যান ও ভগবৎ চিন্তার পরিবেষ্টন দেখিব আশা করিয়া-ছিলাম, সেখানে তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। ধ্যানভাব হৃদয়ের মধ্যে চলিতেছিল। ভক্তি-নিমগ্না ভগ্নীদিগকে দেখিলাম। তাঁহারা এমন বিহ্বল হইয়া আছেন যে, চারিদিকে কি ঘটিতেছে তাহা কিছুই জানেন না, কেবল ধ্যানে আত্মহারা হইয়া আছেন। কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থাপকদের কোনও কৃতিত্ব নাই। ব্যবস্থাপকদের কর্ত্তব্য কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চারিধারে যেমন বাহিরের দিক দিয়া তেমনি অন্তরের দিক দিয়া শান্ত, নির্ম্মল, সুগন্ধী, পরিচ্ছন্ন আবেষ্টন উৎপন্ন করা ও রক্ষা করা। তাহার বদলে আমি দেখিলাম যে ধূর্ত্ত দোকানীদের নূতন নূতন ফ্যাসনের খেলনা ও মিঠাই বিক্রয়ের বাজার চলিতেছে।

মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখেই পচা ও দুর্গন্ধ ফুলের স্তূপ। সুন্দর মার্বেল পাথরের মেঝে কাটিয়া তাহাতে টাকা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে, ময়লা লাগিয়া থাকিতেছে। অন্ধ শ্রদ্ধাবেশে কেহ এই কার্য্য করিয়াছেন।

জ্ঞান-বাপীর নিকটে গেলাম। আমি এখানে ঈশ্বর খুঁজিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। মন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। জ্ঞান-বাপীর নিকটেও আবর্জ্জনা রহিয়াছে। দক্ষিণা দেওয়ার মত শ্রদ্ধা হইল না। সেই জন্য মাত্র একটি পয়সা আমি পাণ্ডাজীকে দিলাম। সে পয়সাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। দুই চারটা গালি শুনাইয়া দিয়া বলিল—"তুই যে অপমান করিলি, সে জন্য তুই নরকে গমন করিবি।"

আমি শান্ত ভাবে বলিলাম—"মহারাজ, আমাকে যদি নরকে যাইতে হয় ত যাইব, কিন্তু আপনার মুখে ত কুবাক্য শোভা পায় না। যদি ইচ্ছা হয় তবে পয়সাটা নিন, না হয়ত উহা আমারই থাক্।"

"যা, তোর পয়সায় আমার দরকার নাই" বলিয়া সে আমাকে আরো কিছু বেশী গালি দিল। আমি পয়সাটা লইয়া আসিতে আসিতে ভাবিলাম যে, পাণ্ডাজী পয়সাটা খোয়াইল; ও আমার বাঁচিল। কিন্তু মহারাজ পয়সা খোয়াইবার লোক নহেন। তিনি তখন আমাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, রাখিয়া দে, আমি তোর মত করিতে চাই না, যদি না লই তবে তোর অকল্যাণ হইবে।"

আমি নিঃশব্দে পয়সা দিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে আরও দুইবার কাশীর বিশ্বনাথ দেখিয়াছি। কিন্তু তখন ত মহাত্মা হইয়া গিয়াছি'। সেই জন্য ১৯০২ সালের মত ব্যবহার আর কেমন করিয়া পাইব? আমার দর্শনার্থীরা, আমাকে কি 'দর্শন' করিতে দেয়?

'মহাত্মা' হওয়ার দুঃখ আমার মত মহাত্মারাই জানেন। সেখানকার অপরিচ্ছন্নতা ও হট্টগোল পূর্ব্বের ন্যায়ই দেখিয়াছি।

ভগবানের দয়া সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে তিনি এই তীর্থ ক্ষেত্র দেখিতে পারেন। সেই মহাযোগী, তাঁহারই নামে কত প্রবঞ্চনা, অধর্ম্ম ও ভণ্ডামি সহ্য করিতেছেন! তিনি ত বলিয়াই রাখিয়াছেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

অর্থাৎ যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। কর্ম্মের নিয়মকে মিথ্যা কে করিতে পারে? ভগবান নিজে নিয়ম সৃষ্টি করিয়া, নিয়মের উপর সব ফেলিয়া দিয়া নিজে যেন অবকাশ লইয়াছেন।

ইহার পর আমি মিসেস্ বেসান্টের সহিত দেখা করিতে গেলাম। আমি জানিতাম যে, তিনি অল্পদিন হইল ব্যারাম হইতে উঠিয়াছেন। আমার নাম লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তখনই আসিলেন। আমার ত কেবল দর্শন করাই আবশ্যক ছিল। সেই জন্য বলিলাম—"আপনার শরীর খারাপ আমি জানি। আমি ত কেবল আপনাকে দর্শন করিতেই আসিয়াছি। অসুস্থ থাকিয়াও আপনি যে আমাকে দেখা দিয়াছেন এজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনাকে আর আটকাইয়া রাখিব না।"—এই বলিয়া আমি বিদায় লইলাম।

২১

বোম্বাই-এ বসিলাম

'গোখলের খুব ইচ্ছা ছিল যে, আমি বোম্বাই-এ স্থির হইয়া বসি, ব্যারিষ্টারী করি ও তাঁহার সহিত জন-সেবার কার্য্যে যোগ দিই। তখন জন-সেবা মানে কংগ্রেস-সেবা ছিল। তিনি যে সংস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার কাজও ছিল কংগ্রেস-পরিচালনা করা।

আমারও তাহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ব্যারিষ্টারীতে সাফল্যের সম্বন্ধে আমার আত্ম-বিশ্বাস ছিল না। পূর্ব্বে যে ভাবে ব্যারিষ্টারীর শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে ভয় হইত। সেই জন্য প্রথমে রাজকোটেই গেলাম। সেখানে আমার পুরাতন হিতাকাঙ্ক্ষী, যিনি আমাকে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন, সেই কেবলরাম মাভজী দভে ছিলেন। তিনি আমাকে তিনটা মাম্‌লা দিলেন। কাথিয়াওয়াড়ের জুডিশ্যাল এসিষ্টাণ্টের নিকট দুইটা আপিল, আর জামনগরে একটা নূতন মাম্‌লা। এই শেষোক্ত মাম্‌লাটা গুরুতর ছিল। এই কেসের দায়িত্ব লইতে আমি অনিচ্ছা প্রকাশ করি। কেবলরাম তাহাতে বলিয়া উঠিলেন—"হারিলে তো আমাদেরই হার হইবে? তোমার যথাসাধ্য তুমি কর। আর আমিও ত তোমার সঙ্গে আছি?"

এই মোকদ্দমায় আমার প্রতিপক্ষে স্বর্গীয় সমর্থ ছিলেন। আমি মাম্‌লা ভাল করিয়াই তৈরী করিয়াছিলাম। এ দেশের আইনের জ্ঞান আমার বেশী ছিল না। কেবলরাম দভেই আমাকে এদিক দিয়া তৈরী করাইয়া দিয়াছিলেন। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার পূর্ব্বে

মিত্রেরা আমাকে শুনাইয়াছিলেন যে—ফিরোজশাহের এভিডেন্স আইন মুখস্থ আছে, আর তাহাই তাঁহার সাফল্যের কারণ। একথা আমার মনে ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার পথে আমি এ দেশের 'সাক্ষ্য আইন' টীকা সহিত পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা ত ছিলই।

মোকদ্দমায় জয়লাভ হইল। ইহাতে কতকটা আত্ম-বিশ্বাস আসিল। আর ঐ দুইটা আপীল সম্বন্ধে ত পূর্ব্ব হইতেই জিত হওয়ার সন্দেহ ছিল না। এই জন্য বোম্বাই বসিলেও ক্ষতি নাই মনে হইল।

এই বিষয় বলিবার পূর্ব্বে ইংরাজ আমলার যে অবিচার ও অজ্ঞতার পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহা বলিব। জুডিশ্যাল এসিষ্টাণ্ট কিছু এক জায়গায় বসিয়া থাকেন না। তিনি চলিতে চলিতে মামলার বিচার করিতে থাকেন। যেখানে সাহেব যান সেই খানেই উকীল-মক্কেলকে যাইতে হয়। উকীলের সাধারণ ফী অপেক্ষা বাহিরে গেলে বেশী ফি পাওনা হয়। খরচ গিয়া শেষে মক্কেলের ঘাড়েই পড়ে। এ সব কথা জজ সাহেবের ভাবার দরকার নাই।

ভেরাভল নামক স্থানে এই আপিলের শুনানী হওয়ার কথা। ভেরাভলে এই সময় খুব মড়ক চলিতেছিল। প্রতিদিন পঞ্চাশ জন করিয়া মড়কে পড়িতেছিল, আর সেখানে লোক-সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশী ছিল না। -স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। আমি এক নির্জ্জন ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিলাম। উহা গ্রাম হইতে কিছু দূরে ছিল। কিন্তু মক্কেলদের কি ব্যবস্থা আর হইতে পারে। ঈশ্বরই তাহাদের মালিক।

এক উকীল মিত্রের মামলাও এই জজের নিকট ছিল। তিনি

আমাকে তার করেন যে, আমি যেন প্লেগের জন্য কোর্ট অন্যত্র লইয়া বসাইতে আর্‌জি করি। সাহেবের নিকট আর্‌জি করায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার ভয় করে নাকি?"

আমি বলিলাম—"আমার ভয়ের কথা ত হইতেছে না, আমি আমার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিব, কিন্তু মক্কেলদের বেলা কি হইবে?"

সাহেব বলিলেন—"মড়ক ত ভারতবর্ষে বাসা বাঁধিয়াছে। উহাকে আর ভয় করিয়া কি হইবে? ভেরাভলের হাওয়া কি সুন্দর! (সাহেব গ্রাম হইতে দূরে সমুদ্র তটে প্রাসাদ-তুল্য তাঁবুতে বাস করেন।) লোকের খোলা হাওয়ায় বাস করা শেখা চাই।"

এই দার্শনিক তত্ত্ব-উপদেশের উপর আর কোনও তর্ক চলে না। সাহেব সেরাস্তাদারকে বলিলেন—"মিঃ গান্ধী যাহা বলিতেছেন মনে রাখিও, আর উকীল-মক্কেলের যদি বিশেষ অসুবিধা হয় তবে আমাকে জানাইও।"

সাহেব ত খোলা মনে যাহা উপযুক্ত ভাবিতেছেন তাহাই করিতেছেন। কিন্তু কাঙ্গাল ভারতবর্ষের অসুবিধার কথা তিনি কি বুঝিবেন? সে বেচারা ভারতবর্ষের সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন্দ অভ্যাস, প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির কি বুঝিবে? মোহর লইয়া যাহার কারবার, পাই-এর খবর কি সে বুঝিবে? খুব শুভ-বুদ্ধি থাকিলেও হাতী যেমন পিপীলিকার প্রয়োজন বুঝিতে পারে না, তেমনি হাতীর ন্যায় যাহার প্রয়োজন সেই ইংরাজ, পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র যাহার প্রয়োজন সেই ভারতবাসীর বিচার করিতে পারে না এবং তাহার আইন গড়িতেও অসমর্থ।

এখন আসল কথায় ফিরিয়া আসা যাক্।

বোম্বাই-এ বসিলাম

উপরোক্ত সফলতা পাওয়ার পরেও আমি কিছুকাল রাজকোটেই থাকিব ভাবিয়াছিলাম। এই অবসরে কেবলরাম একদিন আসিলেন। তিনি বলিলেন—"গান্ধী, তোমাকে এখানে থাকিতে দেওয়া হইবে না, তোমাকে বোম্বাই যাইতে হইবে।"

"কিন্তু আমার খাওয়া জুটিবে কোথা হইতে, আপনি কি খরচ চালাইবেন ?"

"হাঁ—হাঁ আমিই তোমার খরচ চালাইব। তোমাকে বড় ব্যারিষ্টার বলিয়া কয়েকবার এখানে আনিব, আর দরখাস্ত ইত্যাদির লেখার কাজ তোমার ওখানে পাঠাইব। ব্যারিষ্টারকে বড় করিয়া তোলা আর খাটো করিয়া দেওয়া আমাদের—উকিলদেরই কাজ নয় কি ? তোমার মূল্য কি তাহা তুমি জামনগরে ও ভেরাভল-এ দেখাইয়াছ, আমি সে জন্য নিশ্চিন্ত আছি। তুমি যে জন-সেবার কাজ করিবে ইচ্ছা করিয়াছ, রাজকোটে থাকিয়া তাহা নষ্ট করিতে আমি দিব না। কবে যাইবে বল ?"

"নাতাল হইতে আমার কিছু টাকা আসার কথা আছে, উহা পাইলে যাইব।"

দুই এক সপ্তাহ মধ্যে টাকা আসিয়া পড়ায় আমি বোম্বাই গেলাম। 'পেইন, গিলবার্ট ও সায়নী'র আফিসে চেম্বার ভাড়া লইলাম'ও স্থির হইয়া বসিলাম বলিয়া বোধ হইল।

২২
ধর্ম্ম-সঙ্কট

আফিস লইলাম, আর এদিকে গীরগামে বাড়ী করিলাম। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে স্থির থাকিতে দিলেন না। বাড়ী করার অল্প দিন পরেই আমার দ্বিতীয় পুত্রের কঠিন রোগ হইল। তাহার টাইফয়েড হইয়াছিল। টেম্পারেচার নামিত না। প্রলাপ ছিল ও সান্নিপাতও দেখা দিল। এই রোগের পূর্ব্বে সে একবার ছেলে বেলায় বসন্ত রোগেও খুব ভুগিয়াছিল।

ডাক্তারের পরামর্শ লইলাম। ডাক্তার বলিলেন—"ঔষধে উহার বিশেষ কিছু হইবে না। উহাকে ডিম ও মুরগীর সুরুয়া দেওয়া দরকার।"

তখন মণিলালের বয়স দশ বৎসর ছিল। তাহাকে আর কি জিজ্ঞাসা করিব? তাহার অভিভাবক বলিয়া আমাকেই কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। ডাক্তার মহাশয় পার্শী, বড় ভাল মানুষ ছিলেন। আমি বলিলাম "আমরা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী, সুতরাং আমার পক্ষে ঐ দুই দ্রব্যের একটাও দেওয়া সম্ভব নয়। আর কিছুর কথা বলিতে পারেন?"

ডাক্তার বলিলেন—"আপনার ছেলের জীবনের আশঙ্কা আছে। দুধ আর জল মিশাইয়া দিবেন। কিন্তু উহাতে তাহার পুরা পুষ্টি হইবে না। আপনি ত জানেন আমি অনেক হিন্দু পরিবারে চিকিৎসা করিয়া থাকি। ঔষধ বলিয়া যাহা ইচ্ছা দিই, কেন না কেহ খাইতে আপত্তি করে না। আমার মনে হয়—যদি ছেলের উপর আপনি এখন এতটা কঠিন না হ'ন তাহা হইলেই ভাল হয়।"

"আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক এবং আপনি এই রকমই বলিবেন। কিন্তু আমার দায়িত্ব বড় বেশী। ছেলে যদি বড় হইত তাহা হইলে তাহার ইচ্ছা জানার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এখন এই বালকের হইয়া আমাকেই কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। আমার মনে হয় যে, ধর্ম্মের পরীক্ষা এই রকম সময়েই হয়। ভাল-মন্দ জানি না, কিন্তু আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস এই যে, মানুষের মাংসাদি খাইতে নাই। বাঁচিয়া থাকার চেষ্টার একটা সীমা আছে। বাঁচিয়া থাকার জন্যও আমরা কতকগুলি কার্য্য করিতে পারি না। ধর্ম্মের মর্য্যাদাই আমার ও আমার নিজের লোকের জন্য, এমন সময়েও মাংস ইত্যাদি দ্রব্য খাওয়া নিষেধ করিতেছে। আপনি যে প্রকার বলিলেন সে প্রকার বিপদও যদি হয় তবে আমি নিরুপায়। কিন্তু আপনার নিকট একটা নিবেদন আছে। আপনার ব্যবস্থা অনুযায়ী ত চলিব না। এই ছেলের নাড়ীর ও বুকের অবস্থা আমার বুঝিতে পারার মত জ্ঞান নাই, তবে আমার জল-চিকিৎসা কিছু জানা আছে। আমি সেই চিকিৎসা করিব ঠিক করিতেছি। যদি আপনি মাঝে মাঝে আসিয়া মণিলালের শরীরের অবস্থা দেখেন ও আমাকে বলেন তাহা হইলে উপকৃত হইব।"

ডাক্তার মহাশয় আমার অসুবিধা বুঝিতে পারিলেন এবং আমার অনুরোধ অনুযায়ী মণিলালকে দেখিতে আসিতে স্বীকার করিলেন।

যদিও মণিলালের বিচার করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা সম্ভব ছিল না, তথাপি আমি তাহাকে ডাক্তারের সহিত যে কথা হইয়াছিল তাহা বলিলাম ও সে কি বলে জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিল—"তুমি জল-চিকিৎসাই কর। আমি ডিম ও সুরুয়া খাইব না।"

এই কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আমি ইহাও জানিতাম যে, যদি আমি ঐ দুই বস্তু তাহাকে খাওয়াইতে চাহিতাম তবে খাওয়াইতে পারিতাম।

আমি ক্যুহ্নের চিকিৎসা-পদ্ধতি জানিতাম। পরীক্ষাও করিয়াছিলাম। রোগের মধ্যে উপবাসের একটা বড় প্রয়োজন আছে ইহাও বুঝিতাম। ক্যুহ্নের নিয়মানুযায়ী তাহাকে কটি-স্নান করাইতে আরম্ভ করিলাম। তাহাকে জলের টবে তিন মিনিটের বেশী রাখিতাম না। তিন দিন কেবল কমলা লেবুর রসের সহিত জল মিশাইয়া খাওয়াইয়া রাখিলাম।

জ্বরের তাপ কমে না। রাত্রে কখন কখন প্রলাপ বকে। ১০৪° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠে। "যদি ছেলে না বাঁচে তবে লোকে কি বলিবে? দাদাই বা কি বলিবেন? অন্য ডাক্তারকে ডাকা হইল না কেন? কবিরাজ দেখানো হইল না কেন? ছেলেদের উপর নিজের খেয়াল চালাইতে বাপ-মার কি অধিকার আছে?" —এই প্রকার ভাবনা একবার হয়, আবার বিরুদ্ধ ভাবনাও আসে। "নিজের বেলা যা করিয়া থাক ছেলের বেলাও তাই কর, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন। তোমার জল-চিকিৎসার উপর বিশ্বাস আছে, ঔষধের উপর নাই। ডাক্তার জীবন দান করিতে পারে না। তাহার পক্ষেও এই চিকিৎসা করা পরীক্ষা করাই। জীবন-সূত্র এক মাত্র ঈশ্বরের হাতে আছে। ঈশ্বরের নাম লইয়া, তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া তুমি চল, তোমার নিজের পথ ছাড়িও না।'

এই প্রকার ভাবের আঘাত মনে চলিতেছিল। রাত্রি হইল। আমি মণিলালের পাশেই শয্যায় শুইয়াছিলাম। আমি তাহাকে

ভিজা কাপড় দিয়া জড়াইয়া রাখা স্থির করিলাম এবং উঠিয়া একখানা চাদর লইয়া ঠাণ্ডা জলে ভিজাইলাম। অবশেষে চাদরখানা নিঙড়াইয়া লইয়া উহা দ্বারা মণিলালের পা হইতে গলা পর্য্যন্ত জড়াইলাম। তাহার উপর দুইটা পুরু কম্বল চাপা দিলাম। মাথার উপর ভিজা তোয়ালে দিলাম। গা যেন গরম লোহার মত পুড়িয়া যাইতেছিল। শরীর একেবারে শুষ্ক, ঘাম মাত্রও ছিল না।

আমি খুব পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। মণিলালের কাছে তাহার মাকে রাখিয়া আমি আধ ঘণ্টার জন্য চৌপাটীতে বেড়াইয়া হাওয়া খাইতে ও শান্তি পাওয়ার চেষ্টায় গেলাম। রাত তখন প্রায় দশটা। লোক চলাচল কমিয়া গিয়াছিল। কে যায় না যায় খেয়াল ছিল না। আমি চিন্তা-সমুদ্রে ডুবিয়া ছিলাম। হে ঈশ্বর! এই ধর্ম্ম-সঙ্কটে তুমি রক্ষা কর। রাম রাম মুখে বলিতেছিলাম। একটুক পরেই ফিরিলাম। বুক দুর্ দুর্ করিতেছিল। যখন ঘরে প্রবেশ করিলাম তখনই মণিলাল বলিয়া উঠিল—"বাবা, ফিরিয়াছ?"

"হাঁ বাপ।"

"আমাকে বাহির করিয়া লও—জ্বলিয়া গেলাম যে।"

"ঘাম হইতেছে কি?"

"ঘামে ভিজিয়া গিয়াছি, আমাকে এইবার বাহির করিয়া লও বাবা।"

মণিলালের কপালে হাত দিয়া দেখিলাম। কপালে মুক্তাবিন্দুর মত ঘাম দেখা দিয়াছে। তাপ কমিতেছিল। আমি ঈশ্বরের কৃপা স্মরণ করিলাম।

"মণিলাল তোমার তাপ কমিতেছে। আর একটুখান ঘামতে দাও না?"

"না বাবা এখন আগুন হইতে আমাকে টানিয়া লও, আবার একবার না হয় দিও।"

আমার ধৈর্য্য আসিয়াছিল, কথা বলিয়া বলিয়া কিছু সময় কাটাইলাম। কপাল হইতে ঘাম গড়াইয়া পড়িতেছিল। আমি চাদর খুলিয়া লইলাম, শরীর পুঁছিয়া দিলাম, তারপর বাপ-বেটা এক সাথেই শুইয়া পড়িলাম। দুইজনেই খুব ঘুমাইলাম।

সকালে দেখিলাম—মণিলালের জ্বর অনেক কমিয়া গিয়াছে। জল দেওয়া দুধ ও ফলের উপর চল্লিশ দিন কাটিল। আমি নির্ভয় হইলাম। জ্বর অবিরাম ধরণের ছিল, কিন্তু চিকিৎসা-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আজ আমার ছেলেদের মধ্যে মণিলালের শরীর সকলের অপেক্ষা মজবুত।

কে বলিবে কেমন করিয়া সে আরাম হইয়াছিল? ঈশ্বরের কৃপা, অথবা জল-চিকিৎসা, অথবা অল্পাহার ও শুশ্রূষা—কিসে আরাম হইয়াছিল আজ কে তাহা বলিবে? সকলেই নিজ নিজ শ্রদ্ধানুযায়ী ইহার জবাব দিবে। আমি ত জানিতাম ঈশ্বর আমার মুখ রাখিয়াছিলেন এবং আজ পর্য্যন্তও তাহাই মনে করি।

২৩

দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া এসো

মণিলাল ত ভাল হইল, কিন্তু আমি দেখিলাম গীরগামের বাড়ীটা ভাল না। স্যাঁৎসেঁতে ছিল, ভাল আলো আসিত না। সেইজন্য রেবাশঙ্কর ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করিয়া বোম্বাই এর কোনও পাড়ায় খোলা জায়গায় বাংলা ভাড়া লওয়া স্থির করিলাম। বান্দ্রা, সান্তাক্রুজ ইত্যাদি স্থানে ঘুরিলাম। বান্দ্রায় কতলখানা * ছিল বলিয়া আমাদের কাহারও পছন্দ হইল না। ঘাটকোপার ইত্যাদি স্থান সমুদ্র হইতে দূরে। সান্তাক্রুজে একটা সুন্দর বাংলা পাইলাম। সেইখানে আসিলাম এবং স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া সুরক্ষিত হইলাম বলিয়া মনে হইল। চর্চ্চ-গেট ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য প্রথম শ্রেণীর মাসিক টিকিট করিলাম। প্রথম শ্রেণীতে অনেক সময় আমি একাই যাইতাম বলিয়া অভিমান হইত—একথা স্মরণ আছে। অনেক সময় বান্দ্রা হইতে চার্চ্চ-গেট পর্য্যন্ত থ্রু-ট্রেনে যাওয়ার জন্য বান্দ্রা পর্য্যন্ত হাটিয়াই গিয়াছি।

ব্যবসা যেমন চলিবে ভাবিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা ভালই চলিতে লাগিল। দক্ষিণ আফ্রিকার মক্কেলেরা এখানে আমাকে কিছু কিছু কাজ দিতেন। তাহা হইতে খরচ সহজেই উঠিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইল।

হাইকোর্টের কাজ এখনো কিছু পাইতাম না। ঐ সময় 'মুট'

* Slaughter house—গো-মেষাদি মানুষের আহারের জন্য হত্যা করার স্থান।

(আলোচনা) চলিতেছিল, আমি তাহাতে যাইতাম। উহাতে যোগ দেওয়ার সাহস ছিল না। আমার মনে আছে, উহাতে জমিয়াৎরাম নানাভাই প্রধানতঃ যোগ দিতেন। অন্য নূতন ব্যারিষ্টারেরা যেমন যায় আমি তেমনি হাইকোর্টে মামলা শুনিতে যাইতাম। সেখানে যাহা শিখিতাম তাহা অপেক্ষা বেশী উপভোগ করিতাম—হুড়্‌হুড়্‌ প্রবাহিত সমুদ্রের হাওয়া আর ঝিমানো। অন্য সাথীদিগকেও ঝিমাইতে দেখিতাম, সেইজন্য লজ্জাও হইত না। আমি দেখিয়াছিলাম যে ওখানে ঝিমানোটাই ফ্যাশন।

হাইকোর্টের পুস্তকাগার ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইল। সেখানে নূতন কিছু পরিচয় করিব ইচ্ছা করিলাম। আমার মনে হইল অল্পদিনের মধ্যেই আমি হাইকোর্টে কাজ করিতে পারিব। এই ভাবে এই দিক হইতে আমার ব্যবসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম।

অন্য দিকে গোখলের চক্ষু আমার উপর নিয়ত ছিল। তিনি সপ্তাহে দুই তিনবার করিয়া আমার চেম্বারে আসেন এবং আমার খবর ল'ন। নিজের বিশেষ বন্ধুদিগকে কখন কখন সঙ্গে লইয়া আসেন। তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতির সঙ্গে আমাকে পরিচিত করেন। কিন্তু আমার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই ঈশ্বর স্থির রাখিতে দেন নাই বলা যায়। যখন আমি ধীরে-সুস্থে বসিয়া যাওয়া স্থির করিয়াছি ও কতকটা স্বস্তি পাইতে আরম্ভ করিয়াছি তখনই দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে তার আসিল—"চেম্বারলেন এখানে আসিতেছেন, আপনার আসা চাই।" আমি তার করিলাম—"আমার যাওয়ার খরচ পাঠাইবেন, যাইতে প্রস্তুত আছি।"

আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, একবছরের মধ্যেই ফিরিয়া

আসিতে পারিব। তাই সান্তাক্রুজের বাড়ীটা রাখা ও সেখানে ছেলে-পেলেদের থাকাই ভাল মনে করিলাম।

আমি তখন ভাবিতাম যে, যে-সকল যুবক দেশে রোজগার করিতে না পারে, অথচ এদিকে সাহস আছে তাহাদের পক্ষে দেশের বাহিরে যাওয়াই ভাল। সেইজন্য আমার সঙ্গে চার পাঁচজনকে লইয়া গেলাম। তাহাদের মধ্যে মগনলাল গান্ধীও ছিলেন।

গান্ধী পরিবারটা বড়—আজও বড়ই আছে। আমার এই মত ছিল যে, আলাদা হইয়া যে থাকিতে চায় তাহার স্বতন্ত্র হইয়া থাকাই ভাল। আমার পিতা অনেকের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে রাজবাড়ীর চাকুরীতে। আমি কিন্তু মনে করিতাম, যদি কেহ এই চাকুরী হইতে বাহির হইয়া আসে তবে তাহাই ভাল। আমার অবশ্য তাহাদের চাকুরী পাইতে কোন সাহায্য করার সামর্থ্য ছিল না। শক্তি যদি থাকিত তবুও ইচ্ছা করিতাম না। আর সেইজন্যই যদি কেহ স্বাবলম্বী হয় তবে তাহা ভাল বলিয়াই মনে হইত।

তারপর আমার আদর্শ যখন আরো উচ্চতর হইয়াছিল (আমি উচ্চতর বলিয়াই মনে করি) তখন আবার সেই যুবকদিগকে আমার আদর্শের দিকে টানিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে মগনলাল গান্ধীকেই ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে গিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সফলতা পাইয়াছিলাম। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনা ভবিষ্যতে করিব।

ছেলেপেলেদের সঙ্গে বিচ্ছেদ, বাঁধা ঘর ভাঙ্গা, নিশ্চিত অবস্থা হইতে অনিশ্চিতে প্রবেশ—এ সকল মুহূর্ত্তের জন্য ব্যথিত করিয়াছিল। কিন্তু আমি ত অনিশ্চিতের মধ্যে জীবন যাপন করিতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই জগতে ঈশ্বর, অর্থাৎ সত্য ছাড়া আর

কিছুই যখন নিশ্চয় নয়, তখন অন্ত নিশ্চয়তার দিকে দৃষ্টি করাই অন্যায়। আমাদের আশেপাশে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, যাহা কিছু ঘটিতেছে, এ সকলই অনিশ্চিত, সকলই ক্ষণিক। তাহারই ভিতরে এক পরমতত্ত্ব নিশ্চিত রূপ লইয়া লুকাইয়া আছে। তাহার যদি ক্ষণিক দর্শনও পাওয়া যায়, যদি তাহার উপর শ্রদ্ধা রাখা যায়, তবে জীবন সার্থক হয়। তাহারই অনুসন্ধান পরম পুরুষার্থ।

আমি ডারবানে একদিনও আগে পৌঁছিয়াছিলাম বলা যায় না। মিঃ চেম্বারলেনের নিকট ডেপুটেশন যাওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছিল, আর ইহাও স্থির হইয়াছিল যে—তাঁহার নিকট পড়ার জন্য আরজি আমাকেই লিখিতে হইবে এবং আমাকে ডেপুটেশনের সঙ্গেও যাইতে হইবে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

PUBLIC LIBR... EST. 1880

নির্ঘণ্ট পত্র

অ

অক্‌সফোর্ড, ৯৩

অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট, ২১০, ২১২

আ

আগ্রা ৩৮৬

আদমজী মিঞা খান, ১৮২, ২৩২, ২৩৫, নাতাল কংগ্রেসের সম্পাদকীয় কার্য্যে ইঁহার কুশলতা ২৭০ ; ৩১৯

আব্‌দুল করিম ঝভেরী, শেঠ ১৬৯,

আব্‌দুল করিম হাজি আদম ৩০৬

আব্‌দুল গনি, শেঠ, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫

আব্‌দুল্লা শেঠ, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, গ্রন্থকারের হ্যাট মাথায় দেওয়ায় তাঁহার আপত্তি ১৮০ ; ১৮২-১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ১৯৮, ২০১, ২২৫ গ্রন্থকারের বিদায় অভিনন্দনে ২২৮-২৩০ ; ২৩২, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৪, ২৪৫

আবুবকর আমদ, শেঠ, নাতালের সর্ব্ব প্রথম ভারতীয় ব্যবসায়ী ২৫৫

আমদ জীভা ২৩২, ২৩৫

আমেরিকা ১২৭, ১৩১

আরনল্ড, সার এডুইন, গ্রন্থকার দ্বারা স্থাপিত নিরামিষাহারীদের মণ্ডলীর সহকারী সভাপতি ১০১ ; তাঁহার গীতার অনুবাদ ও বুদ্ধ চরিত ১১৭ ; ১১৯, ২৬২

আরভিং, ওয়াশিংটন ২৬০

আর্থার মিঃ, ২৩৩

আলেকজাণ্ডার, মিঃ, ডারবানের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—গ্রন্থকারের জন্য পুলিশ রক্ষী দল প্রেরণ ৩১২ ; উত্তেজিত জনগণকে শান্ত করিবার চেষ্টা এবং গ্রন্থকারের ছদ্মবেশে পলায়নে সাহায্য দান ৩১২-৩১৪

আলেকজাণ্ডার, মিসেস্, ডারবানের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পত্নী, ক্ষিপ্ত জনতার কবল হইতে গ্রন্থকারকে রক্ষার চেষ্টা ৩১১-৩১২

আহ্‌মেদাবাদ, ৬৩, ৩২৩

আসাম, ষ্টিমার ১৪৩

ইউক্লিড ৩৪

ইসা হাজি সুমার শেঠ, ১৯১, ১৯২

নির্ঘণ্ট

উ

উইলিয়াম্‌স ও এডওয়ার্ড, ১৩৮

উডগেট ৩৪৮

এ

এডওয়ার্ড সপ্তম, ২৮১

এডিসন, ১০৬

এডেন, ১৪৭

এফিল টাওয়ার, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪

এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৫৭

এলগিন, লর্ড, ২৫৬

এলারথর্প, মিঃ ২৯৫

এলিন্সন, ডাঃ, ৮৫, ১০৩, ১০৪, ৩৩৩

এসকম্ব, মিঃ, ২৩০, ২৩৩, ২৩৯, ২৪২, ৩০৬, ৩১০, ৩১৫, ৩৪৭

ও

ওতা গান্ধী—গান্ধী উত্তম চন্দ দেখ।

ওয়াচা মিঃ, দীনশা, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬৮, ৩৬৯

ওয়ালটন, মিঃ স্পেনসর ২৫৯

ওয়েট, মিঃ জ্যাকোবাস, ডি, প্রিটোরিয়ার ব্রিটিশ এজেণ্ট, ২১০

[illegible] ২২৩

ওয়েষ্ট কেন্‌সিঙ্গ্‌টন, ৮২

ওয়েসলিয়ান গির্জ্জা ২৬১

ওল্ডফিল্ড ডাঃ, ১০১, ১০২

ক

কথাভাটে, প্রফেসর ৩৭৪, ৩৮১

কলিকাতা, ২৭৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬৪, ৩৭০, ৩৭৮, ৩৮২, ৩৮৩

কলোনিয়াল বর্ণ ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল এসোসিয়েশন, ২৪৮

কাথিয়াওয়াড়, ১৯, ২৮, ৬৩, ১৬৪, ১৬৭

কাবাগান্ধী—গান্ধী করমচন্দ দেখুন।

কামা, মিঃ, ২৮৩

কার্ডিনাল ম্যানিং ১২৮, ১২৯, ১৩০

কার্জ্জন লর্ড, ৩৭০, ৩৭১

কার্লাইল, ১১৯, ২৬০

কাশী ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৮৮-৩৯০

কিংস ফোর্ড, ডাঃ অ্যানা ৮৫, ২২৬

কুরল্যাণ্ড, ষ্টিমার ২৯৮; ঝড়ের প্রকোপে ৩০৩; উহার যাত্রীদের ডাঙ্গায় নামিতে বাধা ৩০৫—৩০৯

কে ও মলিসন ১৪২

কেম্ব্রিজ ৯৩

কেলনার ২৭৪

কোট্‌স, মিঃ ২০২-২০৬; ২১৩ গ্রন্থকারের লাঞ্ছনা দর্শন ২১৫; ২২৬

কোরাণ ১৭৭

ক্রাউজ ডাঃ, প্রিটোরিয়ার সরকারী উকিল, ২১৩, ২১৪

নির্ঘণ্ট

ক্রুগার, ২১৪

ক্যাহ্ন, ৩৯৮

খ

খরশেদজী ২৮৮

খান, মিঃ, ৩২৮, ৩৫৪

গ

গডক্রে, মিঃ জেম্‌স্ ১৮২,

গডক্রে, মিঃ সুভান ১৮২, ২৩২,

গান্ধী উত্তম চন্দ—গ্রন্থকারের পিতামহ ১১

গান্ধী করমচন্দ—গ্রন্থকারের পিতা, পোরবন্দর, রাজকোট এবং ভাঁকানারের দেওয়ান ১১; তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ১২; তাঁহার পলিটিক্যাল এজেণ্টের সহিত বিরোধ ১২; দৈবদুর্ঘটনায় আঘাত-প্রাপ্তি ২২; গ্রন্থকারের দ্বারা শুশ্রূষা ৩২; পীড়া ও মৃত্যু ৫২-৫৫

গান্ধী কস্তুর-বাঈ, গ্রন্থকারের পত্নী, তেজস্বিনী রমণী ২৬; তাঁহাকে লেখা পড়া শিখানোর চেষ্টা ২৭-২৮; অন্যায় সন্দেহে তাঁহার প্রতি অত্যাচার ৪৫-৪৬; স্বামী কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক পিতৃ গৃহে প্রেরণ ১৫৪; উপঢৌকনের দ্রব্য ফিরাইয়া দিতে দ্বিধা ৩৫৭-৩৫৮

গান্ধী তুলসীদাস, গ্রন্থকারের পিতৃব্য, পোরবন্দরের দেওয়ান ১১

গান্ধী পুতলী-বাঈ, গ্রন্থকারের মাতা, ১২; অত্যন্ত ধর্ম্ম-পরায়ণা ছিলেন ১৩; তাঁহার ব্রত পালন ও উপবাস ১৩-১৪; তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ১৪; গ্রন্থকারের বিলাত যাত্রায় তাঁহার অমত ৬৫, ৬৮; পরিশেষে বিলাত যাত্রায় আজ্ঞা দান ৬৯; তাঁহার মৃত্যু ১৪৮

গান্ধী মগনলাল ৪০৩,

গান্ধী মণিলাল, গ্রন্থকারের পুত্র, পীড়া ও আরোগ্য ৩৯৬—৪০০, ৪০১

গান্ধী মোহন দাস, গ্রন্থকার জন্ম এবং বাল্যাবস্থা—পোরবন্দরে ১৪; নকল করা সম্পর্কে শিক্ষকের ইঙ্গিত গ্রহণে অনিচ্ছা ১৫-১৬, শ্রবণ ও হরিশ্চন্দ্র নাটকের প্রভাব ১৭-১৮; বিবাহ তের বৎসর বয়সে ১৯; প্রেম-সংশয়ী স্বামী ২৫-২৬; স্ত্রীর প্রতি আসক্তি ২৭, খেলা ধূলা ও ব্যায়ামের প্রতি বিরাগ ৩১-৩২; ব্যায়ামে অনুপস্থিতির জন্য জরিমানা দেওয়া ৩২; হস্তাক্ষরের উন্নতি সাধনে অবহেলা ৩৩; সংস্কৃত শিক্ষা ৩৫; বন্ধুর কৌশলে মাংসাহার ৩৮-৪৩; বেশ্যাগৃহে গমন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে অধঃপতন হইতে উদ্ধার ৪৪-৪৫; স্বামী-স্ত্রীর ভিতর মনোমালিন্য সৃষ্টিতে বন্ধুর কারসাজি ৪৫-৪৬; সিগারেট খাওয়া ও [illegible] পয়সা চুরি ৪৭; আত্ম-হত্যার চেষ্টা ৪৮; ঋণ শোধের জন্য সোনার টুকরা চুরি ৪৯; অপরাধ স্বীকার ৫০;

নির্ঘণ্ট

পিতার সেবা—ভোগেচ্ছার জন্য তাঁহার মৃত্যু শয্যায় অনুপস্থিতি ৫২-৫৬; রম্ভার শিক্ষা ৫৭; লাধা মহাশয়ের রামায়ণ পাঠের প্রভাব ৫৮-৫৯; শামলভট্টের কবিতার শিক্ষা ৬২; ব্যারিষ্টার হইবার জন্য মাভজী দভের উপদেশ ৬৩-৬৫; লেলী সাহেবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা ৬৬-৬৭; মদ মাংস ও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবার শপথ গ্রহণ ৬৯; বিদেশ গমনের জন্য জাতিচ্যুত, ৭০-৭২; শ্রীযুক্ত মজুমদারের সহিত ইংলণ্ড যাত্রা এবং লণ্ডনে পদার্পণ ৭৩-৭৬; ডাঃ মেহ্‌তার উপদেশ ৭৭; মাংসাহারের জন্য বন্ধুর যুক্তি প্রদর্শন ৮০-৮১; সল্টের গ্রন্থের প্রভাব ৮৩-৮৪; মাংস খওয়াইবার জন্য বন্ধুর শেষ চেষ্টা ৮৬-৮৭; ইংরেজ ভদ্রলোক বনিবার চেষ্টায় পোষাকের পরিবর্ত্তন ও নাচ, সঙ্গীত ফরাসী ভাষা প্রভৃতি শিক্ষার প্রয়াস ৮৭-৯০; হিসাবে ও খরচের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৯১-৯২; লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা ৯৩-৯৪; খাদ্য সম্পর্কে পরীক্ষা ৯৬-৯৯; নিরামিষাহারীদের মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা ১০১; ডাঃ এলিন্সনের পক্ষ সমর্থন ১০২-১০৪; হিসাবে প্রাথমিক ব্যর্থতা ১০৪-১০৬; অবিবাহিত বলিয়া পরিচয় দান ও অপরাধ স্বীকার ১১১-১১৪; এডুইন আরনল্ডের বুদ্ধ চরিতের সহিত পরিচয় ১১৭; বাইবেলের সহিত পরিচয় ১১৮; ব্রাড্‌লের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগদান ও নাস্তিকতার প্রতি বিরুদ্ধভাবের বৃদ্ধি ১১৯-১২০; নারীর প্রতি মোহ এবং বন্ধুর সাবধানতায় উদ্ধার ১২২-১২৩; নারায়ণ হেমচন্দ্রের সহিত পরিচয় ১২৫-১৩১; প্যারিস প্রদর্শনীতে গমন ১৩২-১৩৪; ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও পাশ ১৩৫-১৩৮; গ্রন্থকারের প্রতি পিঙ্কাটের উপদেশ ১৪০-১৪১; দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ১৪৭; মাতার মৃত্যুতে দুঃখ ১৪৮; কবি রায়চাঁদের সহিত পরিচয় ১৪৮-১৫১; স্ত্রীর সহিত ঝগড়া ১৫৪; পরিবারে ইউরোপীয় চাল-চলনের প্রবর্ত্তন ১৫৫; প্রথম মোকদ্দমায় ব্যর্থতা ১৫৮-১৫৯; পলিটিকাল এজেণ্টের দ্বারা অপমান ১৬৩-১৬৬; দক্ষিণ আফ্রিকাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব ১৬৯; দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা ১৭২; জাঞ্জীবারে পতিতা গৃহে ১৭৪-১৭৫; আবদুল্লা শেঠের সংস্পর্শে ১৭৬-১৭৭, পাগড়ী খোলা সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ মানিতে অস্বীকার ১৭৮; মরিৎজবর্গের ট্রেনে অপমান ১৮৩; গাড়ী চালকের হাতে লাঞ্ছনা ১৮৯-১৯১; হোটেলে স্থান দিতে অস্বীকার ১৯২; মিঃ বেকারের সহিত সাক্ষাৎ ১৯৮; খৃষ্টান বন্ধু ও খৃষ্টধর্ম্মের

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থের সহিত পরিচয় ২০২-২০৬ ; ভারতীয়দের সভায় প্রথম বক্তৃতা ২০৭-২০৮ ; প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের শিপাহির পদাঘাত ২১৪-২১৫ ; ওকালতী শিক্ষার সুযোগ ২১৭-২১৯ ; দাদা আবদুল্লার মামলার নিষ্পত্তি ২২০-২২১ ; ওয়েলিংটন কনভেনসনে যোগদান ২২২-২২৪ ; খ্রীষ্টধর্ম্মের সম্পর্কে মতামত ২২৪-২২৫ ; টলষ্টয়ের পুস্তকের প্রভাব ২২৬ ; ফ্রেঞ্চাইজ বিল ও দেশে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা ২২৮-২৩১ ; বিলের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা ২৩২-২৩৬ ; নাতালে স্থিতি ২৩৬-২৩৮ ; বাধা সত্ত্বেও আদালতে ওকালতী করার অনুমতিলাভ ২৩৯-২৪২ ; নেতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের এবং কলোনিয়াল বর্ণ ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল এসোসিয়েসনের জন্ম ২৪৪-২৪৮ ; দুইখানা পুস্তিকার রচনা ২৪৮-২৪৯ ; বালাসুন্দরমকে সাহায্য দান ২৫০-২৫২ ; তিন পাউণ্ড করের বিরুদ্ধে আন্দোলন ২৫৪-২৫৮ ; বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক বিচার ২৫৯-২৬১ ; পুত্রকে গ্রন্থকারের সহিত মিশিতে দিতে ইউরোপীয় মাতার আপত্তি ২৬২-২৬৩ ; দুশ্চরিত্র সঙ্গীকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া ২৬৪-২৬৬ ; ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তামিল ও উর্দ্দু শিক্ষা ২৭০-২৭১, পায়োনিয়ারের সম্পাদক মিঃ চেজ্নীর সহিত পরিচয় ২৭৪-২৭৫ ; 'সবুজ পুথির' রচনা ও প্রচার ২৭৫-২৭৬ ; রাজকোটের স্বাস্থ্য সমিতিতে সেবার কাজ ২৭৬-২৭৯ ; ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য ২৮০-২৮২ ; রাণাডে, তৈয়বজী, ফিরোজশা, ওয়াচার প্রভৃতির সহিত পরিচয় ২৮২-২৮৪ ; গ্রন্থকারের রুগ্নের শুশ্রূষার প্রতি অনুরাগ ২৮৪-২৮৫ ; পেস্তনজী পাদশাহর সহিত সাক্ষাৎ ২৮৮-২৮৯ ; তিলক, গোখলে এবং ভাণ্ডারকরের সহিত সাক্ষাৎ এবং পুনায় সভা ২৯১-২৯৩ ; মাদ্রাজে ২৯৩ ; ইংলিশম্যানের মিঃ সাণ্ডার্সের সাহায্য ২৯৭-২৯৮ ; দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিবার জন্য তার ২৯৮ ; সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা ২৯৮ ; পরিবারের পোষাকের পরিবর্ত্তন ৩০১-৩০২, সমুদ্রের ঝড়ে ৩০৩-৩০৪ ; যাত্রীদের নামায় শ্বেতাঙ্গদের বাধা দান ৩০৫-৩০৯ ; ডারবানে জনতার গ্রন্থকারকে আক্রমণ ৩১১-৩১২ ; ছদ্মবেশে পলায়ন ৩১২-৩১৪ ; প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মামলা করিতে অস্বীকার ৩১৫-৩১৬ ; ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে দুইটি বিলের নিষ্ফল আন্দোলন ৩১৮-৩১৯ ; স্থায়ী ফণ্ড দ্বারা সাধারণ প্রতিষ্ঠা[illegible] সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত ৩২০-৩২১ ; বালকদের শিক্ষা ৩২২-৩২৬ ; কুষ্ঠরোগগ্রস্তের সেবা ৩২৭ ; হাসপাতালে

শুশ্রূষাকারীর কাজ ৩২৭-৩২৮ ; পুত্রদের লালন পালন ৩২৮ ; পত্নীর প্রসবকালে শুশ্রূষা ৩২৯ ; আত্ম-সংযমে প্রয়াস ৩৩২-৩৩৩ ; ব্রতগ্রহণ সম্পর্কে গ্রন্থকারের মন্তব্য ৩৩৪-৩৩৫ ; ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ ৩৩৬ ; ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়ম ৩৩৭-৩৪১ ; নিজের হাতে কাপড় কাঁচা এবং চুল ছাটা ৩৪২—৩৪৫ ; বোয়ার যুদ্ধে সেবা-সৈন্য দল গঠন ও পরিচালনা ৩৪৬-৩৪৯ ; ভারতীয়দের দ্বারা বাড়ীঘর পরিষ্কৃত রাখার ব্যবস্থা করানো ৩৫১-৩৫২ ; ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষে প্রবাসী ভারতবাসীদের সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা ৩৫৩ ; উপঢৌকন প্রাপ্ত জিনিষ সমস্ত সাধারণের সেবার কাজে দান ৩৫৫-৩৫৮ ; ১৯০১ সালে জাতীয় মহাসভায় যোগদানের জন্য কলিকাতায় আগমন ৩৬০ ; পায়খানা পরিষ্কার ৩৬২ ; শ্রীযুত ঘোষালের কেরাণী ও বেয়ারার কাজ ৩৬৫-৩৬৬ ; দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন করা ও তাহা পাশ করাইয়া লওয়া ৩৬৮-৩৬৯ ; রাজদরবারের পোষাক সম্পর্কে রাজাদের সঙ্গে আলোচনা ৩৭১-৩৭২ ; ডাঃ পি-সি [illegible] পরিচয় ৩৭৩-৩৭৪ ; গোখলের সঙ্গে রাণাডের সম্বন্ধে আলোচনা ৩৭৪-৩৭৫ ; কালীচরণ ব্যানার্জ্জীর সহিত পরিচয় ৩৭৭-৩৭৮ ; কালীঘাটে মন্দির দর্শনার্থে গমন ও ছাগ বলিতে অস্বস্তি বোধ ৩৭৯-৩৮০, ভগ্নী নিবেদিতার সহিত পরিচয় ৩৮২ ; ব্রহ্মদেশ পরিদর্শন ৩৮৩ ; তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেন সম্পর্কে মন্তব্য ৩৮৬-৩৮৮ ; কাশী বিশ্বেশ্বর মন্দিরে—৩৮৯-৩৯১ ; রাজকোটে ওকালতী ৩৯২-৩৯৪ ; ইংরেজ আমলাদের অবিচার ৩৯৩-৩৯৪ ; মণিলালের অসুখ ৩৯৬-৪০০ ; দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে পুনরাহ্বান ৪০২ ; মগনলাল গান্ধী ও অন্যান্য যুবকদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা ৪০৩।

গান্ধী বীরচন্দ ১৫৭, ২৮৩

গীতা ১৩, ১১৬, ১১৭, ১১৯

গীমী দোরাবজী এদুলজী, হেডমাষ্টার ৩১, ৩২

গীরগাম ৩৯৬, ৪০১

গুডিভ ১৩৮

গুজরাট ৪১

গেব, মিস্, ২০২

গোখলে ২৫৮, গ্রন্থকারের সহিত প্রথম পরিচয় ২৯১-২৯২ ; গ্রন্থকার কর্তৃক গোখলের উত্তরীয় ইস্ত্রী ৩৪৩—৩৪৪ ; ৩৬৬ ; কংগ্রেস বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে তাঁহার চেষ্টায় গ্রন্থকারের প্রস্তাব পাশ ৩৬৭-৩৬৮ ; ৩৭০, ৩৭৩-৩৭৬ ; ৩৭৭, ৩৮১-৩৮৫, ৩৯২, ৪০২

নির্ঘণ্ট

গ্ল্যাডষ্টোন, মিঃ ৩৩১
গ্ল্যাডষ্টোন মিসেস ৩৩১

ঘ

ঘাটকোপার ৪০১
ঘোষাল মহাশয়, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬

চ

চান্দ্রায়ণব্রত, ১৩
চার্লস টাউন ১৮৮, ১৮৯, ২৪৭
চার্চ্চ গেট ৪০১
চিএভেলী ৩৪৯
চেজনী, মিঃ ২৭৪
চেম্বারলেন, ৩১৫, ৩১৬, ৪০২, ৪০৪
চৌপাটী ৩৯৯

ছ

ছায়া, ৩৮৪

জ

জনষ্টন, মিঃ, ১৯৭, ১৯৮, ২০০
জমিয়াৎরাম নানা ভাই ৪০২
জয়পুর ৩৮৬
জাইলস, মিঃ ১৫
জাঞ্জীবার—পতিতার গৃহে ১৭৪-১৭৫, ১৮৩, ২৮৮
জামনগর, ৩৯২, ৩৯৫
জার্মিষ্টন, ১৯৫
জুলুবিদ্রোহ, ৩৩৩, ৩৩৪
জেরাম দাস, ১
জোহানেসবর্গ ১৮৯, ১৯২, ২১৪, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৪৩
জ্ঞানবাপী, ৩৯০

ট

টলষ্টয়, এফিল টাওয়ার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য ১৩৪ ; ১৫১, গ্রন্থকারের উপর তাঁহার পুস্তকের প্রভাব ২২৬ ; ২৬১
ট্রান্সভাল ১৭৬, ১৯৩, ২১০, ২১২, ২১৪
টোঙ্গাট ২৪৭

ঠ

ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১২৬, ৩৮১
ঠাকুর মহারাজা, ২৯৬

ড

ডারবান, ১৭৬, ১৭৮, ১৮২, ১৮৪-১৮৬, ১৮৮, ২২৮, ২৩২, ২৪৫, ২৯৮, ৩০৪, ৩০৬, ৩০৭, ৩২২, ৩৫১
ডিজরেলী, ১২৮
ডেলি টেলিগ্রাফ ৮৩, ২৯৫
ডেলি নিউজ ৮৩

নির্ঘণ্ট

ত

তুলসীদাস—তাঁহার রামায়ণের প্রতি গ্রন্থকারের অনুরাগ ৫৯

তেলং ৩৭৪, ৩৭৫

তৈয়বজী মিঃ আব্বাস-২৮৮

তৈয়ব হাজিখান মহম্মদ,—মামলায় শেঠ আবদুল্লার প্রতিপক্ষ ১৮৪, ২০৭, ২১০, গ্রন্থকারের আপষের চেষ্টায় তাঁহার সম্মতি ২২০-২১

ত্রিবেণী ২৭৫

ত্রিভুবন দাস, ডাঃ ৩২৯

দ

দক্ষিণ আফ্রিকা ১, ২৯, ৩৩, ১০১, ১০৬, ১৩৮, ১৪২, ১৫৯, গ্রন্থকারের সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ ১৬৯-১৭০; ১৭১, যাত্রা ১৭২; ১৮১, ১৮৬, ২১৮, ২৬৯, ২৯৮, ৩৪৬, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭, ৩৬১, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭৮, ৩৮২, ৩৮৬, ৪০১, ৪০২

দভে কেবলরাম ৬৪, ৩৯২, ৩৯৫

দণ্ডে মাভজী, গ্রন্থকারকে ব্যারিষ্টার হইতে উপদেশ দান, ৬৩-৬৫

[illegible] ৩৬৩

দাউদ মহম্মদ শেঠ ২৩২, ২৩৫

দাদা আবদুল্লা—ইঁহারই মামলার তদ্বিরের ভার লইয়া গ্রন্থকারের দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন ১৬৯; ১৭১, ২০৭, ২১৬, ২১৭, মামলার নিষ্পত্তি ২১৯-২২০; ২২১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৮, ২৪০, ২৯৮, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭

দাদাভাই নওরোজী ৭৬, ১৪০

দাদী বরজোর ৩১২

দেশপাণ্ডে কেশব রাও ২৮৭, ২৮৮

ধ

ধোরাজী ৬৬

ন

নর্ম্মদা শঙ্কর, কবি ৪০, ২৬০

নরসিংরাম ২৩২

নাজর মনসুখলাল ৩০৬, ৩১৯, ৩৫৪

নাতাল ১৭১, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৯, ১৮৫, ১৯৩, ২৫৭, ৩১৮, ৩১৯

নাতাল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস—প্রতিষ্ঠা, নিয়মাবলী, কার্য্য ইত্যাদি ২৪৪-২৪৯; ২৫০, ২৫৭

নারায়ণ হেমচন্দ্র ১২৫-১৩১

নিবেদিতা ভগ্নী ৩৮২

নিষ্কুলানন্দ ২২, ৩৩৫

নোতারদাম ১৩৩

প

পিথাগোরাস, ৮৫

পড়িয়াচি রঙ্গ স্বামী ২৩২

পল মিঃ ১৮২, ২৩২

পাণ্ডে কৃষ্ণ শঙ্কর—গ্রন্থকারের সংস্কৃত শিক্ষক ৩৫,

পাদশা মিঃ পেস্তনজী ২৮৮, ২৮৯, ৩৮২

পাদ্‌শা মিঃ বরজোরজী ২৮৮

পারডিকোপ ১৯০

পার্কার ডাঃ ২০৩

পার্শী রস্তমজী ১৮২, ২৩২, ২৩৫, ২৬৯, ২৮৮, ৩১০, ডারবানে তাঁহার গৃহে গ্রন্থকারের স্ত্রীপুত্রের গমন ৩১১ ; গ্রন্থকারের সেখানে গমন ৩১২, তাঁহার গৃহের সম্মুখে উত্তেজিত জনতা ৩১২ ; ৩১৪, ৩২৭, ৩৫৬

পালনপুর ৩৮৬

পিক্‌কাট মিঃ ফ্রেডরিক, গ্রন্থকারের হাতশায় উৎসাহ দান ১৪০-১৪২, ২১৮

পিট—৮৯

পিয়ারসন ২০৩

পিলে কোলেন্দ ভেলু, এ, ২৩২

পিলে পরমেশ্বরণ জি ২৯৩

পুনা ২৯১, ২৯৩

পেইন, গিলবার্ট, শায়নী—সলিসিটর ৩৯৫

প্যারিস, ১৩০, ১৩২, ১৩৩

পোরবন্দর ১১, গ্রন্থকারের জন্মস্থান ১৪ ; ১৫, ২২, ৫৮, ৬৬, ৬৮, ১৫৯, ১৬৮, ১৬৯, ২২১

পোর্টসমাউথ, গ্রন্থকারের মোহ, ১২১-১২৩

প্রয়াগ, ২৭৪,

প্রিটোরিয়া ১৭৬, ১৭৭, ১৮২, ১৮৩, ১৮৭, ১৯৩—১৯৬, ২০৯, ২১০, ২১৪, ২১৭, ২২৮, ২৫৯, ২৬০, ২৭২, গ্রন্থকারে চুল কাটিতে এই স্থানের শ্বেতাঙ্গ নাপিতের অস্বীকার ৩৪৪

প্রিন্স রণজিৎ সিংহ ৭৬

প্লাইমাউথ ব্রাদার ২০৫, ২০৬, ২১২,

ফ

ফারগুসন, কলেজ ২৯১,

ফিনিক্স ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৩৭

ব

বদরুদ্দীন তৈয়বজী জষ্টিস—১৫১, ১৫৭, ২৮২, ২৮৪

বশিষ্ঠ ৭

বসু ভূপেন্দ্রনাথ ৩৬৪,

বাইবেল, ১১৮, ২০০

বাটলার—২০৩

বান্দ্রা ৪১১

বার্ণস জন ১২৮

বালাসুন্দরম্‌—তামিল ভাষী গিরমিটিয়া মজুর, প্রভু কর্ত্তৃক প্রহৃত, ২৫০, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রভু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা ১৫১-১৫২ ;

নির্ঘণ্ট

পাগড়ী খুলিবার করুণ কাহিনী ২৫৩; ২৫৪, ২৯৩

বিন্‌স, সার্ হেনরী ২৫৬

বিবেকানন্দ স্বামী ৩৮১

বিলাত ৭৪, গ্রন্থকার বিলাতে পৌঁছিলেন ৭৬-৭৮; ১৩০, ১৪২

বিশ্বামিত্র ৭

বুথ ডাঃ, ইংরেজদের জাতীয় গানের দুইটি পংক্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের আপত্তির সমর্থন ২৮২; তাঁহার তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ৩২৭; বোয়ার যুদ্ধে সেবাদল লইয়া যাওয়া সম্পর্কে গ্রন্থকারকে উৎসাহদান ৩৪৭

বুদ্ধ, গৌতম ২৬২, ৩৮০

বুলার, জেনারেল ৩৪৮, ৩৪৯

বেকার, মিঃ এ উব্‌লিউ, প্রিটোরিয়ায় দাদা আব্দুল্লার এটর্ণী, গ্রন্থকারের ধর্ম্মমত জানার জন্য তাঁহার আগ্রহ ও তাঁহাকে প্রার্থনায় আহ্বান ১৯৯-২০১; মিঃ কোট্‌স প্রভৃতির সহিত গ্রন্থকারকে পরিচিত করা ২০২; ওয়েলিংটন কনভেনশনে ২২২-২২৩

বেচরজী স্বামী, বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে মদ মাংস ও নারী সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবার প্রতিজ্ঞায় গ্রন্থকারকে আবদ্ধ করা ৬৮

বেজওয়াটার ১০১

বেন্থাম ৮১

বেলস্ 'ষ্টাণ্ডার্ড ইলোকিউশনিষ্ট' ৮৯

বেলুড় মঠ ৩৮১

বেসাণ্ট মিসেস্, ১১৭, ১১৯, ৩৮৪, ৩৯১

বোম্বাই ১, ২৯, ৫৩, ৬৩, ৬৯, ৭০, ৭৩, ৭৮, ৮৭, ১৪৩, ১৪৭, ১৫৫-১৬২, ১৭১ ২৬৪, ২৭৩-২৭৬, ২৮২-২৮৪, ২৮৬, ২৯১, ২৯৮, ৩০৫, ৩৫৯, ৩৮৩, ৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৫, ৪০১

বোয়ার যুদ্ধ ২১৪, ৩২৮, ৩৩৩, ৩৪৬—৩৫০; ৩৮২

ব্যানার্জ্জী কালীচরণ ৩৭৭, ৩৭৮

ব্যানার্জ্জী সুরেন্দ্রনাথ ২৯৫, ৩৬৬,

ব্যানার্জ্জী স্যার গুরুদাস ৩৭৮

ব্রহ্মচর্য্য, গ্রন্থকারের আকর্ষণ, প্রযত্ন ও ব্রতগ্রহণ ৩৩১-৩৩৩; ৩৩৬, সাধনের পন্থা ৩৩৭-৩৪১

ব্রাইটন ১১১, ১১৩

ব্রাডল ১১৯

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন ২৯৫

ব্রুম ১৩৮

ব্রুস, সার চার্লস ৩৫৯

ব্লভটস্কী, ম্যাডাম ১১৭

ভ

ভাওনগর, ৬৩

নির্ঘণ্ট

ভাঁকানার, ১১

ভাগবত ৫৯

ভাণ্ডারকর ডাঃ ২৯১, গ্রন্থকারের অনুরোধে পুনার সভায় সভাপতি হইলেন ২৯২

ভেণ্টনর ১০৪, ১১০, ১১১

ভেরাভল ৩৯৩—৩৯৫

ম

মজুমদার ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ১০৪, ১০৫

মজুমদার প্রতাপচন্দ্র ৩৮১

মণ্ডলিক ৩৭৪, ৩৭৫

মতিবাবু ৩৬০

মনু-স্মৃতি ৬১

মরিৎজবর্গ ১৮৫-১৮৮

মরিসস ৩৫৯

মল্লিক ডাঃ ৩৮২

মহম্মদ ১১৯, ২৬০

মহম্মদ কাসেম কমরুদ্দীন ১৯২, ২০২

মাদ্রাজ ২৫২, ২৯৩-২৯৫

মানেকজী মিঃ ২৩২

মমী-বাঈ ১৫৮

মারে, রেভারেণ্ড ২২৩

মালব্য মদনমোহন, পণ্ডিত ৫৯, ৩৭১

মালাবার ১৭৫

মাল্টা, ৭৭

মিত্র জষ্টিস ৩৭৮

মীরা বাঈ ৩৫৪

মুক্তানন্দ ১৪৯,

মুখার্জ্জী রাজা প্যারীমোহন ২৯৬, ৩৭৮

মুন্সী, মিঃ ২৮৪, ২৮৭

মুলার ২২২

মেইটল্যাণ্ড, এডওয়ার্ড ২২৬, ২২৭

মেইন ১৩৮, ১৫৮

মেসন, মিঃ ২৫৬

মেহ্‌তা ডাঃ পি, জে, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮২, ১৪৭, ১৪৮

মেহ্‌তা সার ফিরোজশা, ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৫৭, ১৬৬ ২৮৩-২৮৪, ২৮৬, ২৮৭, ২৯১, ৩১৭, ৩৫৯, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৯৩

মোজাম্বিক ১৭২, ১৭৫

মোম্বাসা ১৭৪

ম্যাক্সমুলার ২৬০

ম্যাঞ্চেষ্টার ১১৮

ম্যানিং, মিস্ ১২৫

য

যিশু ৮১, ১৯৯, ২০৪, ২৬২, ৩৭৮

যোশীজী, দভে মাভজী দেখুন

রবার্ট লর্ড [illegible]

রবার্ট, লেফ্‌টনাণ্ট ৩৪৯, ৩৫০

রবিনসন ২৩৩

নির্ঘণ্ট

রবিশঙ্কর, গ্রন্থকারের পাচক, ১৫৬

রম্ভা ধাত্রী ৫৭, ৮১

রাজকোট ১১, ১২, ১৫, ২২, ২৯ ৩৮, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৬৮-৭০, ১১৮, ১৫২, ১৫৫, ১৬০, ১৬২, ১৬৬, ১৭১, ২৭৫, ২৭৬, ২৮১, ২৮৪, ৩৮৬, ৩৯২, ৩১৫

রাজস্থানিক কোর্ট ১১, ১৫

রাণা সাহেব, পোরবন্দরের ১৬৩, ১৬৮

রাণাডে, জষ্টিস ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ৩৪৩, ৩৭৪, ৩৭৫

রামায়ণ ৫৮, ৫৯

রায় চন্দ ভাই ১৪৭, পরিচয় ও গ্রন্থকারের উপর তাঁহার প্রভাব ১৪৮-১৫১, ধর্ম্মানুসন্ধানে গ্রন্থকারকে সাহায্য দান ২২৬; গ্রন্থকারকে পুস্তক প্রেরণ ২২৭; ৮০, ৩৩১, ৩৩২

রায় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮৩, ৩৮৪, টিকিট কলেক্টররের বাধাদান ৩৮৫

রাস্কিন ১৫১

রিচমণ্ড ৮২, ৯৭

রিপন কলেজ ৩৬০

রিপন লর্ড ২৩৪

রেঙ্গুন ৩৮০

রেবাশঙ্কর জগজীবন ১৪৮, ৪০১

ল

লক্ষ্মীরাম সি ২৩২

লণ্ডন ৭৮, ৮২, ৯৫, ১১২, ১১৯, ১৪২ 'বিলাত' দেখুন।

লভেটর ১৪২

লাটন মিঃ, ডারবানের দাদা আব্দুল্লা কোম্পানীর উকিল ৩০৬, ৩১০, ৩১১, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬, ৩৪৭

লাধা মহাশয় ৫৮

লামু ১৭২, ১৭৩, ১৭৪

লিওনার্ড মিঃ, ২১৮

লেডিস্মিথ ৩৪৮

লেলী, সার ফ্রেডরিক ৬৬, ৬৭, ৯৩

লোকার্ট ৯৫

লোকমান্য তিলক ২৯১, ২৯২, ৩৬০

শ

শামল দাস কলেজ ৬৩

শামল ভট্ট ১১৯

শাস্ত্রী পণ্ডিত শিবনাথ ৩৮১

শুকুল দৌলতরাম ছাপার ভুল, শুক্ল দলপৎ রাম দেখুন।

শুক্ল দলপৎরাম ৭৬, ৮২, ৮৩

শেক্‌সপীয়র ১৪২

শেতল ভাড় ৩৫৯

শেমেলপেনিক ১৪২

শ্রবণ ১৭, ১৮

শ্রবণের পিতৃভক্তি. নাটক ১৭

নির্ঘণ্ট

ষ

ষ্টওারটন ১৮৯, ১৯১, ১৯২

স

সনডার্স মিঃ ২৯৭, ২৯৮, ৩৮২

সমর্থ মিঃ ৩৯২

সাউদাম্পটন ৭৬

সান্তাক্রুজ ৪০১, ৪০৩

সিডেনহাম ২২৮

সুব্রাহ্মণ্যম্ ২৯৩

সুব্রহ্মণ্যম ডাঃ ২৯৩, ২৯৪

সেন কেশবচন্দ্র ৩৮১

সেল ২২৬

স্নেল ১৩৮, ১৪২

স্পিয়নকোপ ৩৪৮

স্বামী আনন্দ ১, ২

হ

হবর্ণ ভোজনালয় ৮৬, ১০৫

হরিভদ্র সুরি ২২৭

হাউয়ার্ড উ[illegible]লিয়াম ৮৫, ১০৪

হাজি মহম্মদ হাজি জুসব শেঠ ২০

হাজি মহম্মদ হাজি দাদা শে[illegible] [illegible]

হাডিং লর্ড ৩৭১

হাণ্টার সার উইলিয়াম ২৪৫

হিউম মিঃ ৩৬৬

হিল্‌স মিঃ ১০২, ১০৩, ৩৩২

হুগলী ২৭৩

হোয়াইট এণ্ড টুডর ১৩৮

হ্যারিস্, মিস্ ২০২